কৃতজ্ঞতার অশ্রুবিন্দু

ভারবি

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

KRITAJNATAR ASRUBINDU

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০১, শ্রাবণ ১৪০৮

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক · শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২

আমার অগ্রজ লোকসঙ্গীতশিল্পী
ওয়ালিউর রহমানকে
যিনি আমাকে পরমস্নেহে গৌরীদির কাছে
পৌঁছে দিয়েছিলেন বলে
এই অসামান্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গসুধালাভে
ধন্য হতে পেরেছি

সূচি

ভূমিকা : শিবনারায়ণ রায়
সম্পাদনা প্রসঙ্গ : মীরাতুন নাহার

স্মৃতিকথা

শিরোনাম	লেখক	পৃষ্ঠা
গল্প		
কবন্ধ		২০৪
গৌরী আইয়ুবের লেখা ব্যক্তিগত চিঠিপত্র		২১৩
পরিশিষ্ট		
দেহদানের অঙ্গীকার-পত্র		২৩৫
তাঁর প্রয়াণের পর অনুষ্ঠিত স্মরণ-সভার আমন্ত্রণলিপিসমূহ		২৩৬
সংবাদপত্র থেকে গৃহীত কিছু সভা-সংবাদ		২৩৮
স্মারকগ্রন্থ বিষয়ে উৎসাহ-প্রকাশক চিঠিপত্র		২৪২
গৌরী আইয়ুবের জীবনপঞ্জী ও রচনা-তালিকা		২৪৩

ভূমিকা

আমার দীর্ঘ জীবনে যে স্ত্রীপুরুষদের চরিত্রে এবং জীবনচর্যায় বিবিধ মানবীয় সদ্‌গুণের সুষম বিকাশ মানবতন্ত্রী প্রত্যয়ে আমার আস্থাকে বলবত্তর করেছে প্রয়াত গৌরী আইয়ুব ছিলেন তাঁদের ভিতরেও বিশিষ্ট। তাঁকে আমি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দেখেছি, এবং প্রতিবারই মনে হয়েছে তাঁর মত স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমাদের সমাজ কত সুস্থ এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।

গৌরীকে আমি প্রথম দেখি এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে শান্তিনিকেতনে। তখন তিনি বিশ্বভারতীতে সাম্মানিক দর্শনের ছাত্রী। রুক্‌মিনী ভাটিয়া, একটি গুজরাতি ছাত্রী, প্রথম পরিচয়েই যে আমাকে দাদা এবং গীতাকে বৌদি বলে আত্মীয় সম্পর্ক রচনা করেছিল, গৌরীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রথম সাক্ষাতেই গৌরীর প্রসন্ন উপস্থিতি আমাদের মুগ্ধ করে। গৌরীর চাইতে আমি বয়সে দশ বছরের বড়, অধ্যাপনা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা দায়িত্ব নিয়ে ঘোরার ফলে মানুষ সম্পর্কে তখনই আমার বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রথম নজরেই বুঝতে পারি তাঁর এই প্রসন্নতা গুণ বড় দুর্লভ সম্পদ, ভিতরকার সৌষম্য এবং বিশ্বজগতের সঙ্গে যথার্থ আত্মীয়তাবোধ থেকেই এর উদ্ভব। গৌরীর মুখেচোখে পরিশীলিত বুদ্ধির দীপ্তি ছিল, প্রখরতা ছিল না ; তাঁর হাসিটি ছিল নির্মল ও মধুর। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায় যে প্রকৃতির মন গড়ে ওঠার কথা এই প্রসন্নময়ী তরুণীর ভিতরে তার আভাস পাই।

কিছুদিন পরেই গৌরীর সম্পূর্ণ আলাদা একটি দিকের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। দার্শনিক পিতার সুকঠিন নির্দেশ অমান্য করে তিনি আবু সয়ীদ আইয়ুবকে জীবনের চিরসঙ্গী হিসেবে বরণ করেন। পিতার সঙ্গে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক ছিল ; সেই পিতা এই বিবাহের জন্য আমৃত্যু তাঁর মুখদর্শন করেন নি। ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত দর্শনের নামজাদা অধ্যাপক ছিলেন ; ভারতীয় দর্শন বিষয়ে তাঁর গ্রন্থ আমি পড়েছি ; কিন্তু গোঁড়া হিন্দুয়ানি যে তাঁর ভিতরে এতটা প্রবল ছিল তা পূর্বে ধারণা করতে পারি নি। এই সময়ে পরিচয় পাই গৌরীর চরিত্রগত দৃঢ়তার এবং অপরিসীম মানসিক স্থৈর্যের। আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে ১৯৪৬ সাল থেকেই আমার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমি সবে তখন অধ্যাপনা শুরু করেছি, আর তিনি তখনই বহুবিদ্য মনীষী হিসেবে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। আইয়ুব নিজেও দর্শনের অধ্যাপক, কিন্তু এই মুক্তবুদ্ধি রবীন্দ্রানুরাগী ভাবুকটি যে হিন্দু নন, গোঁড়া হিন্দুদের কাছে এটা ছিল বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনের পথে অলঙ্ঘনীয় বাধা। এই সঙ্কীর্ণবুদ্ধি বাধা অতিক্রম করবার শক্তি ধরে ভালবাসা। গৌরীর ক্ষেত্রে ভালবাসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল চরিত্রের অনমনীয় দার্ঢ্য। পারিবারিক বিমুখতা ও সামাজিক প্রতিকূলতাকে তিনি তাঁর বিবেকদীপ্ত প্রেমের সামর্থ্যে অগ্রাহ্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে

বারবার তাঁর আত্মপ্রত্যয়ী অটল চিত্ততার পরিচয় পেয়েছি। তাঁর হৃদয় এবং বিচারবিবেচনা দিয়ে যাকে তিনি করণীয় মনে করতেন কোনো ভয় অথবা মোহ তাঁকে সে কাজ থেকে বিচ্যুত করতে পারত না।

অপরপক্ষে তাঁর এই চারিত্রিক দৃঢ়তা কোনো সময়েই তাঁর চিত্তের সৌষম্যকে নষ্ট করে নি। আমি তাঁর মুখে কখনো তাঁর পিতা অথবা আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে কোনো ক্ষোভ বাক্য শুনি নি। তাঁদের পার্ল রোডের ফ্ল্যাটে নানা ধরনের মানুষের সমাগম ঘটত। আইয়ুবের বন্ধুরা ছিলেন প্রায় সকলেই সাহিত্যিক, শিল্পী, অধ্যাপক। গৌরী যেমন তাঁর অনুশীলিত মননশক্তির সামর্থ্যে আমাদের নানাবিধ তাত্ত্বিক আলাপে সাবলীল ভাবে যোগ দিতেন, তেমনই সহজাত দাক্ষিণ্যে স্বাগত করতেন এমন বহু স্ত্রীপুরুষকে যাদের কোনো বৌদ্ধিকতার তক্‌মা ছিল না। পার্ল রোডের সেই অতিথিপরায়ণ ফ্ল্যাটটি মনস্বী এই দম্পতির প্রোজ্জ্বল উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত।

চারিত্রিক বলিষ্ঠতাসম্পন্ন স্ত্রীপুরুষ আমি দেশেবিদেশে আরো কিছু দেখেছি। কিন্তু সৌম্য প্রসন্নতা এবং অটুট দৃঢ়চিত্ততার স্বচ্ছন্দ সমাবেশে গৌরীকে মনে হয়েছে অনন্যা।

মাঝখানে আমি অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে দীর্ঘকালের জন্য ভারতের বাইরে সপরিবারে বাস করি। কিন্তু অন্তত প্রতি দু বছরে একবার কিছু দিনের জন্য ছুটি নিয়ে ভারতে আসতাম, এবং কলকাতায় এলেই আইয়ুবদম্পতির সঙ্গে পার্ল রোডে বেশ কিছুটা সময় কাটত। একবার যখন মাস ছয়েকের জন্য আসি তখন গৌরীর আরেক রূপ দেখতে পাই। তখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের ভিতরে তখন অনেকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন ; অপরপক্ষে বেশ কিছু স্ত্রীপুরুষ বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায় এবং আশেপাশে আশ্রয় নিয়েছেন। এঁদের ভিতরে অনেকে কবি, অধ্যাপক, ছাত্র, সাংবাদিক, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত—তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভারতীয় সমর্থন গড়ে তোলায় উদ্যোগী। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা করার জন্য ভারতেও অনেকে উদ্যোগী হয়েছেন—তাঁদের মধ্যে প্রধান জয়প্রকাশ নারায়ণ, আর বলতে গেলে এ সময়ে তাঁর দক্ষিণ হস্ত মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং সংগঠক আমার অনেকদিনের বন্ধু এ. বি. শাহ্‌। তখন গৌরীকে দেখতে পাই বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের একজন নির্ভরযোগ্য আশ্রয়দাত্রী রূপে। সেবা এবং সংগঠনের কাজে তিনি যে কতটা উদ্যোগী এবং নির্ভরযোগ্য পদে পদে তার পরিচয় মিলল। সে সময়ে বাংলাদেশ থেকে খুব কম বুদ্ধিজীবীই কলকাতায় এসেছেন গৌরীর কাছে থেকে যাঁরা সহায়তা লাভ করেন নি। গৌরীর আত্মপ্রত্যয়ে আত্মকেন্দ্রিকতার বিন্দুমাত্র স্থান ছিল না। তাঁর চিত্তের প্রসন্নতা এবং দার্ঢ্য যেমন এই সব নিঃসম্বল আশ্রয়প্রার্থীদের মনে উৎসাহ এবং আশার সঞ্চার করেছে, গৌরীর সেবাপরায়ণতা এবং সংগঠনশক্তি তেমনই নানাভাবে তাদের সংগ্রামপ্রয়াসকে শক্তি যুগিয়েছে। এই সূত্রে গৌরীর সঙ্গে স্বাধীন বাংলার যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমৃত্যু তাতে ছেদ পড়েনি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ গৌরীর ভিতরকার সেবাধর্ম এবং সংগঠনশক্তিকে পরিস্ফুট করেছিল। সেটি আরো স্থায়ী রূপ পেল মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে 'খেলাঘর' প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার ভিতর দিয়ে। এটি মৈত্রেয়ী দেবী এবং গৌরীর স্থায়ী কীর্তি। মৈত্রেয়ী দেবীর মৃত্যুর পর এটির পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে গৌরীর উপরে। আমি 'খেলাঘরে' গৌরীর আহ্বানে গিয়েছি এবং এখানে অনাথ ছেলেমেয়েদের বিশেষ যত্নে সুস্থ জীবনের আদর্শে গড়ে তোলার নিরলস উদ্যোগ দেখে প্রাণিত হয়েছি। গৌরী দীর্ঘ সময় শ্রীশিক্ষায়তনে অধ্যাপনা করেছেন, তাঁর সহকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীরা তাঁর অধ্যাপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি নিজেও আযৌবন শিক্ষকতা করে এসেছি। কিন্তু আমার মনে হয় শিক্ষাবিদ্‌ এবং শিক্ষিকা রূপে গৌরীর স্বকীয়তার যথার্থ প্রকাশ

ঘটে 'খেলাঘরে'র ছেলেমেয়েদের মানবিক বিকাশের জন্য তাঁর উদ্যোগের ভিতর দিয়ে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় গৌরীর সেবাপ্রসন্ন রূপ দেখেছি। পরে ১৯৭৫ সালে এমার্জেন্সির সময়ে (আমি তখন কয়েক মাসের জন্য ভারতবর্ষে ছিলাম) গৌরীর দুর্মর নীতিনিষ্ঠা ও নির্ভীক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নূতন করে পরিচয় ঘটল। গৌরী চিরদিনই ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী। যাঁরা এমার্জেন্সির বিরোধিতা করছিলেন, সব রকম ঝুঁকি নিয়েই তিনি তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সেই সাহসিকা রূপ ভোলবার নয়। একদিকে কঠিন ব্যাধিতে শয্যাশায়ী আইয়ুবকে শুধু সেবা নয়, সব রকম উত্তেজনা ও সম্ভাব্য সংকট থেকে আড়াল করে রাখা ; অন্যদিকে গৌরী নিঃসঙ্কোচে আশ্রয় দেন এমন কিছু মানুষকে এমার্জেন্সির বিরোধিতা করার জন্য পুলিশ যাদের ধরবার উদ্দেশ্যে হুলিয়া নিয়ে ঘুরছে। সেই সংকটকালেও গৌরীর সহজাত প্রসন্নতা তাঁকে ত্যাগ করে নি। এমার্জেন্সি-বিরোধীদের তিনি অকুণ্ঠ প্রেরণা এবং রশদ যুগিয়েছেন। আবার পুলিশি কর্তারা বাড়িতে চড়াও হলে সস্মিত সৌজন্যে তাদের বিদায় দিয়েছেন। কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েও তিনি অচঞ্চল ; তাঁর বিবেক যেমন নির্ভীক, নির্দ্বিধ, তাঁর হৃদয় তেমনই সানুকম্প ও অনসূয়।

আইয়ুবের অসুস্থতার কথা জেনেও গৌরী তাঁকে সারা জীবনের সঙ্গীরূপে বেছেছিলেন। বস্তুত এই সৌম্য, কান্তিমান, সহৃদয় মনীষীকে আমি কোনোদিনই খুব একটা সুস্থ দেখি নি। আইয়ুব যখন ভারতবিদ্যার অধ্যাপক হয়ে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন তখন তিনি সেখানে অসুস্থতার জন্য মাস দুই / তিনের বেশি ক্লাস নিতে পারেন নি। পরে আমি যখন মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই তখন সহকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের মুখে শুনি কীভাবে সেই দূর দেশে শিশুপুত্র পুষণকে নিয়ে গৌরী অক্লান্ত নিষ্ঠায় আইয়ুবের সেবা করেছিলেন। তখন সেটা ছিল পরের মুখে শোনা বিবরণ। কলকাতায় ফিরে গৌরীর সেই সেবামূর্তি আমি নিজেই স্বচক্ষে দেখেছি। জীবনের শেষভাগে আইয়ুব দীর্ঘকাল একেবারেই শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর মননশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকলেও তাঁর শারীরবৃত্তেব বেশিটাই ব্যাধির আক্রমণে প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। যে নিষ্ঠা এবং যত্ন নিয়ে গৌরী হাসিমুখে তাঁর সেবা করেন তার তুলনা সম্ভবত পুরাণ-কাহিনীতে মেলে। আর সেই অক্লান্ত সেবার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছিল তাঁর অন্য বিবিধ কর্তব্য পালন—অধ্যাপ্পনা, খেলাঘর, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মিলনের ব্রত, কম্যুনিস্ট সরকারের সর্বনাশী শিক্ষানীতি ও ভাষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সহযোগিতা। এই সুমধুর, সংযমী, পরার্থপর মানুষটির মধ্যে এত শক্তি নিহিত ছিল, চিন্তা করলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

আইয়ুব এবং গৌরীর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপের মধ্যে একটি ছিল নৈতিকতার উৎস নিয়ে। অনেকেরই ধারণা ধর্মবিশ্বাস ছাড়া নীতিবোধ অকল্পনীয়। আমি নিজে আকৈশোর নাস্তিক ; নৈতিকতার সঙ্গে ধর্মের কোনো অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না ; বরং অতীত এবং বর্তমানের অভিজ্ঞতা থেকে যেটুকু বুঝতে পারি তাতে মনে হয় ধর্ম বহু ক্ষেত্রেই মানুষের নীতিবোধকে দুর্বল, এমনকি সাময়িক ভাবে বিলুপ্ত করেছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি আর বিবেকিতা স্পষ্টতই পরস্পরের পরিপন্থী। রবীন্দ্রচর্চায় পরিপৃক্ত আইয়ুব আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলেও ধর্ম সম্পর্কে আমার এই ধারণায় পুরোপুরি সায় দেওয়া তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না ; বিশ্বের অন্তরে এক রহস্যময় কল্যাণশক্তির অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। অপরপক্ষে গৌরীর কথা থেকে আমার ধারণা হয়েছিল ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে তিনি সহিষ্ণু হয়েও অনাগ্রহী ; মানুষের ভিতরে শুভচেতনার বিকাশই ছিল তাঁর অভীষ্ট ; যতদূর বুঝতে পেরেছিলাম আমার নাস্তিক মানবতন্ত্র তাঁর অনভিপ্রেত ছিল না।

এ প্রসঙ্গে ছোট একটি ঘটনার উল্লেখ করি। একবার আমি তখন মেলবোর্ন থেকে ছুটিতে কলকাতা এসেছি। দূরদর্শনের কোনো একজন কর্তাব্যক্তি, যিনি আমার নাস্তিকতার খবর রাখতেন, ধর্ম বিষয়ে একটি আলোচনায় মুখ্য বক্তা হবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করেন। ঐ আলোচনায় অংশ নেন আমার দুই চিন্তাবিদ্ বন্ধু অম্লান দত্ত এবং শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়। দুই বন্ধুই মানবতন্ত্রী, কিন্তু নাস্তিক নন। আলোচনা পরিচালনা করেন গৌরী আইয়ুব। আলোচনার শেষভাগে কথা ওঠে ঈশ্বর থাকুন বা নাই থাকুন, অধিকাংশ স্ত্রীপুরুষ যে বিপদে বা সংকটে পড়লে ঈশ্বর অথবা দেবদেবীর স্মরণ নেয়, এটা তো অনস্বীকার্য। দূরদর্শনের পক্ষ থেকে যিনি আমাদের জিজ্ঞাসাদি করছিলেন তিনি হঠাৎ গৌরীকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা খুব বিপদে আপনার কি ভগবানকে প্রয়োজন হয় না? গৌরী স্মিত হেসে বললেন, 'এখনো পর্যন্ত তো কোনো প্রয়োজন বোধ করি নি'। আলোচনাটি দূরদর্শনে দেখানো হয়েছিল, হয়তো-বা ছবির কপি তাদের সংগ্রহে থাকতেও পারে।

পরিনির্বাণের আগে বুদ্ধ শাক্যসিংহ তাঁর প্রিয়শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন, তোমরা প্রত্যেকে আত্মদীপ হয়ে ওঠো। গৌরী তাঁর জীবনচর্যার ভিতর দিয়ে আত্মদীপ হয়ে উঠেছিলেন। সমাজতাত্ত্বিক ডেভিড রীজ্‌ম্যান তাঁর The Lonely Crowd গ্রন্থে এই প্রকৃতির মানুষকে বলেছেন inner-oriented ; তাঁরা tradition-oriented অথবা other-oriented নন। অর্থাৎ ঐতিহ্য বা গণরুচি নয়, নিজস্ব বিচারবুদ্ধির নির্দেশেই তাঁদের জীবন পরিচালিত। বিদুষী, কল্যাণব্রতী, নির্ভীক, কর্তব্যনিষ্ঠ, মুক্তবুদ্ধি, প্রসন্নচিত্ত, মানুষের নিহিত মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী, সেবাপরায়ণ এই নারী আমাদের সামনে বিকশিত ব্যক্তিতার জ্যোতির্ময় রূপে দেখা দিয়েছিলেন। আজ যখন পশ্চিমবঙ্গে, তথা দক্ষিণ এশিয়ার এই বিরাট উপমহাদেশে আগ্রাসী ধর্মান্ধতা, নির্লজ্জ দুর্নীতি, আত্মপ্রত্যয়হীন শুভনাস্তিক্য, উলঙ্গ ধ্বংসবৃত্তি দ্রুত প্রসার লাভ করছে, তখন নতুন শতকের তরুণ তরুণীদের কাছে প্রয়াত গৌরী আইয়ুবের জীবনচর্যার কাহিনী পৌঁছে দেওয়া আমরা যারা তাঁর সৌহার্দ্যের সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম তাদের আশু কর্তব্য।

এই সংকলন গ্রন্থটিতে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সকলেই মনস্বী, আদর্শবাদী, অনেকেই আপন আপন ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। গৌরীর ব্যক্তিত্ব এবং পরার্থপরায়ণতা এই সব বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করেছিল। গৌরীর নানা সৎকর্মের সঙ্গে তাঁরা অনেকে যুক্ত ছিলেন। সম্ভবত আমার বয়সের কথা বিবেচনা করেই গ্রন্থখানির সম্পাদক আমাকে ভূমিকা লেখবার জন্য নির্বাচিত করেছেন। এই বই যদি পাঠকপাঠিকাদের অন্তরে আপন আপন দীপশিখা জ্বালিয়ে তুলতে সাহায্য করে, যদি অভীক বিবেকিতার বার্তা পৌঁছে দেয়, যদি সুস্থ সমাজ এবং প্রকৃতিপরিবেশ নির্মাণের অনুপ্রেরণা যোগায়, তবেই এই বইপ্রকাশের উদ্যম সার্থক হবে।

১৫ই অগাস্ট, ২০০০।। **শিবনারায়ণ রায়**

কলকাতা

[শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায় বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী]

সম্পাদনা-প্রসঙ্গ

জ্যোৎস্নার নরম আলোর মত স্নিগ্ধ ছিল যার সর্বাঙ্গের দ্যুতি তাঁর সেই অঙ্গখানি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল। তিনি প্রিয়জনদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখছিলেন। কোমল মায়া-মমতা ভরা হৃদয়টিকে কঠিন করে তোলার সাধনায় যেন মগ্ন হয়ে পড়ছিলেন প্রতিদিন। সেই দুঃসহ দিনগুলিতে তিনি হয়তো তাঁর প্রিয় জাপানী লেখক মাৎসু ও বাশোউ-এর মতোই বলেছিলেন—

'বিষণ্ণ মনে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিই
যেন শুক্তির দেহ তার আবরণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে
আমি চললাম হেমন্ত চলে যায়"

তারপর ১৯৯৮ সালের ১৩ জুলাই গেলেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়। বিষণ্ণ, নিঃসঙ্গ হয়ে গেল ৫ নং পার্ল রোডের জন-কলরোলে মুখর গৃহখানি। সেখানে পৌঁছবার অতি-পরিচ্ছন্ন মসৃণ রক্ত-রঙা সিঁড়িগুলিতে নিত্য তরঙ্গ তোলা অসংখ্য পদশব্দ চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলো। নানা অতিথির আনাগোনা আর কোন আলোড়ন তুলবে না তাদের দেহে। 'সরোবরের জলের মত স্তব্ধ' ছিল যাঁর হৃদয় তাঁর কাছে অঞ্জলি-ভরে শান্তি সুধা নিতে আসতো কত বিচিত্র মানুষ। আর তারা আসবে না এ পথে। তাদের অন্তরে আজ আশ্রয় নিয়েছে গভীর নীরবতা।

'ব্যক্তিমানুষের ক্ষণিক উৎক্ষেপ ও নিঃশেষে অবলোপ' সম্পর্কে সচেতন মানুষটি 'তাঁর সব কীর্তি তার সর্বকর্ম নিয়ে মৃত্যুর স্তব্ধতায় নিশ্চিহ্ন ডুব' দিয়েছেন। আশ্চর্যরকম প্রচারবিমুখ মানুষটি 'নিশ্চিহ্ন ডুব' দিতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি চাইলেই কী আমরা তা' হতে দিতে পারি? ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চিহ্ন খুঁজে নিয়ে "কৃতজ্ঞতার অশ্রুবিন্দু" তুলে ধরব জনসমক্ষে। তাই এই স্মারক গ্রন্থ।

খ্যাতি, অর্থ, আরাম, বিলাসিতা, আত্মপ্রচার, অন্যের শ্রদ্ধা, ভালবাসা প্রভৃতি কত না দুর্বলতা জালে বদ্ধ-জীব-মানুষ। কিন্তু সর্বপ্রকার মোহমুক্ত ছিলেন সেই মানুষটি যাঁর নাম গৌরী আইয়ুব—সর্বজনশ্রদ্ধেয় একটি নাম। যথার্থ অর্থে শিক্ষিত এই মানুষটির জন্যই যেন 'বিনয়', 'নম্রতা', 'দৃঢ়তা' 'সুন্দর'-এসব শব্দগুলি তৈরি হয়েছিল। 'স্বার্থপরতা' শব্দটি তাঁর অভিধানে স্থান পায়নি। তিনি আপন-পর ভেদ করতে শেখেননি। এসব দুর্লভ গুণের আধার মানুষটি জাতি ধর্ম বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অর্ধশত বছর কেটে গেলো ধরিত্রীর বুকে। এমন মানুষ আরতো দেখলাম না। কৃপণ সময় আপন মুঠিতে ভরে নিচ্ছে মানুষের মূল্যবান সব গুণ সম্পদ। মানুষ ক্রমশঃ একা হয়ে যাচ্ছে। কাঙাল হয়ে পড়ছে স্নেহ, ভালবাসা, মমতার। কিন্তু কোথায় পাবে! মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি জীববৃত্তিকে হঠিয়ে দিয়ে সবটুকু হৃদয় অধিকার করার লড়াই-এ মত্ত। স্বার্থপরতায় উন্মত্ত ধরিত্রী ও তার সন্তান দল। এমন সময়ে গৌরী আইয়ুবের মত আদর্শ মানুষ-এর কথা মানুষকে বলা বড় জরুরী। তিনি ছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী কিন্তু ভালবাসবার বৃত্তিকে পদদলিত করেননি। যুক্তিবাদিতা ও প্রেমময়তার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন তাঁর জীবনাচরণে। তিনি বলতেন—যিনি যে মতের মানুষ হোন না কেন লক্ষ্য যদি এক হয় একসঙ্গে কাজ করতে অসুবিধে নেই। আপন হৃদয়ের স্বচ্ছতা দিয়ে তিনি সত্যকে ছুঁতে পারতেন। মিথ্যার আবরণ থেকে সত্যকে স্ব-স্বরূপে পেতে তাঁর কোন অসুবিধা হতো না। তিনি ছিলেন

অন্তরে শুদ্ধাচারী। ভোগসুখের লালসায় মত্ত আজকের মানুষ পতঙ্গের মত বিভিন্ন প্রকার প্রলোভনের শিকার হয়ে অমূল্য মানবজীবন ব্যর্থ করে তুলছে। এসময় গৌরী আইয়ুবের মত মানুষের অনাড়ম্বর কিন্তু ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবনের কথা অনাগত প্রজন্মের জন্য সাজিয়ে রেখে যাওয়া আমাদের কর্তব্য। সেকারণে এই সংকলন।

জার্মান দার্শনিক কান্ট বলেছিলেন, মানুষকে সবসময় লক্ষ্য হিসেবে দেখো, কখনও লক্ষ্য সাধনের উপায় মনে করো না। গৌরী আইয়ুব—অধিকাংশ মানুষের 'গৌরীদি' কান্টের নীতিকে বাস্তবে রূপদান করেছিলেন। মানুষকে তিনি কেবল দিতেই চেষ্টা করেছেন। কখনও তাদেরকে নিজ কাজে ব্যবহার করেননি। এখানে তিনি অনন্যা। তথাকথিত নামী দামী মানুষদের মধ্যে এমন গুণ চোখে পড়ে না সচরাচর।

গৌরীদি প্রায় সারাজীবন দৈহিক কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু সব নীরবে সহ্য করে তাঁর মুখের সুমধুর হাসিখানি অমলিন রেখেছেন। তিনি যেন সুরভি ছড়ানো ধূপ। তিনি যেন আলো দিয়ে অন্যপ্রাণের অন্ধকার দূর করে দেওয়া প্রদীপ। ভুবন আলো করার মতো প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন তবু শিশিরটুকুরে ভালবাসতে গিয়ে সে আলো তেমন ক'রে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তাতে দুঃখ নেই। বিশাল খ্যাতির তার লোভ ছিল না। তিনি সকলের 'কাছের মানুষ' হয়েছিলেন—সেখানেই তার জিৎ!

১৯৬৬ সালে তাঁকে আমি প্রথম দেখি। তার আগে চিঠিতে পরিচয়। প্রথমদিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত আচরণে কোন তফাৎ কখনও অনুভব করিনি। যতবার তাঁর সান্নিধ্যে এসেছি মনে হয়েছে—'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর'। তাঁর অন্তরের জ্যোতি তাঁর ক্ষীণতনুর সর্বত্র ঠিক্‌রে পড়তো। সে রোশনাই-এ মুগ্ধ হয়নি এমন মানব হৃদয় মিলবে না। জো উইন্টার যথার্থই বলেছেন, তাঁর মত প্রধান শিক্ষিকা পেলে শিক্ষকতা ভিন্ন অন্য পেশা গ্রহণের কথা কখনই ভাবতেন না। নিজের কষ্ট ভুলে কেমন করে অন্যের দুঃখ লাঘব করা যায় তাঁর কাছে এ পাঠ নিতে নিতে তাঁর পানে চেয়ে আত্মবিস্মরণ ঘটতো! আজ ভাবি কত সুকঠিন এই কাজ তিনি কত অনায়সে করতেন! তাঁর অগুণতি ভক্তজনেরা কেউ কী তাঁর গুণগুলিকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন কখনও! স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি গৌরীদি বলছেন—ছিঃছি! এসব কী বলছো তুমি মীরা!' তিনি ছিলেন এমনই নিরহংকার!

স্মারক-গ্রন্থটিকে কয়েকটি বিভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে : স্মৃতিকথা ; কবিতায় স্মরণ ; গৌরী আইয়ুবের স্মৃতিচারণমূলক রচনা, প্রবন্ধ, গল্প ; তাঁর লেখা ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও পরিশিষ্ট। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর ভক্ত জনেরা। সকলের স্মৃতিকথা সংগ্রহ করলে বিশাল গ্রন্থ রূপ নেবে। তা' অসম্ভব। তবুও আরতি সেন দিদির লেখা সংগ্রহ করার অক্ষমতা আমার মনে কাঁটা হয়ে রইলো। আরও যারা বাদ পড়েছেন তাদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। যারা স্মৃতিকথা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন আমার এই নৈবেদ্যের ডালি তাঁদের সকলের কাছে আমার ঋণ অপরিমিত ও অপরিশোধ্য। যে সমস্ত ছবি দিতে পারলে গ্রন্থখানি অলংকৃত হতে পারতো সেসব দেওয়া সম্ভব হয়নি—বিশেষতঃ গৌরীদির পুত্র পূষণ, পুত্রবধূ চম্পাকলি ও প্রিয়তমা নাতনী শ্রেয়া-অহনার ছবি না দিতে পেরে মনে দুঃখ রয়ে গেলো। গৌরীদির বোন ইরাদি তাঁদের মা বাবা ও ভাইবোনের দুষ্প্রাপ্য ছবি দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছেন। বয়সের ভার উপেক্ষা ক'রে অনেক অমূল্য সময় ব্যয় ক'রে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীশিবনারায়ণ রায়। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভদ্রতা প্রকাশে আমি কুণ্ঠাবোধ করছি। গৌরীদির নিজেব লেখা সংকলন ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়ে তিনি অশেষ উপকার করেছেন। একই নির্দেশ আরও অনেক গুণীজন দিয়েছেন। সেকথা

মানতে আমাকে অনেক ঋণের দায় স্বীকার করতে হয়েছে। তবুও আমি কৃতজ্ঞ!

'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীকে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত গৌরীদির লেখার সন্ধান দিয়েছি। তিনি সেটি সংগ্রহ করার যাবতীয় ঝঞ্ঝাট হাসিমুখে স্বীকার করেছেন। স্নেহাস্পদ কবি নাসের হোসেন-এর হাতে সেটি যথাস্থানে পৌঁছে যাতে যায় সে ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত গৌরীদির লেখা নিতে সম্মতি দিয়েছেন সন্তুষ্টচিত্তে। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক আবদুর রউফ-এর সহৃদয় সহযোগিতা আমাকে স্পর্শ করেছে। এই গ্রন্থ সংকলনে যে বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি যথেষ্ট সুকৌশলে তিনি তার সমাধান বাতলে দিয়েছেন। তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রয়োজনীয় যে কোন লেখা গ্রহণের অবাধ অধিকার দিয়ে আমায় ঋণী করেছেন। কিশাদির (শ্রীমতী শ্যামশ্রী লাল)-র উৎসাহ ও আত্মীয়সুলভ আলাপন আমায় প্রেরণা যুগিয়েছে! Joe Winter-এর লেখা তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। এই লেখা না পেলে স্মারকগ্রন্থখানি সম্পূর্ণতা পেত না। কবিতা প্রেমিকচিত্তজয়ী শ্রী শঙ্খঘোষ-এর সহযোগিতার কথা কেবল উল্লেখ ক'রে বোঝাতে পারবো না তার গুরুত্ব। তিনি সাহায্যের হাত না বাড়ালে এই গ্রন্থ প্রকাশের আলো দেখতো না মনে হয়। অনুজা হয়েও বাস্তব বুদ্ধি যুগিয়েছে সহকর্মী অধ্যাপিকা তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়। আর চিকিৎসা ও লেখালেখি-উভয় জগতে আধিপত্য রক্ষা করে চলেছে অনুজ-প্রতিম ডাঃ কামাল হোসেন-তার কথা কী বলবো! হাজার রকমের ব্যস্ততার মাঝে সময় ক'রে নিয়ে সবকাজ গুছিয়ে দিয়েছে নিপুণ হাতে। তার ভালবাসার দান নিতে হয়েছে কুণ্ঠিতচিত্তে কিন্তু আনন্দের সঙ্গেই। আমার অষ্টাদশী কন্যাকে তার 'গৌরীমাসি' লিখেছিলেন—'শ্রাবণমাসে কী শিশির ঝরে? কি জানি অসামান্যারা বুঝি অসময়ে আসে।' শ্রাবণমাসের শিশির—(শাওনী শবনম) কন্যা তার ডায়েরীর পাতা সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে চায় নি। কিন্তু আমি তার কিশোরী মনের জিজ্ঞাসা সকলের কাছে উপস্থাপন করতে চেয়েছি—নীরব নিখাদ মানব-সেবার জন্য জাগতিক পুরস্কার কী মেলে না কখনও?

প্রথম থেকেই প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব শ্রী সুধাংশুশেখর দে হাসিমুখে স্বীকার করে না নিলে এই স্মারক গ্রন্থ সম্পাদনা করার কাজে হাত দিতে আমি সাহসই করতাম না। তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। তাঁর প্রতি আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানাই।

লেখিকা গৌরী আইয়ুবের সমগ্র রচনা সম্ভার প্রকাশ করার পরিকল্পনা চলছে। আমরা প্রতীক্ষায় আছি। আমি 'মানুষ গৌরী আইয়ুব'কে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছি অনাগত দিনের মানুষদের কাছে। তার জন্য তাঁর কাছের মানুষদের স্মৃতি কথা, তাঁর নিজের কিছু বক্তব্য, চিঠিপত্র ইত্যাদি যা যা প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করেছি সেগুলি কেবল তুলে ধরলাম পাঠক-সাধারণের কাছে। গৌরী আইয়ুব অসামান্য প্রতিভা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। সেদিকে ধ্যান দিলে তিনি বৌদ্ধিক চিন্তাভাবনার জগতে ছাপ রেখে যেতে পারতেন অনায়াসে। কিন্তু Joe Winter যথার্থ উচ্চারণ করেছেন—'But that would have been a lessening of who she was'. যথার্থ মানুষটি যদি তাঁর সঠিক পরিমাপে ধরা পড়ে এই স্মারকগ্রন্থের মাধ্যমে পাঠক মানসে তবেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে। মরমী মানুষের হাতে পড়ে যেন 'কৃতজ্ঞতার অশ্রুবিন্দু'-এটুকুই কামনা!

সেপ্টেম্বর ২০০০ — মীরাতুন নাহার

৬৪ জি লিন্টন স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০১৪

স্মৃতিকথা

গৌরী

অন্নদাশঙ্কর রায়

গৌরী দত্ত ছিল আমার জ্যেষ্ঠপুত্র পুণ্যশ্লোকেব সহপাঠিনী শান্তিনিকেতনের বিদ্যাভবনে। দুজনেই বি. এ অনার্স পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়। তাদের বিষয় ছিল দর্শন শাস্ত্র। শান্তিনিকেতনে সে-সময়ে এম. এ পড়ার ব্যবস্থা ছিল না। পুণ্যশ্লোক চলে যায় জার্মানিতে আর গৌরী কলকাতায়।

ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারির বর্ষপূর্তির দিন শান্তিনিকেতনে আমরা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের নিমন্ত্রিত সাহিত্যিকদের নিয়ে সাহিত্যমেলার আয়োজন করি। সেসময় নিমাই চট্টোপাধ্যায় ও গৌরী দত্ত মেলার সাফল্যেব জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল। গৌরীর একটি সাইকেল ছিল। সেটি চড়ে সে দুয়ারে দুয়ারে সাহায্য চাইত।

এরপরে ওর সঙ্গে আমার কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ হত।

আইয়ুব সাহেবের সঙ্গে গৌরীর বিয়ে আমাদের সবাইকে চমকে দেয়। ওর বাবা অধ্যাপক ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত দারুণ আঘাত পান। যে-মেয়েকে তিনি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন সে মেয়ের তিনি মুখদর্শন করেন না। আইয়ুব সাহেব কিছুদিন শান্তিনিকেতনে পড়িয়েছিলেন। সেই সূত্রে আমার পুত্র পুণ্যশ্লোকের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি Quest বলে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। পুণ্যশ্লোক ও আমি দুজনেই সেই পত্রিকায় লেখা দিতুম। আমি শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে আইয়ুব ও গৌরীর বাসভবনে গিয়ে দেখা করতুম।

কলকাতার পড়া সাঙ্গ করে গৌরী একটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করে। কিন্তু আর কোনদিন শান্তিনিকেতনে আসে না। শান্তিনিকেতনের পক্ষে এটা একপ্রকার ক্ষতি। আমরা ঘটনাচক্রে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় বাস করতে বাধ্য হই। তখন আইয়ুব ও গৌরীর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ হয়। আইয়ুব সাহেবের মৃত্যুদিনে আমরা তাঁর বাসভবনে হাজির হই। গৌরীই স্থির করে যে আইয়ুবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ইসলামিক শরিয়া মতে হবে। আইয়ুব কোনও ধর্মমতে বিশ্বাস করতেন না। তাঁদের পুত্র পূষণ মুসলিম মতে মানুষ হয়নি। গৌরী তাকে সুন্নত করতে দেয়নি। পূষণ চম্পাকলি নামে একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করে। আমি সেই বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলুম।

এর কিছুদিন পরে গৌরী কঠিন অসুখে পড়ে। মাঝখানে পূষণের কাছে বম্বেতে গিয়ে খানিকটা সুস্থ হয়ে এসেছিল। তার শেষ জীবন খুবই দুঃখের। তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে

সে দেখা দিতে রাজি হত না। তার মৃত্যুসংবাদ শুনে আমরা মর্মাহত হই। সে তার প্রাণহীন দেহ দান করে গিয়েছিল। হিন্দু বা মুসলিম কোনও মতেই তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় নি। তার স্মরণসভায় আমি উপস্থিত ছিলুম। তার অগণ্য বন্ধুবান্ধব সভায় সমবেত হয়েছিলেন।

শুনেছি তার পিতার মৃত্যুর পূর্বে মৈত্রেয়া দেবী গৌরীকে শান্তিনিকেতনে তার পিতার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাকে আশীর্বাদ করেন।

গৌরী মৈত্রেয়ী দেবীর খেলাঘরের কাজে সহকর্মী ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের সাহায্য করতে মৈত্রেয়ী ও গৌরী প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন। শরণার্থীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমান ছিলেন। গৌরী নিজে মুসলমান হয়নি। কিন্তু সে তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ ছিলো।

(শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী)

আত্মবিশ্বাসে সহজ

শঙ্খ ঘোষ

১৯৫৩ সালের বসন্তোৎসবের সময়ে শান্তিনিকেতনে তিনদিনের এক সাহিত্যমেলার আয়োজন হয়েছিল। স্বাধীনতার পর পাঁচ বছর জুড়ে এ-বাংলায় ও-বাংলায় কেমন সাহিত্যচর্চা হল, তারই একটা হিসাব নেবার জন্য সেই মেলা, সেই সম্মেলন। এর পরিকল্পনার বা এর আয়োজনের মূলে নিশ্চয় ছিলেন প্রবীণ প্রতিষ্ঠিত মানুষেরাই, কিন্তু এর প্রত্যক্ষ কর্মভার এসে পড়েছিল দুটি যুবকযুবতীর উপর। ওই তিনদিনে সেই দুজনকে দেখা যেত সবসময়েই, সভায় আর সভার বাইরে, আমন্ত্রিত অভ্যাগত লেখকদের তত্ত্বাবধানে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা নরেশ গুহদের মতো সেই সময়কার কয়েকজন তরুণকে নিয়ে গোটা শান্তিনিকেতন ঘুরে দেখাবার, কখনও নন্দলাল কখনও রামকিঙ্করের মুখোমুখি করে দেবার, আশ্রমিক আতিথ্যের একটা আবহাওয়া তৈরি করে তুলবার যেন সন্তর্পণ একটা দায়িত্বে ছিলেন সেই দুজন। দুজনের একজন নিমাই চট্টোপাধ্যায়, আর অন্যজন গৌরী দত্ত, উত্তরকালের গৌরী আইয়ুব।

আমার চেয়ে ঠিক এক বছরের বড় সেই গৌরীদির চলাফেরা বা কথাবার্তার সেদিনকার রূপটা আজও মনের মধ্যে যেন স্থির হয়ে আছে। অনেক মানুষকেই দেখেছিলাম সেই তিনদিনে, অনেক ঘটনাই ঘটেছিল তখন। কিন্তু সবই কি আর তেমনভাবে বেঁচে আছে মনে? সাইকেল ধরে হেঁটে যাওয়া গৌরীদির ছবিটা তবু যে রয়ে গেছে এইভাবে, তার নিশ্চয় কারণ ছিল কিছু। ঠিক সেই সময়েই যে তেমন কোনও কারণের বিশ্লেষণ করে ভেবেছি তা নয়। পরে মনে হয়েছে। একই সঙ্গে শান্ত আর দীপ্ত এ-রকম ব্যক্তিত্ব বড় সুলভ নয়, সুলভ নয় বুদ্ধিতে সংস্কৃতিতে সুরুচিতে কমনীয় এক স্বচ্ছ কোনও মুখশ্রী। কমল-হীরের পাথর থেকে যে আলো এসে পৌঁছবার কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই আলোর যেন আভাস ছিল সেদিনকার সেই কর্মসচল স্মিতমুখ মেয়েটির মধ্যে।

প্রথম দেখার পরে এই পঁয়তাল্লিশ বছরের যে সময়টা কেটে গেল, তার মধ্যে আরও বেশ

কয়েকবার তাঁকে দেখবার, তাঁর কথা শুনবার সুযোগ হয়েছে আমার, আরও অনেকের মতো ; আর এই সময়টা জুড়ে প্রথম দিনের সেই জানাটাই সত্যতর হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। সেই বসন্তোৎসবে দেখেছিলাম কত সহজে তিনি চাপা পরিহাসও করতে পারেন, আবার পরের মুহূর্তেই সেই সহজতা নিয়ে ঘুরে যেতে পারেন শিল্পরহস্যের কোনও আলোচনায়। পরে একদিন বুঝতে পেরেছি এই সহজের ভিত্তি হল তাঁর মস্ত বড় এক আত্মবিশ্বাস, আর সেইসঙ্গে এক মর্যাদাবোধ। গৌরী দত্ত ততদিনে গৌরী আইয়ুব নামে সংস্কৃতিজগতে সর্বপরিচিত এক নাম, তাঁর সমাজ-সংগঠনের কাজে, সম্প্রদায়-সম্প্রীতির কাজে, তারও চেয়ে বেশি হয়ত আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতো একজন মানুষকে এক শান্ত নির্ভরতা দেবার কাজে তাঁকে প্রায় মহিমময়ী মনে হচ্ছে তখন। আইয়ুবের কাছে আমরা কেউ কেউ যখন গিয়েছি কোনও সময়ে—চিররুগ্ণ আইয়ুবের কাছে— আমাদের জায়গা মতো এগিয়ে দিয়ে গৌরী আইয়ুব তখন প্রায়ই থেকেছেন পটভূমিকায় প্রচ্ছন্ন, যেন আমাদের সংলাপের মধ্যে কোনও অন্তরায় তৈরি করবেন না। অথচ ওরই মধ্যে, ধীর পায়ে শুশ্রূষার্থে কখনও কখনও এসে, একটি দুটি কথার খেই ধরিয়ে দিয়ে, একটি দুটি চকিত প্রশ্ন বা মন্তব্যের মধ্য দিয়ে উন্মোচন করে দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব মননের ইঙ্গিত। এমনই ভঙ্গিতে বলেছেন সেসব কথা, যেন তিনি এই আলোচনার মধ্যে নেই, যেন তিনি নিছক একজন শ্রোতাই মাত্র।

কোনও কোনও মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে সহজেই একটা স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ আসে। গৌরী আইয়ুব ছিলেন তেমন একজন মানুষ। দিনযাপনের মধ্যে প্রায়ই তো আমরা বিপর্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করি? আমাদের সমাজজীবনের মধ্যে চাপা একটা হিংস্রতা তো আছে? ক্ষমতার প্রতি ধাবমান উন্মুখতা আছে সেখানে, সমযোগিতার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিযোগিতার উন্মাদনা আছে সেখানে। আর সামগ্রিক এই অবস্থানের চাপে কেবলই আমরা ক্রুদ্ধ অথবা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি, দমিত অথবা আক্রান্ত বোধ করি কেবলই। এ-রকম সব অনুভবের সময়ে, এর একেবারে বিপ্রতীপে পাঁচ নম্বর পার্ল রোডের বাড়িতে পৌঁছলে মাথার মধ্যে একটা শান্তি নেমে আসত মনে হয়। সে কেবল আবু সয়ীদ আইয়ুবের জন্যেই নয়, গৌরী আইয়ুবের জন্যেও। যখনই তাঁকে দেখেছি বা কথা বলেছি তাঁর সঙ্গে, তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডলে তখন লেগে থেকেছে একটা হাসির আভা, মৃদু উচ্চারিত তাঁর নিরভিমান কথাগুলির মধ্যে থেকে কাছে একটা সযত্ন সহমর্মিতা, যুক্তিময় তাঁর চিন্তার মধ্যে একটা সত্যবোধের অভিমুখিতা। সমস্তটা মিলিয়ে তাঁর সেই স্নিগ্ধ আত্মস্থতার অল্প সামীপ্য পেলেও, এমনকী কখনও কখনও দূরভাষণে কয়েকটি কথা শুনতে পেলেও, জীবন-বিষয়ে যেন একটা ভরসা ফিরে আসত মনে হয়।

গৌরীদি এখন আর নেই। তিনি যে ছিলেন, আমাদের এই সমাজে তাঁর মতো একজন মানুষের অস্তিত্ব যে সম্ভব হয়েছিল, এই ভাবনাটাই আরও অনেকদিন সে-ভরসা জাগিয়ে রাখতে পারে আমাদের মনে, জাগিয়ে রাখতে পারে বসন্তোৎসবের অর্জিত এই বিশ্বাস যে জীবনটা শিল্পরূপময়।

সৌজন্যে : চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ২, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৪০৫

[শ্রী শঙ্খ ঘোষ বিশিষ্ট কবি ও চিন্তাবিদ]

গৌরী আমাদের জীবনের অন্যতম প্রধান বিস্ময়

অমিতাভ চৌধুরী

গৌরীর বিয়ের দিন সকালবেলাটা ঠিক কেমন ছিল, এখন আর স্পষ্ট মনে নেই। মেঘলা ছিল না, এইটুকু অস্পষ্ট মনে পড়ছে। ডা. এ. এম. ও গনির উপরের তলার এপার্টমেন্টে সিঁড়ির দিকে যে বসবার ঘরটি ছিল, সেখানে আমরা—দু'হাতের আঙুলে গোনা যায়—মাত্র কয়েকজন লোক জড়ো হয়েছি বেলা এগারোটা নাগাদ। গৌরী যেমন নিরাভরণ থাকতে ভালবাসত, ঠিক তেমনই এসে একটা চেয়ারে বসে, ঠিক যেমন তার চিরকালের স্মিত মুখখানা ছিল, সেই মুখটি তুলে, চোখে শান্ত একটি হাসি মাখিয়ে আমাকে বলল, "যাক, একদিন তবু সময় মতো কোনও একটা কাজে যে এসেছ, তা দেখা গেল।" আইয়ুব বেশ পাটভাঙা পায়জামার উপরে পাঞ্জাবি পরে ঘরে ঢুকেছিলেন। গায়ে জহরকোট কিংবা একটা শাল চড়ানো ছিল, এখন আর পরিষ্কার মনে নেই। জানি আমার মনটা ভার হয়েছিল। হাসি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল মুখ থেকে। সৌজন্যমূলক কথা ছাড়া আর কিছু বলতে মন সায় দিচ্ছিল না। ঘরে সে সাত-আটজন আমরা ছিলাম সকলেই অত্যন্ত নিম্ন স্বরেই কথা বলছিলাম। তবু কয়েকটি পরিচারিকার ত্রস্ততা, খাবার প্লেট, চায়ের কাপ এবং জলের গেলাসগুলি—সবাই মিলে ছোট ঘরটির মধ্যে অকারণ একটা ভিড়ের ভাব তৈরি করে দিচ্ছিল। কোথায় একটা টাইম পিস্, কিংবা দেয়াল ঘড়ি ছিল। এরই মধ্যে তার টিক্ টিক্ আওয়াজটা সবচেয়ে বড় হয়ে আমার কানে বাজছিল।

রেজিস্ট্রার শেষ পর্যন্ত কলমটা আমার হাতে দিলেন। বাঁধানো, মোটা রুল করা একটা খাতায় আগেই বরপক্ষের হয়ে ডা. গনি সই করেছিলেন। মেয়ের দিকের হয়ে গৌরীর সই-এর তলার কোনও একটা জায়গায় আমারও স্বাক্ষর পড়ল।

গৌরী দত্ত পূর্ববঙ্গের একটি অসাধারণ উচ্চমধ্যবিত্ত ঘর থেকে এসেছিল। তৎকালের ময়মনসিংহ জেলার সদর মহকুমার সিঙরৈল গ্রামের ওই নাম মহকুমায় কিংবা সেকালের প্রকাণ্ড ময়মনসিংহ জেলায় এমন লোক ছিল না যে জানত না। আমার মাতামহী ওই সিঙরৈলের দত্ত বাড়ি থেকে এসেছিলেন, যে বাড়ির উত্তরসূরী ছিল গৌরী। গৌরীর বাবা ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত এই বংশের চার ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠতম এবং চার জ্যোতিষ্কের মধ্যে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা জ্যোতির্ময় নক্ষত্র। হ্যারিকেন লণ্ঠনের পীতাভ আলোয় চোখ জুড়ে আমার আগে আমার দিদিমা কত সন্ধ্যায় যে আমাকে কোলের কাছে বিছানায় নিয়ে ওই অস্পষ্ট নক্ষত্রটি দেখিয়েছেন, তাঁর মা-মরা, কোলে পিঠে করে মানুষ করা আদরের ছোট ভাইটির কথা কত হাজার বার যে শুনিয়েছেন, তা কী করে বোঝাব। আমার ছোটবেলায় ঘুমিয়ে পড়ার গল্পের সবচেয়ে বড় রাজপুত্তুর ছিলেন ধীরেন্দ্রমোহন। অদ্ভুত আদরের ডাকনাম ছিল তাঁর 'নুনু'. আমার দিদিমা ছাড়া তখনই ওইটি ব্যবহার করার আর কোনও লোক ছিল না।

তাঁর পাটনার বাড়িতে নিজের পুত্রকন্যা ছাড়া নিজ মহকুমার দূরাত্মীয় এবং দুর্ভাগা আরও চার- পাঁচটি কিশোর এবং যুবককে নিয়ে ধীরেন্দ্রমোহন এবং তাঁর নীরব সহধর্মিণী একটি 'আশ্রম'ই চালাতেন। দিদিমার কাছে ওই আশ্রমের কঠোর নিয়মাবলি, সাত্ত্বিক আহার, মেঝের উপরে কম্বলে শোওয়া, দিনে কয়েক ঘন্টা চরখা কাটা এবং স্বাবলম্বনের দীর্ঘ প্রশিক্ষণ তালিকা একটা বিশেষ গর্বের বস্তু ছিল। ধীরেন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুরেশচন্দ্র দত্তর মনোবিজ্ঞানের বই দর্শনের ছাত্রদের নাকি না পড়ে উপায় ছিল না। তাঁরই কৃতী একমাত্র সন্তান সাধন দত্ত। এখন

পশ্চিমবঙ্গের সব শিক্ষিত বাঙালি বাড়িরই একটি পরিচিত ঘরোয়া নাম।

যে-সুরেশচন্দ্রের বই ছাড়া বি এ পরীক্ষার্থীরা মানসিক কৃষ্টি অর্জন করতে পারে না বলে শুনেছিলাম, সেই সুরেশচন্দ্রের স্ত্রী অর্থাৎ গৌরীর জ্যেঠিমা এবং তার জ্যেঠামশাই সম্বন্ধে গৌরী একটি নিভৃত সত্য লিখে গেছে : "...তাঁর নিরন্তর সহায় ছিলেন শান্ত ধীর সদাপ্রসন্ন অধ্যাপক স্বামীটি। স্বামী-স্ত্রীতে সংসার পরিচালনা ছাড়াও জাগতিক পরমার্থিক অন্য নানা ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করছেন, একসঙ্গে কিছু পড়ছেন, এমনটা আমাদের ছেলেবেলায় খুব বেশি দেখতে পেতাম না। জ্যেঠামশাই জেঠিমা এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম ছিলেন। খবরের কাগজই হোক, বা সাহিত্যই হোক, কিংবা মনোবিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধই হোক, অনেক সময় তাঁরা একসঙ্গে পড়তেন, আলোচনা করতেন, আবার একই খাতায় কখনও ইনি কখনও বা উনি মনের কথা লিখে রাখতেন।"

গৌরী এক জায়গায় লিখেছে, "তাঁদের দাম্পত্য আকৈশোর আমাব আদর্শ হয়ে আছে।" এই কথাটায় আমি পরে আর একবার ফিরে আসব।

সিঙরৈলের বাড়ির ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে আর একজন সুরেন্দ্রমোহন, বয়োজ্যেষ্ঠ, বিদ্যাবত্তায় কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতার তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক বিচারে কিছুই নন। কিন্তু তাঁকে সমস্ত কিশোর গঞ্জ-ময়মনসিংহের হিন্দুসমাজ মাথায় তুলে রেখেছিল সম্মানে শ্রদ্ধায়, আশ্রমপিতার মতো গুরুত্বে। উনি এবং ধীরেন্দ্রমোহন বিচারপ্রবণ তুলাদণ্ড হাতে ধরে নিষ্কম্প চিত্তে এঁরা দু'জনেই ন্যায়-অন্যায় অতি সূক্ষ্মমাত্রায় মাপতে পারতেন। সুরেন্দ্রমোহনের নৈতিক শুদ্ধাচারিতার মধ্যে গান্ধীর নীতিশাস্ত্র প্রবেশ করেনি, ধীরেন্দ্রমোহনের সমস্ত চিত্তাকর্ষটিই আবৃত ছিল গান্ধীধর্মে, গান্ধীর ন্যায় আপোষহীন সত্যপরীক্ষার সংগ্রামে। হৃদয়কে দৃঢ় এবং আশাকে নিঃস্বার্থ করার সঙ্কল্প তিনি নিয়েছিলেন প্রথম যৌবনে, বোধহয় বিংশতি বর্ষে পদার্পণের প্রায় সমসময়ে। আব কখনও ফিরে তাকাননি। সাংসারিক ক্ষুদ্রতা, সন্তানদের ভিন্নগামিতা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের নিষ্প্রভ স্বাধীনতা কিছুই তাঁকে আর বিচলিত করতে পারেনি। ব্যক্তিব জীবনের যে সরল মহনীয়তা গান্ধী অর্জন করতে চেয়েছিলেন ধীরেন্দ্রমোহন সেই ব্রতকে নিজের উপবীত ও ইষ্টমন্ত্রের মতো গ্রহণ করে ক্ষমাহীন, মমতাহীন ঊষর কিন্তু সুউচ্চ একটি পর্বতের মতো তিনি নিজেব জীবনকে দাঁড় করালেন—আমাদের নিকটাত্মীয় পরিবার এবং সমাজমধ্যে একাধারে একটি প্রকাণ্ড আদর্শ এবং একটি অলঙ্ঘনীয় নিষেধাজ্ঞার মতো। ধীরেন্দ্রমোহন এবং তদীয় কন্যা গৌরী আমাদের জীবনের অন্যতম প্রধান বিস্ময়।

গৌরী যখন বিহারের কর্কশ মাটি থেকে সজল বঙ্গদেশে এল, তখন কার না মনে হয়েছে যে, নীরবে পিতার ইষ্টমন্ত্র জপ করেই ও অলক্ষে অসাধারণ তপস্বিনী হয়ে উঠবে? তখন আমি কলকাতার পাড়ায় পাড়ায়, বিশেষত বস্তি অঞ্চলে দলবল এবং চরখা কাঁধে নিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে, গান গেয়ে (ভাবতাম) দেশোদ্ধার করছি। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে শুধু আমাদের খদ্দর এবং গান্ধীচিন্তা দেখলে মনে হত আমরা তিনজন যে খুব কাছের লোক তা তো বটেই, একই সংস্কৃতির মধ্যে আমরা জীবন কাটিয়ে দেব নিঃসন্দেহে।

কিন্তু গৌরী এবং ধীরেন্দ্রমোহন ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। এদের দু'জনের কেউই মাটির তৈরি নয়। অনেক তাপে পুড়িয়ে বিষ্ণুপুরের টেরাকোটাও নয়। পিতা এবং কন্যা কৈশোর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের ভিতরের উত্তপ্ত ইস্পাতকে ক্রমাগত শাণিত করে গেছেন। একদিনের জন্যও, কোনও নৈতিক প্রশ্নে, দ্বিধায় কিংবা সঙ্কটে সে ইস্পাত ভোঁতা হয়নি। ওই ইস্পাতের জন্যই গৌরী, আইয়ুবের পরিণয়বদ্ধ হল। ওই ইস্পাতের জন্যই ধীরেন্দ্রমোহন আর তার মুখদর্শন

করলেন না। যখন আমাদের চোখে লালসার কবিতা, চঞ্চল গদ্য এবং বিতর্কের ধূমায়িত অসন্তোষ তখন ওই স্নিগ্ধনয়না, মৃদুভাষিণী তরুণীটি তার হৃদয়ের মধ্যে একটি ছোট ইস্পাতের কারখানা তৈরি করছে। কেননা, সেটা তার পৈতৃক সম্পত্তি। ওই কারখানায় ইস্পাত পিটিয়ে বিবিধ নীতি ও আদর্শানুগত সিদ্ধান্ত তৈরি করা হচ্ছিল—ঠিক যেমন হয়েছিল পিতার ক্ষেত্রে, তেমনই কন্যার বেলায়ও।

ধীরেন্দ্রমোহন যে-শ্রেণীর আদর্শবাদী, তাঁর পক্ষে একজন ছাত্রী এবং তদীয় শিক্ষকের মধ্যে প্রণয় এবং পরিণয় কিছুতেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। ধীরেন্দ্রমোহনের চারিত্র্যশক্তির সামান্য পরিচয় যারা রাখেন, তাঁদের কাছে বিষয়টি মোটেই বিস্ময়কর নয় যে, এই ব্যাপারের পর উনি আইয়ুবকে চরম অশ্রদ্ধার এবং নিজ কন্যাকে বিপথগামিনী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। গৌরীর কাছে একথা তো অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি, কেন সে পিতার ওই অচঞ্চল নীতি অমান্য করল, তা আমার কাছেও কোনও দিন পরিষ্কার হয়নি। যাঁরা ধীরেন্দ্রমোহনের ঋজুতার প্রতিকৃতি দেখেননি, কিংবা তাঁর সবরমতি আশ্রমের দীক্ষার কথা জানেন না—পরিবারের ভিতরে এবং বাইরে—তাদের অনেকে মনে করেছেন, এই বিবাহে পারিবারিক বাধার মূল কারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত হিন্দুর সংকীর্ণ কুসংস্কার। ধীরেন্দ্রমোহন ওই শ্রেণীর সংকীর্ণতার বহু ঊর্ধ্বে জীবনযাপন করেছেন।

বিবাহের আগে পনেরো দিন গৌরীর সঙ্গে অনেক অশান্ত তর্ক-যুক্তির যুদ্ধ করেছিলাম। গৌরীকে আমি বারবার বলেছিলাম, "বয়সে ২৫ বছরের পার্থক্য এ কী সোজা কথা। ২৫ ও ৫০-এর পার্থক্য যত তীক্ষ্ণ, ২৫-এ—৪৩-এ তত নয়। ৬০-এ—৮৫-তেও নয়। মাসি আমার, প্লিজ, আর একবার ভেবে দেখ।" আইয়ুবের রোগজীর্ণ শরীরে তখন সামর্থ্য এত কম যে দিনে একবারের বেশি বিছানা থেকে উঠতেও তার ভাল লাগত না। সাক্ষাতাদি ছিল নিয়ন্ত্রিত। তিনটি শক্তিক্ষয়ী নিদারুণ রোগ তখন তাঁকে প্রায় মুমূর্ষ অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে। ফুসফুস তো অনেক আগেই অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মাত্র একদিকে ধুক্‌পুক্ করছিল। "তাঁর সেবাই যদি তোমার একমাত্র কাম্য হয়, বিয়ের দরকার কী?" এই প্রশ্নটা মূর্খের মতো বার বার মনের মধ্যে আলোড়ন তুলছিল।

কিছুতেই যখন গৌরীর মন পালটানো গেল না,—সে তো ইস্পাতের তৈরি সিদ্ধান্ত, কীভাবেই বা পালটাবে—আমিই ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "ছয় মাস না ঘুরতে তুমি বিধবা হয়ে ফিরবে নিশ্চিত। তবে তাই হোক।" গৌরীর বিয়েতে পিতৃকুলের কেউ থাকবে না, আমার মন আবার তাতেও রাজি হতে চাইছিল না। ও অনুরোধ করেনি, আমি নিজেই বললাম, "তোমার পাশে থাকব।" আজ অনস্বীকার্য ভাবে মনে আসছে যে, আইয়ুবের সহধর্মিণী ধীরেন্দ্রমোহনের সহমর্মিনী বিয়ের দিনেও ছিলেন, মৃত্যুর দিনেও ছিলেন। মাঝখানে হয়ত আরও বেশি।

ধীরেন্দ্রমোহন ছিলেন মহীরুহের মতো, কিন্তু আকাশচুম্বী। আইয়ুবও অনেকটা সেইরূপই—প্রকাণ্ড এবং গগনাবৃত বিস্তার তাঁর। লখনউওয়ালার খানদানি সৌজন্যের উপর শিক্ষিত বাঙালি ব্রাহ্মপনার একটা পালিশ এমনভাবে পড়েছিল যে, কোনটা আসল বর্মা কাঠের ঝিলিক, কোনটা পালিশের মাহাত্ম্য তা বুঝবার সাধ্য ছিল না। তদুপরি, ওই সময় গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, আয়তাকার, উন্নতনাসা এই বুদ্ধিজীবী মানুষটির সর্বাঙ্গে ছিল কাব্যময় একটি দূরাগত মরণের ছায়া। স্ত্রী, পুরুষ, কে তাঁর ওই 'শেলিয়ানার' মোহজাল কেটে বেরোতে পারে, বিশেষত যেহেতু ওই দেহটি ধারণ করে রেখেছিল বহু অধীতবিদ্যার প্রজ্জ্বলন্ত একটি সৌরমণ্ডল! (আমার দুইটি বাংলা উচ্চারণ আইয়ুব শুদ্ধ করে দিয়েছিলেন, তাতে আমার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না।)

কিন্তু একটি মহীরূহের ছায়াতলে যে তরুণীর জীবন বিপন্ন, সে সমস্ত বঙ্গদেশ খুঁজে আর একটি মহীরূহকে কেন বিবাহের জন্য নির্বাচন করল? এই প্রশ্নটির সদুত্তর গৌরী রেখে যায়নি। কাজেই একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না, সে কি আধুনিকা তরুণীর মতো আইয়ুবের প্রেমিকা হতে চেয়েছিল? অথবা, তার অন্তরের মধ্যে ছিল—জ্যোতি দত্ত লিখেছেন—মধুবনীর রাধিকা। কৃষ্ণকামনাই তার বিধাতা।

নিজের জেঠিমা সম্বন্ধে সে লিখেছে, ওই বিধিনির্দিষ্ট এবং ঐতিহ্যপন্থী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভঙ্গি মিশ্রিত দাম্পত্যই গৌরীর আদর্শ মনে হয়েছিল। খুব সম্ভবত এই অনুমান সত্য যে, আইয়ুবের সঙ্গে এবং তার কাছ থেকে ওই প্রকারের দাম্পত্যসুখই গৌরী লাভ করেছিল। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের প্রশ্নটি অন্য জায়গায়। নিজের বিবাহের বহু বৎসর পরে গৌরী ওই জেঠিমা-জ্যেঠামশাই-এই প্রতিকৃতিটি অন্তর দিয়ে আঁকে। এই চিত্রটি এঁকেও কি একটা সমান্তরাল দাম্পত্যের সান্ত্বনা পেতে চাইছিল? যৌবনোন্মত্ত প্রেম, আধুনিক দাম্পত্য কোনও দিনই সে মনের মধ্যে স্থান দেয়নি, এই কি সত্য? অথবা, তারুণ্যের রক্তোচ্ছল দয়িতা সে হতে পারেনি বলেই জ্যেঠিমার দাম্পত্যজীবনকে আদর্শের পিঁড়িতে বসিয়েছিল? সুরেশচন্দ্র এবং অমিয়বালা তৎকালের বিচারে একটি স্নিগ্ধ এবং লাবণ্যময় আধুনিকতায় নিজেদের দাম্পত্য জীবন তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তার দুই প্রজন্ম পরে, একজন সমাজসংস্কারক তেজিয়ান মহিলার হৃদয় ওই ধরনের দাম্পত্যকে আদর্শ বলে ঘোষণা করছে কেন?

গৌরীর জীবনের অন্যান্য বিদ্রোহ, বিপ্লব, সংস্কার ও খ্যাতি লক্ষ করলে দেখা যাবে, সম্পূর্ণই সিঙরৈলের বাড়ির চরিত্রপন্থী—এই বাড়ির লোকেরা প্রত্যেকেই সঙ্কটেও মধুরভাষী, আত্মস্বার্থহানিতেও দৃঢ়মনা। তাঁরা পরহিতৈষী এবং সঙ্কল্পবদ্ধ। এই দত্তদের সকলেই সহাস্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জীবনযাপন করে গেছেন। গৌরীও। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এই প্রতিশ্রুতির বৃক্ষটি পাল্টেছে। জনকল্যাণব্রতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জীবনে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে, কিন্তু সকলেই ব্রতচারী জীবনে অঙ্গীকারবদ্ধ থেকেছেন। গৌরীও থেকেছে, ধীরেন্দ্রমোহনও থেকেছেন। সেই অর্থে আইয়ুবের সঙ্গে বিবাহ সত্ত্বেও গৌরীর নৌকো ছিল পিতৃকুলের ঘাটে বাঁধা। ওর রাজনীতির মধ্যে আইয়ুবের মনোভঙ্গির সাদৃশ্য যে অতি অস্পষ্ট ছিল, তা অস্বীকার করব কী করে?

সাহিত্যরসিক, বিদ্যাবত্তার প্রখর অধিকারী, দর্শনের আচার্য, অন্যতম লোকশ্রেষ্ঠ মানুষ আইয়ুবের মধ্যে দীপ্যমান দেশাত্মবোধ ছিল না, কিংবা র‍্যাডিকেল হিউম্যানিস্টদের চিন্তার সংস্পর্শে এসে তিনি রাজনীতির একটি ধূসর নদীকূলে এসে কিছুদিনের জন্য দাঁড়াননি, একথা কেউ বলবে না। সেই অর্থে দীপ্যমান দেশচেতনা কি বুদ্ধদেব বসু, কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তর ছিল না? তাঁরা যে অর্থে, যে সংজ্ঞায় রাজনীতি এবং দেশচেতন ছিলেন, সেই অর্থে আইয়ুবও রাজনীতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু গৌরীর দেশপ্রেম-পিপাসা ছিল তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। গৌরী আপনাকে তাঁর দেশের জন্য উৎসর্গ করেই রেখেছিল, কিন্তু প্রথম জীবনে দাম্পত্য এবং পরবর্তীজীবনে ওই দুরারোগ্য এবং দুঃসহ অস্টিও-আরথেরাইটিসের বেড়া ডিঙিয়ে বেচারি প্রত্যক্ষ এবং সংঘর্ষমূলক রাজনীতির ময়দানে পৌঁছাতে পারল না। তথাপি, ১৯৭৫-'৭৬ এ ভারতীয় এমারজেন্সির অমাবস্যার বৎসরটিতে যাঁরা গৌরীকে কলকাতায় সহযোদ্ধা হিসাবে পেয়েছেন—যেমন, গৌরকিশোর ঘোষ ও তদীয় পত্নী শীলা, অথবা জ্যোতির্ময় দত্ত ইত্যাদি—তাঁরা জানেন রাজনীতির ব্যাপারে গৌরী ছিল প্রত্যক্ষবাদী, কর্মিষ্ঠ এবং এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ যারা 'নামে' ঢেউ ভরা সমুদ্রে অনিবার্য তাড়নায়। এবিষয়ে অধ্যাপক এবং তাঁর

প্রেমিকা ছিলেন দুই ভিন্ন জগতের মানুষ।

গৌরী কতটা আইয়ুবের সংস্কৃতির সাধিকা হয়ে উঠেছিল, কতটা তাঁর প্রিয়সখী, চিন্তার বান্ধবী, অথবা কতটা সে ছিল ওই উপভোগ্য আইয়ুব-কৃষ্টির একজন উচ্চশ্রেণীর সমঝদার ভোক্তা মাত্র তা বলা কঠিন। জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে ও যে সমাজহিতৈষণায় প্রত্যক্ষকর্মী হয়ে রাস্তায় নেমেছিল, তাতে একটা বিষয় সুস্পষ্ট। কোনও এক ধানভরা খালপথে শ্যাওলা ও শামুকের জলেভাসা জঙ্গল পেরিয়ে ও যেতে চেয়েছিল সিঙরৈলের পাটে। ওখানে তালগাছগুড়ি দিয়ে বাঁধানো ঘাটে নিশীথিনীব ছায়ায় কে জানি গৌরীকে ডেকেছিল সেদিন : "আবার এসেছ ফিরে?"

সৌজন্যে : চতুরঙ্গ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৫ (মূল প্রবন্ধটিব পরিমার্জিত রূপ)

[শ্রী অমিতাভ চৌধুরী বিশিষ্ট লেখক ও 'দেশ' এব প্রাক্তন সম্পাদক]

ঢেউ-সমুদ্রের শিখরে একটি বাতিঘর

জ্যোতির্ময় দত্ত

বিজ্ঞানের জগতে হয়তো কোমল স্ফটিক কিংবা ফুটন্ত বরফ সম্ভব নয়, কিন্তু পরম কোমলতা ও নিখাদ দৃঢ়তার সমন্বয় ঘটেছিলো গৌরী আইয়ুব-এর চরিত্রে। দেখতে ছিলেন ননীর পুতুলের মতো। মনে হতো সূর্যের তাপে বেশিক্ষণ রাখলে গলে যাবেন। গায়ের রঙ ছিলো দুধে-কমলা। উচ্চাবণ আধো-আধো। এমন নারী ঘরে থাকলে ঝাড়লণ্ঠনের দরকার হয় না। কিন্তু তিনি শুধু বৈঠকখানার শোভা ছিলেন না। এমন একটা সময় ছিল যখন ইন্দিরা গান্ধীর পুলিশ তাঁকে ঘিরে চরকি কেটেছে, রাষ্ট্রের সমবেত শক্তি জড়ো হয়েছে তাঁকে আঘাতেব জন্য, কিন্তু তাঁকে টলাতে পারেনি। যেদিন কলকাতা পত্রিকার তিনজন—শম্ভু রক্ষিত, প্রশান্ত বসু এবং আমি—কাগজ বার করে ফেরার হলাম, সেই ১৯শে সেপ্টেম্বর '৭৫ থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর '৭৬, যেদিন আমি ভাঙা পা নিয়ে স্পেশাল ব্রাঞ্চেব কাছে ধরা দিলাম হাওড়ার ডোমজুড়ে। সেই বারো মাস আমাদের তিন জনের বেঁচে থাকাব পক্ষে গৌরী ছিলেন অপরিহার্য, ডুবুরির যেমন অক্সিজেনের নল। সেই বারোটা মাসে পূর্ব ভারতের জঙ্গল, পাহাড়, হাট, নদী, মানুষ, যা দেখেছি তা বলার উপযুক্ত নিরুত্তাপ দূরত্বে এখনও আমি পৌঁছুইনি। কত অজানাকে পেয়েছি তখন বন্ধুরূপে, আব কত বন্ধু আমাদের করেছেন দরজা থেকে বিদায় শুধু নয়, আমাদের হদিশ দিয়ে দিয়েছেন পুলিশকে। কোনও কোনও স্মৃতি অতি মধুর—যেমন কোপাই নদীতীরে বিজয় মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে সপ্তাহযাপন। কিংবা শ্রীমানীদের বাড়িতে, চন্দননগরে। কিংবা মীনাক্ষীর আর আমার রাত্রিবাস খড়ের বিছানায়, 'মহারাজ হোটেলে', ময়ূরভঞ্জে। বেদনারও আছে কিছু। পুরো আতিথ্য দিয়েছিলেন বালিগঞ্জে অমিয় দেব ও শান্তিনিকেতনে অশীন দাশগুপ্ত। বন্ধুত্বে অকৃপণ ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং নায়কোচিত ভূমিকা ছিলো দেবপ্রসাদ সিংহের। কিন্তু সবার উপর, পুরো ঝড়-ঢেউ-সমুদ্রের মধ্যে স্থির বাতিঘর ছিলেন গৌরী আইয়ুব। তখন তাঁর পার্কিনসন রোগে পীড়িত দার্শনিক স্বামী বিছানায় আবদ্ধ। যতই গোপনে ও নিঃশব্দে ৫ পার্ল রোডে যাই না কেন, কী করে যেন শয্যাবন্দী

আইয়ুব পাশের ঘরে আসার উপস্থিতি টের পান এবং আমার যাতায়াত বন্ধ করতে গৌরীকে মিনতি করেন। আইয়ুব-এর ভয়, আমার কারণে গৌরীকে পুলিশ তুলে নিয়ে যাবে, অসহায় স্বামীকে অথৈ জলে ফেলে। এবং তাঁর ওই ভয় যে মোটেই অলীক ছিল না, তা রাষ্ট্রপতির পুরস্কারবিজয়ী স্পেশাল ব্রাঞ্চের অশোক খাসনবিস আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন। পুলিশ গৌরীকে ধরেনি কারণ ফাঁদে গৌরী ছিলেন জীবন্ত টোপ। এবং দু'একবার ফাঁদের দড়ি আমার ঘাড়ে একটু হলে পড়ে যাচ্ছিল।

বন্দোবস্তটা ছিল মন্দ নয়। কলকাতা পত্রিকা প্রকাশ হলে তা যে নিষিদ্ধ হবে, তা আমরা জানতাম। গৌরকিশোর ঘোষ তখন বাড়ি বসে অপেক্ষা করবেন পুলিশের অবধারিত কড়ানাড়ার। আর আমরা তিন চরিত্র সাঁকো ডিঙিয়ে, বেড়া টপকে, নালা সাঁতরে পুলিশকে দেব ফাঁকি, বার ক'রে যাব কাগজ। এসবের রেস্ত? তারও ব্যবস্থা করলেন গৌরকিশোর। র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট দলের চেয়ারম্যান শান্তিব্রত সেন গৌরীকে হপ্তায়-হপ্তায় দেবেন ২০০ করে টাকা। তাই দিয়ে চলবে তিন ফেরার-এর আহার-আশ্রয়-চলাচল। গৌরী তাই ছিলেন আমাদের ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, তাড়া খেয়ে আধ দণ্ড জিরোনোর জায়গা। ইমার্জেন্সির কারণে যেসব রঙিন চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে রামধনু-রঙা ছিলেন শান্তি সেন। মোট মাত্র ১৫ দিন হাজতবাস করার পর, পুলিশের সামনেই, তিনি গৌরীকে সোৎসাহে চিৎকার করে বলেছিলেন 'তোমার কোনও ভয় নাই! আমি ওদের কিছু কই নাই!'

'ইমার্জেন্সি'-র সময় গৌরীকে যে কতবার আমার চিরকুট ভাতের সঙ্গে মেখে খেয়ে ফেলতে হয়েছে, অথবা আমার নাম-লেখা লেফাফা দিয়ে নিজেকে করতে হয়েছে ব্যস্ত বীজন, তার ইয়ত্তা নেই। আইয়ুব বিশ্বাস করতেন জগতে একটা শুভ আছে, একটা শৃঙ্খলা আছে, সবকিছুর আছে উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কী প্রবল বিতর্কই না হত ৫নং পার্ল রোডে। আমরা তখন ঘোর আধুনিক ; বোদলেয়ার-এর পাপবোধ কেন রবীন্দ্র-কাব্যে অনুপস্থিত, তা নিয়ে চলত বিস্তর বিশ্লেষণ। প্রত্যেক প্রজন্মেরই স্মৃতিতে একটা স্বর্ণযুগ থাকে ; আমার কাছে সেটা সেই সময় যখন সুধীন্দ্রনাথ--রাজেশ্বরী দত্ত আলো করে আছেন ৬ রাসেল স্ট্রিট, বুদ্ধদেব-প্রতিভা বসু ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, আর আবু সয়ীদ গৌরী আইয়ুব ৫ পার্ল রোড। এই প্রত্যেকটি ঠিকানা ছিল এক একটা উত্তেজক আড্ডা, এক একটা ব্লুমসবারি সার্কল, এক একটা মানসঝর্ণা যেখানে নানান বিরুদ্ধ মতাবলম্বী প্রাণী একসঙ্গে বিশ্বধারা করত আনন্দে পান। আজ সেইসব তর্কের পরিসমাপ্তি আইয়ুবের অস্তিবাচক দর্শনের ভয়াবহ পরাজয়ে : যদি সত্যই কোনও শুভ শক্তি থাকে তবে সবচেয়ে যাঁরা গুণী, যাঁরা সুন্দর, যাঁরা অবিমিশ্র ভাল, তাঁদের কেন এত তিলে-তিলে, এত কষ্ট পেয়ে, মরতে হয়? কিষেণগড়ের রাধার মতো গৌরী। কৃষ্ণের মতো আয়তচক্ষু অশীন। আদর্শ মানুষ এঁরা। এঁরা সংযমের পরাকাষ্ঠা। সুশৃঙ্খল ছন্দোবদ্ধ এঁদের জীবন। অন্যদের কেবলই এঁরা উপকার করেছেন। বোহেমিয়ান নন, স্বেচ্ছাচারী নন, বিনাশী নন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় কিংবা ঋত্বিক ঘটক-এর পরিণতির তবু ব্যাখ্যা হয় (সেই শক্তি! যে আমার কারামুক্তির সংবাদ জানাতে একা চ'লে গিয়েছিলো প্রেসিডেন্সি জেলে ১৯৭৭-এ) কিন্তু গৌরী কিংবা অশীন কিংবা আইয়ুবকে যে ঈশ্বর এত যন্ত্রণা দিয়েছেন তাঁকে আমি শুভ বলে মানতে পারি না। ইনি যদি ঈশ্বর হন, মার্কি দ্য সাদ-এর কী এমন অপরাধ?

সৌজন্যে দেশ, ৮ আগস্ট ১৯৯৮

[শ্রী জ্যোর্তিময় দত্ত বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সাংবাদিক]

গৌরী আইয়ুবের সঙ্গে আমাদের পরিচয়

অমলেন্দু দে

কমিউনিস্ট পার্টির সূত্রে আমার স্ত্রী নাসিমাব সঙ্গে ডাঃ গণির পরিবারের অন্তরঙ্গতা ছিল। আবু সয়ীদ আইয়ুব ছিলেন ডাঃ গণির ছোট ভাই। তিনি নাসিমাকে দেখেছেন তাঁদের বাড়িতে। আমাদের বিয়েব পরে আবুসয়ীদ আইয়ুবের বিয়ে হয়। গৌরী দত্ত যখন পার্ল রোডের এই বাড়িতে এলেন তখন আবুসয়ীদ আইয়ুব আমাদের বাতে তাঁদের সঙ্গে খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। আমবা তখন পার্ক সার্কাসের দরগা রোডের একটি মেসের এক অংশে বসবাস করছি। ডাঃ গণিই আমাদেব এই আমন্ত্রণের খবরটি দিলেন। তিনি বললেন, "আমার ভাই তোমাদের দুজনেব সঙ্গে আলাপ কবতে চান এবং গৌরীর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চান।"

সেদিনের অভিজ্ঞতা এখনও আমরা সযত্নে লালন কবছি। গৌরী আইয়ুব দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। মিষ্টি হেসে তিনি নাসিমার হাত ধরে ওকে ঘরে নিয়ে গেলেন। অসুস্থ আবু সয়ীদ আইয়ুব গভীর আন্তরিকতা নিয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। এখনও সেই চিত্রটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁদের সঙ্গে কয়েকঘণ্টা আলোচনার দুর্লভ সৌভাগ্য ভাবতে গিয়ে এখনও আনন্দ অনুভব করি। গৌরী আইয়ুব আদব করে নাসিমাকে কাছে বসালেন। ডাঃ গণির কাছে আমাদের বিয়ের খবর পেয়ে আবু সয়ীদ আইয়ুবের মনে অনেক প্রশ্ন জমেছিল। গৌরী আইয়ুবকে আগেই তিনি আমাদের সম্পর্কে বলেছিলেন। কি করে আমাদের এই দুঃসাহস হল? এই প্রশ্ন করলেন আবুসয়ীদ আইয়ুব। আমরা তাঁকে বলেছিলাম, "মার্কসবাদের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ায় এবং কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকায় আমাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হয়নি।" পরের প্রশ্নটি ছিল, আমাদের দু পরিবারে এর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল? তাঁরা দুজনেই তা জানতে চান। নাসিমা তার পরিবারের অবস্থার এক বিস্তৃত বর্ণনা দেয়। তার বাবা-মা স্বাভাবিক কারণেই খুব ভেঙে পড়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, আমার বাবা গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হলেও ক্রমশ সামলে নিতে পেরেছিলেন। বিয়ের পরে আবুসয়ীদ আইয়ুব ও গৌরী আইয়ুবকেও কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাই আমাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন।

সেদিন আব একটি বিষয়েও আমরা আলোচনায় মগ্ন ছিলাম। তাতে গৌরী আইয়ুবও অংশ গ্রহণ করেন। আমাদের বিয়ে কিভাবে হয়েছে তা তাঁরা জানতে চান। আমি বলেছিলাম, ১৯৫৪ সালের 'স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্ট, অনুযায়ী আমাদের বিয়ে হয়েছে। এই আইনে ধর্মান্তরিত না হয়ে বিয়ে করা যায়। আমাদের দেশের একটি অনন্য আইন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ঐকান্তিক প্রয়াসেই এই আইনটি পাশ হয়। তাঁর স্বপ্ন ছিল, এমন একটি ভারত গঠন করা যেখানে একই পরিবারে নানা ধর্মের বর্ণের মানুষ বসবাস করতে পারবে। এই আইনের দ্বারা একই পরিবারে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ধর্মান্তরিত না হয়ে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করার সুযোগ পেল। এই আইনকে কেন্দ্র করে আমাদের আলোচনা বেশ জমে উঠল। ভারতের মত বহুধর্মের দেশে এই বিবাহ আইনের যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাও আমাদের আলোচনায় প্রকাশ পেল। বাঙালি হিসেবে আমি ও নাসিমা সর্বপ্রথম এই আইন অবলম্বনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই, এই খবরে তাঁরা দুজনেই খুশি হলেন।

এইভাবে ডাঃ গণির বাড়িতে আমাদের পরিচয়ের গণ্ডি আরও প্রসারিত হল। তারপর থেকে

তাঁদের বাড়িতে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে অথবা কেউ সঙ্গীত পরিবেশন করতে এলে গৌরী আইয়ুব আমাদের খবর দিতেন। সব সময়ে যেতে না পারলেও আমাদের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। আমাদের ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পারস্পবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন অন্তরায়ের সৃষ্টি করেনি। কারণ একটি বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতের খুবই মিল ছিল। তাহল ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতকে গঠন করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা আমরা আন্তরিকভাবেই উপলব্ধি করি। ধর্মান্ধতা ও অসহিষ্ণুতা যাতে আমাদের সদ্য গড়ে ওঠা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে না পারে তার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবোধে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকায় বারে বারে তা প্রতিফলিত হয়। এই সংগ্রামে আমরা একই সারিতে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না।

আবুসয়ীদ আইয়ুবের প্রয়াণেব পর গৌরী আইয়ুবের বাসস্থান আমাদের আলোচনার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতে ধর্মীয় মৌলবাদ ক্রমশ আগ্রাসী রূপ ধারণ করে। এই বিষয় নিয়ে যে সব আলোচনা তাঁর বাড়িতে হত তাতে শিবনারায়ণ রায়, গৌবকিশোর ঘোষ, হোসেনুর রহমান, আবদুর রউফ, মীরাতুন নাহার ও আরও অনেকে উপস্থিত থাকতেন। গৌরকিশোর ঘোষ, হোসেনুর রহমান ও আমি অনেক জায়গায় সেক্যুলার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থনে জনমত গঠন করতে দায়িত্ব পালন করি। আবার আমাদের অভিজ্ঞতার কথাও গৌরী আইয়ুবের বাড়িতে আলোচনায় উল্লেখ করি। আমাদের মধ্যে এই সব আলোচনায় যেভাবে মত বিনিময হত তাতে আমরা খুব লাভবান হতাম। চলতে কষ্ট হত গৌরী আইয়ুবের। তা সত্ত্বেও তাঁর আপ্যায়ণে কোন ত্রুটি ছিল না। তাঁব যুক্তি নির্ভর সুচিন্তিত সুস্পষ্ট বক্তব্য সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গেই শুনতেন।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর কিভাবে ধর্মান্ধতার প্রতিরোধে দায়িত্ব পালন করা যায় তা নিয়ে গৌরী আইয়ুবের বাড়িতে আমাদের আলোচনা হয়। পার্ক সার্কাসে অসহিষ্ণুতার পরিবেশ কিভাবে প্রকট হচ্ছে তার বিষয়ে তাঁর উদ্বেগের কথাও তিনি আমায় বলেন। বাংলাদেশ ঘুরে এসে সেখানে তাঁর কি অভিজ্ঞতা হল সে বিষয়েও একদিন আমাকে বলেন। তিনি সেখানে উচ্চবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে ছেলেমেয়েদের কোরান পাঠের এবং ইসলামি আচরণবিধি শেখানোর বিশেষ তৎপরতা লক্ষ্য করেন। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আছে জেনেই মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই এই বিষয়টি উত্থাপন করেন। বাংলাদেশে শিক্ষিতসম্পন্ন পরিবারগুলো কতটা সেক্যুলার ভাবনাকে অবলম্বন করে চলছে তা পরিমাপ করতে তিনি চেষ্টা করেন। 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের' প্রভাব কতটা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের এখনও অনুপ্রাণিত করছে তাও উপলব্ধি করতে তিনি প্রয়াসী হন। এমনি অনেক কথাই তাঁর সঙ্গে আমার হয়েছে।

তসলিমা নাসরিন রচিত 'লজ্জা' উপন্যাসটি ঢাকায় প্রকাশ হওয়ার কয়েকদিন পর আমার হাতে আসে। এই খবর পেয়ে গৌরী আইয়ুব বইটি তাঁকে পড়তে দিতে অনুরোধ করেন। আমি বইটি হাতে পেয়েই আমার নাম লিখেছিলাম। আমি ফটোকপি করে তাঁকে একটি কপি দিয়ে আসি। তখনও বইটি আমাদের বাড়ির বাইরে আর কাউকে দিইনি। গৌরী আইয়ুব নিজে পড়ে বইটি আর কাউকে দিয়ে থাকবেন। তারপর আমার নামাঙ্কিত কপিটি ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের হাতে চলে যায়। কলকাতার একটি পত্রিকায় আমার তীব্র সমালোচনা করা হল। আমি নাকি 'লজ্জা' বইটি সবাইকে পড়াচ্ছি আর তসলিমা নাসরিনের পক্ষে প্রচার করছি। বাংলাদেশের একটি দৈনিক কাগজেও এই নিবন্ধটি পুনরায় মুদ্রিত হয়। এই নিবন্ধে শিবনারায়ণ রায় ও আরও কয়েকজনের

সমালোচনা করা হয়। আমি 'লজ্জা' শুধু গৌরী আইয়ুবকেই দিয়েছিলাম। তাই তাঁর কাছ থেকে এই বইটি নিয়ে গিয়ে যিনি এই ধবনের অপপ্রচারে সাহায্য করেন তাতে তিনি গভীর বেদনা অনুভব করেন। 'সেক্যুলার পথে' চলা কত কঠিন তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করেন এমন কোন একজনের আচরণে তিনি তা আরও বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। আমি তাঁকে এই নিয়ে দুর্ভাবনা করতে নিষেধ করি। এইভাবে 'লজ্জা' বইটি প্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতায় আমাকে ও গৌরী আইয়ুবকে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়।

তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকালের যোগাযোগের ফলে অনেক কথাই মনে হয়। সেই সব কথার বিবরণ দিতে গেলে লেখাটি অনেক বড় হয়ে যাবে। তাই এই সংক্ষিপ্ত রচনার মাধ্যমে আমি ও নাসিমা গৌরী আইয়ুবের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার যে সুয়োগ পেলাম তার জন্য মীরাতুন নাহারকে ধন্যবাদ জানাতে হয়।

[শ্রী অমলেন্দু দে বিশিষ্ট লেখক ও চিন্তাবিদ]

'আমার এই দেহখানি তুলে ধরো'

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘ ঘোষণা করেছে যে ২০০০ সাল থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস রূপে পালন করা হবে। একুশে ফেব্রুয়ারি হল সেইদিন যেদিন মাতৃভাষার জন্য সংগ্রামে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার প্রমুখ কয়েকজন বাঙালি তরুণ পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন। সেই মহান সংগ্রামে যোগ দিতে পারিনি, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে তার সঙ্গে একটা যোগ অনুভব কবি পরের বছর শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত সাহিত্যমেলার উদ্যোক্তাদের সাগরেদী করে।

বাংলা ভাষার জন্য ঢাকার শহীদদের স্মরণে কিছু করা উচিত এই কথাটা কোন আশ্রমিক প্রথম বলেছিলেন? আমার অস্পষ্ট ধারণা, ঢাকার মেয়ে ফরিদা-বীথির মন জয় করার জন্য সুনীল সেনগুপ্তই বলেছিলেন সর্বপ্রথম। যাহোক, সাহিত্যমেলার পরিকল্পনাটা ছিল অন্নদাশঙ্কর রায়ের আর তাঁর প্রধান দুই সহায় ছিলেন গৌরী দত্ত ও নিমাই চট্টোপাধ্যায়।

এর আগে তাঁকে দেখেছি আশ্রমের ভেতর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে আসতে যেতে। আমি ৫২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বর্ষার শেষ দিকে বিশ্বভাবতীতে ভর্তি হই। কিছুদিন পরেই শুরু হয় পুজোর ছুটি। ছুটির পর পৌষ মেলা। তারপরেই ভাইজাগ ইউনিভার্সিটিতে হিস্ট্রি কংগ্রেস। ফলে গৌরীদিকে ভালো করে চেনবার সুযোগ হয়নি। সেই সুযোগ এল সাহিত্যমেলার সুবাদে।

ছোট্টখাট্টো মানুষটিকে পাঠভবনের বালিকা বলেই ভুল হয়। আসলে বিশ্বভারতীর ফিলজফি অনার্সের ছাত্রী। শুনলাম তাঁর বাবাও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলজফির অধ্যাপক ও গ্রন্থকার। দর্শনের ঘরের মানুষ হলেও সাহিত্যের জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল গভীর। তাই অন্নদাশঙ্করও সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের থেকে কাউকে না নিয়ে ক্ষীণদেহিনী ওই দর্শনের ছাত্রীটিকে মনোনয়ন

করেছিলেন প্রধান সহায়দের অন্যতম রূপে।

তখনকার গৌরীদি সম্পর্কে আমার সবচেয়ে স্পষ্ট স্মৃতির কথা বলি। একদিন সাহিত্যমেলার অবসরে গৌরীদিদের বাড়ির বারান্দায় আড্ডা হচ্ছিল। উপস্থিত ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, নিমাই চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সেই আড্ডায় আমি পাণ্ডিত্য ফলিয়ে টি. এস. এলিয়ট সম্বন্ধে বলেছিলাম যে তিনি লেখেন রোম্যান ক্যাথলিক মিশনারির মতো। তাতে গৌরীদি মিষ্টি হেসে মন্তব্য করেছিলেন, 'সবেতে পাকা পাকা কথা।'

শান্তিনিকেতন অবশ্যই আমার জীবন পাল্টে দেয়। কিন্তু ইতিহাসে এম এ পড়ার জন্য ভর্তি হলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার পরেই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে এক বছর গৃহবন্দী। যখন আবার বাইরে চলাফেরা শুরু করলাম তখন নরেন্দ্রনাথ মিত্র একদিন জিজ্ঞেস করলেন যে শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় গৌরী দত্তকে চিনতাম কিনা। তাঁর মুখেই শুনলাম আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে গৌরীদির বিয়ের কথা। একজন উচ্চকোটির বুদ্ধিজীবী ও মনীষী হিসেবে আইয়ুবের নাম জানতাম। আমার জ্ঞান অনুসারে আইয়ুবই 'intrinsic' শব্দটির বাংলা করেছিলেন 'স্বাশ্রয়ী'। যদিও বাংলা তাঁর মাতৃভাষা ছিল না, ছিল অর্জিত ভাষা। আর সেই সময়ই তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' নামে কাব্য সংকলনখানি। আইয়ুব ও গৌরীদিরও বয়সের ব্যবধান ছিল পঁচিশ বছর।

'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা'র একটি আলোচনা আমি লিখি 'উত্তরসূরী' পত্রিকায় এবং 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় আর-একটি লেখেন অধ্যাপক অমলেন্দু বসু। আইয়ুব দুটি আলোচনারই উপর তাঁর লিখিত প্রতিক্রিয়া জানান 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায়। আমি কৃতার্থ বোধ করি।

সেই শুরু হল পার্ল রোডের ফ্ল্যাটে যাতায়াত। তখন মনে হল গৌরীদি তেমনই বালিকাই আছেন বটে, কিন্তু সেই বালিকার ভেতর থেকে একজন দ্যুতিময় ব্যক্তির বিকাশ হচ্ছে। বোধহয় অনেক মতামত অগ্রাহ্য করে আপন বিচারকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম তাঁর কোমলতার আড়ালে এক অভিনব দৃঢ়তা নির্মাণ করেছিল। দূর থেকে আইয়ুবের পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বে অভিভূত হওয়া কিংবা রোমান্টিক কবিদের যুবরাজ শেলির মতো তাঁর অনবদ্য মুখসৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হওয়া এককথা আর তাঁর বংশ-বয়সও ক্ষীণস্বাস্থ্যকে উপেক্ষা কবে তাঁকেই জীবনের সর্বস্ব বলে বরণ করা সম্পূর্ণ অন্য কথা। তার উপরে ছিল ঘোর আর্থিক অনিশ্চয়তার প্রশ্ন। কিন্তু কিছুই দমাতে পারেনি গৌরীদিকে।

এই সময় আমাকে কিছুদিন থাকতে হয় পার্ক সার্কাসের এক নার্সিং হোমে। আমার মা ও দিদিমার পক্ষে যাদবপুর থেকে আসা যাওয়া কষ্টকর ছিল। গৌরীদি তাঁদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি নিয়মিত আমার খবর নেবেন। প্রায় রোজই নতুন নতুন খাবার বানিয়ে আনতেন। এ-ব্যাপারেও তিনি নিজেদের আর্থিক অবস্থাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। ওই ছোট্ট নরমসরম শরীরের মধ্যে কোথায় ছিল অসীম শক্তি ও সাহসের উৎস ; সে-রহস্য আমি ভেদ করতে পারিনি।

সৌভাগ্যক্রমে আবু সয়ীদ আইয়ুব পেয়ে যান 'কোয়েস্ট' পত্রিকা সম্পাদনার কাজ। সম্পাদকদ্বয়ের অন্যজন ছিলেন অম্লান দত্ত। বিলেত থেকে যেমন স্টিফেন স্পেন্সারের সম্পাদনায় 'এনকাউন্টার' পত্রিকা বেরোত তেমনই ভারত থেকে বেরোত 'কোয়েস্ট' পত্রিকা। আমার সৌভাগ্য যে আইয়ুব আমাকে মনোনয়ন করেন 'কোয়েস্ট' এর কাজে, বিশেষত প্রুফ দেখার ব্যাপারে, তাঁকে সাহায্য করারর জন্য। তাঁর দক্ষিণা থেকে আমাকে দক্ষিণাও দিতেন। গৌরীদি তখন যোধপুর পার্কে একটা স্কুলে কাজ করতেন। তখনই পূষণের জন্ম হয়। গৌরীদি

একই সঙ্গে দুর্বল-শরীরী আইয়ুব, নবজাত পুষণ ও স্কুলের খাতার পাহাড় সামলাতেন। তখন দেখেছি প্রচণ্ড চাপেও তিনি কেমন অবিচলিত থাকতেন, প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণ ঘটলেও মানসিক বিক্ষোভকে সংবরণ করতেন অবিশ্বাস্য আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে।

'কোয়েস্ট' পত্রিকার মান ছিল খুব উঁচু। দেশবিদেশের বহু বিখ্যাত মনীষী তাতে লিখতেন। আন্তর্জাতিক মননশীলতায় 'কোয়েস্ট' একটা উল্লেখযোগ্য স্থান করে নেয়। আইয়ুবেরও নাম ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই সুদিন আইয়ুব-গৌরীদির জন্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ফাঁস হয়ে যায় 'কোয়েস্ট' পরিচালনার পেছনে লুকিয়ে রাখা রাজনৈতিক উৎস। আইয়ুব ও অম্লান দত্ত তথাকথিত 'মুক্তি আন্দোলনে'র নামে পাশ্চাত্য শক্তিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চক্রের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ছিন্ন করেন। এতে আইয়ুব পরিবারে আর্থিক সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু আইয়ুব ও গৌরীদি নিজেদেব আদর্শের ব্যাপারে অনড় থাকেন। 'কোয়েস্ট' কর্তৃপক্ষ কোনদিনও আইয়ুবের বা অম্লান দত্তের সম্পাদনার উপর হস্তক্ষেপ করেননি, নিজেদেব ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবু তাঁরা প্রভাবের বা প্রলোভনের সম্ভাবনা থেকেও দূরে সরে যান নিজেদের স্বাশ্রয়ী সত্তার সুখ-শান্তির জন্য।

এর মধ্যে আমি বিয়ে করে বসি। বিয়ের পরে একদিন আইয়ুবকে নিয়ে গৌরীদি এলেন আমাদের বাড়িতে। আখরোট কাঠের একটা কাশ্মীরি বাক্স উপহার দিয়েছিলেন। বাইরে অনেক কারুকাজ আর ভেতরে হাতির দাঁতের তৈরি এক পাল হাতি। তারপর বছরখানেক ধবে চলে আমাদেব যাযাবরের মতো জীবন। কিছুদিন এ-পাড়ায়, কিছুদিন ও-পাড়ায়, তারপরে বছর পাঁচেকের জন্য দার্জিলিঙে। আর আইয়ুব দম্পতীও চলে যান মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত বিভাগ উদ্বোধন ও প্রবর্তন করতে। ফলে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে যায়।

দার্জিলিং থেকে কলকাতায় যখন স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য এলাম তখন কলকাতা তথাকথিত নকশাল আন্দোলনে উত্তাল। নকশালবাড়ি চা-বাগানে যখন প্রথম আকস্মিকভাবে বিক্ষোভ দেখা দেয় তখন আমরা দার্জিলিঙে। চারু মজুমদারকেও চিনতাম, সুশীতল রায় চৌধুরীর সঙ্গেও পত্রালাপ ছিল। কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের নকশাল আন্দোলন সম্বন্ধে যে-ধারণা ছিল তার থেকে আমার ধারণা স্বতন্ত্র ছিল। গৌরীদি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'সবাই যা বলবে তুমি তো তার থেকে আলাদা বলবেই।' কিন্তু আইয়ুব বলেছিলেন, 'সব ঘটনারই আমাদের না দেখা একটা দিক থাকে।' গৌরীদির এক কথা, 'হিংসা ও হত্যার রাজনীতিকে কোনও বিচারেই সমর্থন করা যায় না।'

ঠিক তখনই শুরু হয় বাংলাদেশেব মুক্তিসংগ্রাম। প্রথমে এক তবফা পাকিস্তানের খানবাহিনীর তাণ্ডব। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথে'র লেখিকা রূপে যাঁকে জানতাম হঠাৎ তাঁর ফোন এল একদিন। বললেন যে গৌরীর কথা অনুসারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে ফোন করছেন। মৈত্রেয়ী দেবীর সংগঠন প্রতিভার প্রকাশ হতে লাগল দিনে দিনে। আমরা যতই মৈত্রেয়ীদির অনুরক্ত ও অনুগত হতে লাগলাম ততই তাঁর দাবিও বেড়ে যেতে লাগল। যতই তাঁর দাবি বাড়তে লাগল ততই তাঁর প্রতি আমাদেব শ্রদ্ধা বাড়তে লাগল। মৈত্রেয়ীদির এক অসামান্য কীর্তি 'খেলাঘর' প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় গৌরীদির বিপুল দান ছিল।

গৌরীদিকে দেখতাম সংসার নির্বাহের জন্য উপার্জনের ব্যবস্থা করতে, বালক পুত্রের সমস্ত দায়-দাবি মেটাতে, আইয়ুবের সেবাযত্ন করতে, আইয়ুবের লেখা লিখে দিতে, নিজের লেখালেখি ও পড়াশুনো করতে। এই সময় গৌরীদি কিছুদিন পূর্বভারতের ফিল্ম সেন্সর বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি শ্রীশিক্ষায়তনে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। অধ্যাপিকা হিসেবে

তাঁর প্রশংসা তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্রীর মুখে শুনেছি। ক্লাসঘরে দেওয়ালকে তিনি পড়াতেন না, পড়াতেন ছাত্রীদের মনে বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা জাগাবার জন্য।

আমি ফিল্ম তৈরির কাজে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছিলাম। আইয়ুব ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। এই রকম কোনও সময়ই গৌরীদির পক্ষে স্বচ্ছন্দে হাঁটাচলা ক্রমশ কষ্টকর হয়ে পড়ছিল। বাইশ-তেইশ বছর আগে যাঁকে দেখেছি বনবন করে শান্তিনিকেতনে সাইকেল চালাতে তাঁকে দেখলাম অথর্বের মতো টানা রিকশ করে চলাফেরা করতে। একদিন দুঃখ করে বললেন, 'এখন আমি নিজের বোঝা নিজের পিঠে বয়ে বেড়াই।' যেন তিনিই রিকশওয়ালা আবার তিনিই সওয়াবি! বাস্তবতা অতি নিষ্ঠুর। সেই অবস্থাতেই আরও বেশি করে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। আজ এই কথা লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে, তিনি কি মানুষে টানা দ্বিচক্রযানে আরোহণের জন্য মনের ভার লাঘব করতে চাইতেন অসহায় ও দুর্বল মানুষের সেবা করে?

আইয়ুব তখন একেবারে শয্যাশায়ী। কথা বলেন খুব ক্ষীণ স্বরে। আনন্দেব কথা এই যে ততদিনে তিনি জেনে গেছেন বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে তিনি একটা স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। এদিকে আমি চলে যাই বম্বেতে। সেখানেই খবর পাই আইয়ুবের চলে যাওয়ার। তিনি বলতেন যে অসুখ-বিসুখে তাঁর সঙ্গে আমার মিল আছে। কিন্তু তার মেধা ও মনীষা, পাণ্ডিত্য ও চিন্তার স্বচ্ছতা ছিল আমার উপলব্ধি ও পরিমাপ-ক্ষমতার অতীত। তাঁব যে সাহিত্যিক পরিচয় গ্রন্থাকারে আমাদের সামনে রয়েছে তার পেছনে গৌরীদির ছিল অমানুষিক পবিশ্রম। সচিবের মতো তিনিই লিখে দিতেন সেসব।

গৌরীদিব সঙ্গে এবার দেখা হল বম্বেতেই দয়াভাই ভক্তের মেয়ের বিয়েতে। পূষণ তখন বম্বেতে ভালো চাকরি করে। বম্বেতে চিকিৎসা করে গৌরীদি কিছুদিনের জন্য স্বাধীনভাবে চলাফেরাও শুরু করলেন। একদিন কলকাতার ফ্ল্যাটে তাঁকে ঠাট্টা করে বললাম, 'এবার ড্যাং ড্যাং করে বয়ফ্রেণ্ড খুঁজতে বেরিয়ে পড়ুন।' প্রথমে বললেন, 'বুড়ো হতে চললে—এখনও বজ্জাতি স্বভাব গেল না?' তারপরে যোগ করলেন, 'আইয়ুবকে বয় ফ্রেণ্ড পেয়েছে যে তার কি আর কোনও বয় ফ্রেন্ড পছন্দ হতে পারে?' সত্যিই আইয়ুব ছিলেন প্রেমিক ও পণ্ডিতের বিস্ময়কর সমাহার।

অবসর নেওয়ার পরে কী করে চলবে এ নিয়ে গৌরীদির চিন্তা ছিল। পূষণের উপর নির্ভর করে দিন গুজরানো তাঁর মনঃপূত ছিল না। দয়াভাইদের রূপধ্বনি-র জন্য একটা ফিল্ম স্ক্রিপ্ট বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে কত টাকা চাইবেন। সেই স্ক্রিপ্টটা বাংলায় অনুবাদ করার কারণ ছিল এই যে রূপধ্বনি-র পরিকল্পনা ছিল কলকাতা দূরদর্শনে একটা বাংলা সিরিয়ালের জন্য চেষ্টা করার। আমি গৌরীদিকে পরামর্শ দিই, ন্যায্য পারিশ্রমিক চাইলে ওরা এখন দেবেই না, বলবে যে অ্যাপ্রুভড হলে খানিকটা পাবেন, বাকিটা পাবেন প্রডাকশনের সময়, তার চেয়ে বলুন এখন একটা টোকন টাকা দিতে, বাকিটা মোট কত টাকার কাজ হবে তার উপর নির্ভর করবে। আমিই স্ক্রিপ্টটা বাংলায় টাইপ করিয়ে রূপধ্বনি-কে পাঠাই বম্বেতে। তবে স্ক্রিপ্টটা শেষ পর্যন্ত দূরদর্শন অনুমোদন করেনি।

কিছুদিনের জন্য চাঙ্গা হবার পরে গৌরীদি আবার অথর্ব হয়ে পড়ছিলেন। ওদিকে মৈত্রেয়ীদি চলে যাবার পরে 'খেলাঘরে'র দায়দায়িত্ব প্রধানত তাঁর উপরেই বর্তেছিল। তাছাড়া পাড়ার দুঃস্থ বাচ্চারা সন্ধেবেলায় এসে তাঁর কাছে লেখাপড়া করত। এছাড়া একটি বড় কাজ ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলা। এজন্য তিনি 'সুরাহা-সম্প্রীতি' নামে একটি সংস্থার সভানেত্রী হয়েছিল। শারীরিক অথবা আর্থিক প্রতিকূলতা তাঁকে কখনও দমিয়ে দিতে পারেনি। অনেক রকম সামাজিক

সেবামূলক কাজে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর সব কাজের খবর রাখিনি, কিন্তু সবসময় দেখেছি অসহায়, দুর্বল ও সন্ত্রস্তের কাছে তিনি ছিলেন সহায়, শক্তি ও সাহসের অফুরন্ত প্রবাহ।

মাত্র বছর পাঁচেক আগে একদিন গৌরীদি ফোন করে বললেন, 'অন্নদাশঙ্কর রায়ের নব্বই বছর হল, একদিন তাঁকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাতে যাব। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে?' তারপরে তাঁর শরীর আরও বোঝা হয়ে উঠতে লাগল। আবার বম্বেতে নিয়ে গেল পূষণ। কিন্তু এবার চিকিৎসায় সুফল দেখা গেল না। ১৯৯৮-র বইমেলাতে 'প্রসঙ্গ সাম্প্রদায়িকতা' নামে আমার একখানি বই বেরোয়। মেলাশেষে হাতে বইয়ের কপি পেলাম। গৌরীদিকে দিতে গেলাম। দরজা খুলে বেরিয়ে এল পূষণ। সেদিনই গৌরীদি নার্সিং হোম থেকে বাড়ি এসেছেন। কাতর ও ক্লান্ত। খুব ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'খুব খুশি হয়েছি।' আমার উদ্দেশে এ-ই তাঁর শেষ কথা। আমার সৌভাগ্য যে এমন একজন মহীয়সীর প্রশ্রয় ও স্নেহ পেয়েছি।

[শ্রী সুরজিৎ দাশগুপ্ত বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী]

কৃতজ্ঞতার অশ্রুবিন্দু

শাঁওলী মিত্র

'শ্রীমতী গৌরী আইয়ুব'—এই নামটি আমার চেতনায় অরূপ এক স্থান অধিকার করে আছে। সে-নামের দ্যোতনার স্বরূপও আমার অজানা। তাই গৌরীদির কাছেও কখনো আমাব গাঢ় অনুভবটি ব্যক্ত করতে পারিনি। ঐ নামটির সঙ্গে ভীষণ নৈকট্য আবার কেমন এক অব্যক্ত দূবত্ব— ! কেমন করে আজ প্রকাশ করি? সে যে প্রকাশ্য নয়!

তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূচনা —আচমকা হাতে এসে যাওযা কোনো গল্প-সংকলনে 'বেজোড়' গল্পটিব অভিঘাতে. বিভিন্ন লেখক লেখিকার গল্পের সংকলন কোনো পত্রিকার তরফে প্রকাশিত। কেমন করে যে সেই সংকলনটি হাতে এসে পড়েছিল তাও খুব স্মরণে নেই! সে যে বহু-বহু বছর আগেকার কথা। সেই সময়ে বেতারে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপযোগী গল্পের বেতার নাট্যরূপ তৈরী ছিল আমার অন্যতম উপজীবিকা। তাই দেশী-বিদেশী নানান গল্পপাঠ আমার অনুরাগের কাজ তো বটেই,—ঠিক তখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। হয়ত সেই 'প্রয়োজন' থেকেই আমার হাতে এসে পড়েছিল ঐ সংখ্যা। সে আজ প্রায় বাইশ বছর আগেকার কথা।

কিন্তু, না—শুধু প্রয়োজন বলে নয়, গল্পটি নাড়া দিয়েছিল আমার সমগ্র সত্তাকে। এই ছোট্ট গল্পটি আমাকে এমন এক দৃষ্টিদান করল যা হয়ত আমাকে উন্নীত করল, পরিণতও করল। সেই কৃতজ্ঞতা থেকে 'বেজোড়' গল্পটির বেতার-নাট্যরূপ দেবাব তাগিদ তৈরী হল অন্তরে। সসংকোচে নিজের পরিচয় দিয়ে দূরভাষে অনুমতি চেয়েছিলাম। মনে আছে গৌরীদি খুব খুশি হয়েছিলেন।

'বেজোড়' কলকাতার আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হল। প্রধান ভূমিকার অভিনেত্রী শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র। সত্তর-দশকের সেই সময়টিতে বেতারের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। বেতার-নাটকের আগ্রহী শ্রোতার সংখ্যা অনেক বেশি। বেতার-নাটকের প্রতি আগ্রহ-ও অনেক স্তরের। স্বভাবতই বেতার-নাটকের প্রভাবও বহু-বিস্তৃত। 'বেজোড়' নাটকটির গল্প যে অত্যন্ত বেশি আকর্ষণ করেছিল মানুষজনকে সে কথা স্পষ্ট মনে আছে। এ-কথাও মনে আছে দূরদর্শনের তৎকালীন খ্যাতিমান নাট্য-প্রযোজক আমাকে তাঁর মুগ্ধতা জানিয়ে ঐ গল্পের দূরদর্শন-নাট্যরূপ দাবি করেন। তিনি নিজে শুনেছিলেন নাটকটি।

দূরভাষে এই কথোপকথনের পরে আবার গৌরীদিকে যোগাযোগ করা। গৌরীদিরও নাটকটি খুব ভালো লেগেছিল। গল্পের প্রতি অবিচার করা হয়নি এই বিশ্বাসটুকু অন্ততঃ অর্জন করা গিয়েছিল। আর তাই দূরদর্শনের কথা শুনে সোৎসাহে অনুমতি প্রদান। দূরদর্শনের জন্য নাট্যরূপের কাজ এর পূর্বে আমি কখনো করিনি। তাই শঙ্কা, রোমাঞ্চ, এবং আরো নানান অনুভব নিয়ে তখন লেখনী-ধারণ।

দূরদর্শনের এই প্রযোজনাটিরও খুব প্রশংসা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রযোজনাটি আমার দেখা হয়নি। সম্ভবতঃ তখন আমার কোনো টি. ভি ছিল না। তদুপরি কোনো পারিবারিক দুর্ঘটনাতেও বুঝি তখন পর্যুদস্ত। সেই 'বেজোড়' প্রযোজনাতেও মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র। যতদূর জানি এই প্রযোজনার দর্শকরা অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এই নাটক দেখে। আর মনে পড়ে গৌরীদি আবারও খুব খুশি হয়েছিলেন।

'তুচ্ছ কিছু সুখ-দুঃখ' গল্পসংগ্রহটি প্রকাশিত হবার পরে গৌরীদি আমাকে বইটি উপহার দিয়েছিলেন। আমি কৃতজ্ঞতার আনন্দে ডগমগ। এই বইয়ের কিছু-কিছু গল্পের চরিত্র যেন বড্ডো চেনা আমার। আমি তো পার্কসার্কাসে জন্মেছি, বড়ো হয়েছি। জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই কেটেছে পার্কসার্কাসে। সেখানকার আপাততুচ্ছ মানুষজনের সুখ-দুঃখের মধ্যেই বড়ো হয়েছি আমি। তাই অনেক মানুষের আদল আমার চেনা। তাদের প্রতিদিনের আপাততুচ্ছ দুঃখের সঙ্গে যে-লড়াই, সে-লড়াইও আমার চেনা। সেই চেনামুখগুলো আমাকে আবারও ভাবালো। যতদূর মনে পড়ে তারও দু'একটি গল্পের বেতার-নাট্যরূপ আমি দিয়েছিলাম। 'বোরোলীনের সংসার' নামক নাটকের আসরে সে-নাট্যরূপ সম্প্রচারিত হয়েছিল।

* * *

গৌরীদির বাড়িতে এক সন্ধ্যায় খুব গল্প জমেছিল। সে-বোধহয় '৮৫ সালের কথা। সেই সময়ে এ-দেশের বর্ণনাত্মক নাট্যধারা নিয়ে আমি একটি গবেষণার কাজ করেছিলাম। তার বছর দুই আগেই অবশ্য 'নাথবতী অনাথবৎ' নাটকটি লেখা হয়েছে, মঞ্চস্থ হয়েছে, সমাদৃত হয়েছে। '৮৫ সালে আমি মহারাষ্ট্রের প্রত্যন্তে গিয়ে লোকনাট্যে বর্ণনামূলক ধারার অনুসন্ধান করেছি। মধ্যপ্রদেশেও গিয়েছি। ছত্তিশগড়ি এলাকায় ঘুরেছি। সে খুব আনন্দের অভিজ্ঞতা। খুব কষ্টকর ছিল ৪০° সেলসিয়াসে ঘোরাঘুরি করা। কিন্তু আমাদের লোকনাট্যের আঙ্গিকের সম্ভার আমাকে আপ্লুত করেছিল, উত্তেজিত করেছিল, ভালোবাসায় ভরপুর করে দিয়েছিল। মনের মধ্যে তোলপাড়।

'নাথবতী অনাথবৎ' নাটকের সূত্রেই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। পত্রযোগে তাঁর সঙ্গে এমন সহজ এক সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যা মনে করলে আজ বিস্ময় হয়। অমন পণ্ডিত মানুষের সঙ্গে এত সহজ সম্পর্ক হতে পারে তা আমার কল্পনার অগোচর ছিল। পত্রে তাঁকে আমার গবেষণাসংক্রান্ত উচ্ছ্বাস জানিয়েছিলাম। তিনি জানালেন, এক

সন্ধ্যায় তিনি গৌরীদির সঙ্গে দেখা করতে আসছেন, ঐ-দিন সন্ধায় গৌরীদির বাড়িতে গেলে আমার গবেষণার অভিজ্ঞতা নিয়ে সরাসরি আলাপন হতে পারবে। গৌরীদিও আনন্দিত আলাপন হবে, আমি যাব—এই সমস্ত মিলিয়েই!

সন্ধ্যাবেলায় গৌরীদির বাড়িতে পৌঁচেছি। গৌরীদির ঐ বাড়িটিতে আমি আমার শৈশবে আমার বাল্যে,—বহুবার গিয়েছি। কিন্তু গৌরীদির কাছে নয়। আমি যেতুম আমার নানার কাছে—ডাঃ এ. এম. ও গনি। যিনি একাধিকবার আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। সে আমার উনিশদিন বয়স থেকেই নানা অসংখ্যবার আমাকে নিয়ে বিপদে পড়েছেন। নানার মেয়ে সাজেদা আসাদ—আমার মা-বাবার 'লিলিদি' একসময়ে 'দশচক্র' নাটকে হৈমর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। 'লিলিদি'-র মেয়ে রীণা, ছেলে সাজেদ—আমাব শিশুকালের বন্ধু ছিল। আমাদের বাড়ি থেকে হুড়োহুড়ি ক'রে দৌড়ে নানাব বাড়িতে চলে যাওয়া—এ-ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটেছে। নানী খুবই আদর করতেন আমাদের। তবে এ-কথা স্পষ্ট মনে পড়ে দোতলায় উঠতে উঠতে সিঁড়িগুলোই আমাদের বলে দিত—এ-বাড়ি অন্যরকম,—এ-বাড়ি সম্ভ্রান্ত বাড়ি। আমাদের শৈশবের উল্লাস আপনিই সংযত হয়ে যেত, পদশব্দ হয়ে আসত ক্ষীণ। আমাদের পরিমণ্ডলের স্বাভাবিক উচ্চস্বব যে ওখানে মানায় না—সে-কথা কাউকে উচ্চারণ করতে হত না। সে আমাদের অন্তর আমাদের বলে দিত। সেদিন যখন গৌরীদির সমীপে যাবার জন্য লাল-সিমেন্টের সিঁড়িগুলো ভাঙছিলাম ছেলেবেলার কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল। নানা তো কবেই চলে গেছেন। নানী-লিলিদি-রীণা-সাজেদ এঁরাও বোধহয় কেউ ও-বাড়িতে নেই। কোনো যোগাযোগ নেই বহুদিন। গৌরীদির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেইসব কথা ভাবতে ভাবতে কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম।

এখন ভাবলে খুব সংকোচ হয়—দু'জন গুণী মানুষ সেদিন উৎসাহ ভ'রে আমার কথা শুনে চলেছিলেন সারা সন্ধ্যে। আমি, অর্বাচীন, (সাধারণভাবে 'অন্তর্মুখী' বলে পরিচিত), মহানন্দে বলে চলেছিলাম আমার উত্তেজনাময় অভিযানের কথা। উপবাস, রৌদ্রের প্রখর তাপ, শারীরিক বিবিধ অসুবিধাকে তুচ্ছ ক'রে—কখনো মহারাষ্ট্রের প্রত্যন্ত গ্রামে, কখনো মধ্যপ্রদেশের ছোট শহর, মফঃস্বল, বা ছত্তিশগড়ীর গাঁও—এই সমস্ত জায়গায় ঘুরে ঘুরে আনন্দ সঞ্চিত হয়েছিল আমার সমগ্র সত্তা জুড়ে—! সেদিন গৌরীদি আর অধ্যাপক রায়ের সোৎসাহী মুখ সেই আনন্দকে প্রকাশ করবার পথ খুঁজে পেয়েছিল। তাঁদের সাগ্রহ জিজ্ঞাসা আমাকে কত খুঁটিনাটি বিবরণ জানাতে প্রলুব্ধ করেছিল তার অন্ত নেই! মহারাষ্ট্রের পরবনীতে পৌঁছনোর কাহিনীই তো যথেষ্ট উত্তেজনাময়। তারপর সেখানকার লোকনাট্যের অপরূপ ঐতিহ্য। আটানব্বই বছরের বৃদ্ধ রাজারাম ভট্ট কদম-এর 'গোন্ডড়'-এর আঙ্গিক যে আমাকে মুগ্ধ করবে সে তো স্বাভাবিক কথা। আর তার সঙ্গে দূরাগত কলকেত্তিয়া বঙ্গালী কন্যার প্রতি তাঁর উপচে পড়া স্নেহ? তখনও-অখ্যাত তিজনবাই-এর গ্রামে গিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা? বিলাসপুরের রামকিস্‌সা? সূরয বাই-এর গান? কতরকমের কাহিনী! গল্পে-গল্পে সারা সন্ধ্যে কেটে গিয়েছিল! ঐ একবারই গৌরীদির বাড়িতে যাওয়া।

কতবা-র যে ইচ্ছে হয়েছে একান্তে গল্প করতে ওঁর সঙ্গে—কত-কী জানতে,—হয়ে ওঠেনি। থিয়েটারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হলে ব্যক্তিগত কত আকাঙ্ক্ষাকে যে নির্মম হয়ে দলিত করতে হয়,—সে তো আমি আ-শৈশব দেখেছি। এইসব নানান কাজকর্ম-র সঙ্গে যুক্ত হল মায়ের ভয়াবহ অসুখ। এবং অভাবনীয় সব প্রতিকূলতা! —সেইসমস্ত ঝড় সামলাতে সামলাতেই মা চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে। সব যেন ফাঁকা হয়ে গেল! যেন কোনো কাজ নেই আর। সেই

শূন্যতার সময়ে গৌরীদির স্নিগ্ধ হস্তাক্ষরের আন্তরিক, পত্রখানি ছিল ক্ষতের ওপরে চন্দনের প্রলেপের মত।

কিছুদিন পরে পার্ক-সার্কাসের বাজারের দ্বিতলে আমরা যখন সংগ্রহশালা খুলতে সক্ষম হলাম,—তখন গৌরীদি তাঁর পায়ের অসুবিধা সত্ত্বেও সিঁড়ি ভেঙে এসেছিলেন—স্মরণ অনুষ্ঠানে। প্রতি ২৪শে মে, মায়ের মৃত্যুদিনে সেইরকমই স্মরণ অনুষ্ঠান হয়। এখন জানি গৌরীদি আর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে উপস্থিত হবেন না ঐ ঘরটিতে। আর কী-কারণে জানি না—প্রতিবছরই নানান কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমার মনে পড়ে গৌরীদির কথা। পড়ে প্রতিবারই। এ-ও খুব আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতা। কিছু কিছু মানুষ খুব ঘনিষ্ঠ না হয়েও এক কোমল পরশ রেখে যেতে সক্ষম হন অন্তঃস্থলে। খুব বেশি কথোপকথন না হলেও ঝর্ণার মত সুমিষ্ট আলাপের ধ্বনি কর্ণকুহরের মধ্যে দিয়ে পৌঁছে যায় হৃদয়ের তলে। শ্রীমতী গৌরী আইয়ুব—যাঁর অপূর্ব স্বর, অনায়াস উচ্চারণ, হাস্যময় মুখাবয়ব, সংযত আবেগ আজীবন আমাকে কিছু দেবে। দিয়েই যাবে। যিনি দিতে জানেন তিনি এমনি করেই দেন। আর এই প্রাপ্তির বিনিময়ে নীরব কৃতজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছুই দেবার থাকে না আমাদের! অক্ষম, কাঙাল,—এই আমরা।

[শ্রীমতী শাঁওলী মিত্র নাট্যজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও লেখিকা]

গৌরীদির স্মৃতি

কিওকো নিওয়া

১৯৯৮-এর অগাস্ট মাসে কলকাতায় গিয়েছিলাম চার বছর পর। এর আগে প্রায় প্রতি বছর অগাস্ট মাসে কলকাতায় গিয়ে মাসখানেক কাটাতাম। তবে ১৯৯৪ সালের পর চার বছর সেই সুযোগ আমার হয় নি। এর মধ্যে নিজের ছেলের জন্ম হওয়ায় সাংসারিক দিক থেকেও কিছুটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। অবশেষে গত বছর অল্প সময় পেয়ে স্থির করলাম আবারও কলকাতা যাব।

শহরে পৌঁছুবার আগে থেকেই আমার জানা ছিল কলকাতায় এবারের অবস্থান আগের মত হবে না। জাপান ছাড়ার ঠিক আগে দুঃখের খবর আমি পাই—গৌরীদি মারা গেছেন। এর আগে যতবার আমার কলকাতা যাওয়া, প্রতিবারই অন্তরঙ্গ আর আনন্দের অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ দীর্ঘ সময় গৌরীদির সাহচর্যে আমি কাটিয়েছি, কিন্তু এবারে তা আর হবে না। কলকাতা আমার সবচেয়ে প্রিয় শহর, তবে সেই শহরে বড় একটা ফাঁক তৈরি হয়ে গেছে।

গৌরীদির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৮৪ সালে। তখন আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হয়ে পি এইচ ডি-র সন্দর্ভ লিখতে শুরু করেছি। আমার আগে আরও কয়েকজন জাপানী ছাত্রছাত্রীর দেখাশোনা তিনি করেছেন। গৌরীদির প্রথম জাপানী ছাত্র ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র, মাসাইয়ুকি উসুদা। এর পর মাসাইয়ুকি ওনিশি, নারিআকি নাকাজাতো ও আরও কয়েকজন জাপানী গৌরীদির কাছ থেকে বাংলাভাষা

ও সাহিত্যের পাঠ নিয়েছেন। এঁরা সবাই এখন বাংলার ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ হিসেবে জাপানে পরিচিত। নাকাজাতো প্রথমে আমাকে গৌরীদির কাছে নিয়ে যান, আর এর ঠিক পরের সপ্তাহ থেকেই শুরু হয় আমাদের ক্লাস।

এরপর ১৯৮৭ পর্যন্ত, অর্থাৎ পি এইচ ডি শেষ করে কলকাতা ছেড়ে আসার আগে পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে গৌরীদির বাড়িতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের পাঠ আমি নিয়েছি। তাঁর কাছে পড়েছি রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী", "কণিকা", "খেয়া", "কথা ও কাহিনী", "গীতাঞ্জলি", "লেখন", "পুনশ্চ", "আরোগ্য", এবং "জন্মদিনে"। এছাড়া বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গল্পও এক সঙ্গে পড়েছি। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অভিব্যক্তির সবিস্তার ব্যাখ্যা তিনি সস্নেহে করে দিয়েছেন। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, আরও অনেক কিছু শেখার সুযোগও আমার হয়েছে। তবে সেই সময়ের খাতাগুলো মূল্যবান স্মৃতি হিসেবে আজও আমার শেলফে রাখা আছে।

১৯৮৮ থেকে ৯৪ পর্যন্ত নানা কাজে প্রতিবছর আমি কলকাতা গিয়েছি, আর প্রতিবারই গৌরীদির সাহায্য আমি পেয়েছি। আমাদের দুজনের সবচেয়ে স্মরণীয় মিলিত কাজ হচ্ছে "দূর প্রদেশের সংকীর্ণ পথ"। ১৯৮৮ সালের কথা। মনে নেই দুজনের মধ্যে কে প্রথম জাপানী সাহিত্যের বাংলা অনুবাদের কাজ শুরু করার প্রস্তাব করেছিলেন। যাই হোক, সে বছর জুলাই মাসের শেষ দিকে মাৎসুও বাশোউর "ওকুনো হোসোমিচি"-র মূল জাপানী রচনা ও এর ইংরেজী অনুবাদ নিয়ে গৌরীদির বাড়ি আমি গিয়েছিলাম। সেদিন থেকেই আমরা দুজনে মিলে অনুবাদের কাজ শুরু করি। আমি মূল জাপানী রচনা থেকে সরাসরি বাংলায় আর গৌরীদি ইংরেজী অনুবাদের বাংলা রূপান্তর করে নেন। পরের দিন আগের লেখা সংশোধন করে বাংলা অনুবাদের পাঠ আমরা দাঁড় করিয়ে নিই। এভাবে চলতে থাকে পরের অংশের অনুবাদ ও তার সংশোধন। প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা ধরে এই কাজে মগ্ন থেকেছি আমরা। মাঝে মাঝে গৌরীদি ক্লান্ত হয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে অনুবাদের বাক্য আমাকে বলতেন আর আমি তা লিখে নিতাম। বর্ষাকালের সন্ধ্যাবেলায় গৌরীদির বৈঠকখানার সেই স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

পড়াশোনা কিংবা অনুবাদের কাজে ব্যস্ত থাকার সময় প্রায়ই নানা লোকজন আসতেন গৌরীদির সঙ্গে দেখা করতে। কখনও আসত কলেজের কোনো ছাত্রী বিশেষ কোনো অনুরোধ নিয়ে, কখনও আবার আশেপাশের ছেলেমেয়েরা চলে আসত কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে। সামাজিক কর্মকাণ্ডের সহকর্মীরা আসতেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরামর্শ করার জন্য, এছাড়া দূরের কোনো গ্রাম কিংবা অন্য কোনো জায়গা থেকে অচেনা লোকজনও হঠাৎ এসে উপস্থিত হতেন বইয়ের প্রকাশনা বা কাজ খুঁজে পাওয়ায় সাহায্যের অনুরোধ নিয়ে।

গৌরীদি বারবার বলতেন সকালে তাঁর কলেজে যাওয়ার আগে তাড়াতাড়ি আমি যেন চলে আসি, ওই সময়টায় তাহলে অন্য কেউ উপস্থিত হয়ে আমাদের কাজের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। কখনও কখনও আমি তাই করতাম। আমার কাছে কিন্তু বিচিত্র সেই অতিথির দল একেবারে মন্দ লাগে নি। এত লোকজনের নানারকম কথা শুনতে আসলে আমার ভালোই লাগত। গৌরীদির সেই বৈঠকখানা যেন সত্যিকার অর্থেই ছিল ভারতীয় সমাজের এক জানালা। সেই জানালার ফাঁক দিয়ে সমাজের বাস্তব জীবনের কিছু দৃশ্যপট এক পলক দেখার সুযোগ আমার হয়েছে।

গৌরীদি বারবার বলতেন নিজে তিনি দূরে কোথাও যেতে পারেন না, তবে সারা বিশ্ব তাঁর কাছে আসে। সত্যিকার অর্থেই আমাকে ছাড়াও দেশ বিদেশের নানা লোকজন এসে তাঁর সঙ্গে

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে নিয়েছেন।

গবেষণার কাজের জন্য ১৯৯৪ সালে এক মাস ধরে গৌরীদির কাছে বৈষ্ণব পদাবলীর পাঠ আমি গ্রহণ করি। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্য পড়তে পড়তে তখনও অনেক কিছু শিখেছি। ওইসব রচনার মধ্যে যে কিছু কিছু যৌন বর্ণনা রয়েছে তা কারোরই অজানা নয়। সেরকম বিশেষ এক অংশের অর্থ একদিন বিভিন্ন অভিধান ও বইপত্র খুঁজেও বুঝতে না পেরে গৌরীদির শরণাপন্ন হলে তিনিও ঠিকভাবে বিষয়টা আমাকে বোঝাতে পারলেন না। মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, "ওঃ কি বিপদেই না আমরা পড়েছি। জানি না কাকে এধরনের প্রশ্ন করতে পারি। এবকম প্রসঙ্গ তুলতে লজ্জাও হয়। দেখা যাক পরে কি করতে পারি।" আমার খাতায় সেই অংশ এখনও অলিখিত রয়ে গেছে। আজও তা পূর্ণ করে নেওয়ার কোনোরকম উৎসাহ আমি পাই নি।

গত বছর অগাস্ট মাসে গৌরীদির বাড়ির ঠিক সামনে পর্যন্ত আমি গিয়েছিলাম। আশেপাশের দোকান-দালান সবই একই রকম রয়ে গেছে। বিশ্বাস করতে পারি নি গৌরীদির সেই ঘরে বসার সুযোগ আর হবে না। আমার জানা ছিল না কারা সেই বাড়িতে বসবাস করছেন। বেল টেপার বা ভিতরে যাওয়ার সাহস হয় নি। গৌরীদিহীন ফাঁকা সেই বৈঠকখানা দেখার কোনো আগ্রহও আমি খুঁজে পাই নি। কেবল যে ইচ্ছা আমার হয়েছে তা হল, দুজনে বসে নানা কথা বলার নানা কাজ করার সেই বৈঠকখানাকে মনের স্মৃতিকোঠায় চিরদিন ধরে রাখা।

[কিউকো নিওয়া নিজ দেশ জাপানে বাংলাভাষায় সাহিত্যচর্চা করেন। পেশা · অধ্যাপনা]

চার দশকের স্বজন

অতীন্দ্রমোহন গুণ

আমি তাঁকে গৌরীদি বলেই ডাকতাম যদিও আমরা ছিলাম প্রায় সমবয়সী এবং দু'জনই একই বছরে তখনকার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেছিলাম—উনি পাটনা থেকে আর আমি পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম থেকে। এর কারণ উনি ছিলেন আমার স্ত্রীর অগ্রজা আর তাই 'পদে বড়'।

তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বছর আড়াই পড়িয়েছি। এসময়ে আমার বন্ধু কান্তি সেনগুপ্ত রামকান্ত মিস্ত্রি লেনের একটা মেসে থাকত এবং তার 'নিরঙ্কুশ সাহিত্যপত্রিকা' দীপিকা প্রকাশ করছে। সে-মেসেই থাকতেন অসীম ভদ্র, বয়সে আমাদেরই কাছাকাছি এবং তিনিও ছিলেন দীপিকা-গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য। আমরা জানতাম অসীমের সঙ্গে অঞ্জলি বসু নামে এক মহিলার ঘনিষ্ঠতা চলছে। (পরে তাঁরা বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু বছর তিনেক পরই অকালে অসীমের জীবনাবসান হয়।) ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমার অভিভাবকরা আমার বিবাহ স্থির করেছিলেন। পাত্রী আমাদেরই পূর্বতন জেলা মৈমনসিংহের প্রাক্তন বাসিন্দা অধ্যাপক ধীরেন্দ্র মোহন দত্তের দ্বিতীয়া কন্যা ইরা। অধ্যাপক দত্ত ছিলেন গান্ধীবাদী এবং এদেশের প্রথম সারির দার্শনিকদের অন্যতম। এর কয়েক বছর আগে তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে

শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। নভেম্বরে আমার বিয়ে হয়েছিল। তার মাস চারেক আগে অসীম ভদ্র একদিন আমাকে বললেন, গৌরী আইয়ুব-দত্ত আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চান। বোধ হয় ঐ সময়ে উনি যোধপুর গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। অধ্যাপক দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা গৌরী যে পিতার অমতে তাঁর এক প্রাক্তন মুসলমান অধ্যাপককে বিয়ে করেছেন এ-খবরটা আমি রাখতাম। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও গৌরী আইয়ুব-দত্তের নামও আগেই দেখেছি, কিন্তু আগে তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি। অঞ্জলি বসু ছিলেন গৌরীদির বন্ধু। তাঁর মারফত আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন, বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ছোটবোনের হবু স্বামীটি কেমন হবে তা-ই দেখা!

যা হোক, অসীম আমাকে এ-কথাটা বলার পর একদিন বিকেলে আমরা তিনজন—অসীম, তাঁর বান্ধবী অঞ্জলি ও আমি চলে গেলাম ৫ পার্ল রোডের ফ্ল্যাটে। ঘণ্টা দুই ধরে নানা বিষয়ে আলোচনা হল ; মাঝখানে শামি কাবাব ও সন্দেশ সহযোগে কফি খাওয়া হল। ঐদিন অল্প সময়ের জন্য আইয়ুব সাহেবও আমাদের আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। বোধ হয় ঐদিন অধ্যাপক অম্লান দত্তও ফ্ল্যাটে এসেছিলেন, আমাকে দেখে দু-একটা কথা বলে আইয়ুব সাহেবের ঘরে ঢুকে গেলেন। ঐ সময়ে তাঁরা দুজন মিলে Quest ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করছেন।

এর পর পার্ল রোডের ফ্ল্যাটে অনেকবার গেছি। বিয়ের পর সাধারণত সস্ত্রীকই গেছি। কখনও বা পার্ক সার্কাস অঞ্চলে কোনো সভা-সেমিনারের শেষে দু-চার জন বন্ধু মিলে আগে থেকে না জানিয়ে ঐ বাড়িতে হাজির হয়েছি। বলতে গেলে তাঁদের ফ্ল্যাটে আমার ছিল অবারিত-দ্বার। নানা বিষয়ে আলোচনা হত। আলোচনার অনেকটা জুড়েই থাকত সমকালীন রাজনীতির নানা দিক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি বা শান্তিনিকেতনের পঠন-পাঠন। আমি নিজে কোনোদিনই খুব একটা আলাপচারী নই। এর আগে কলকাতার সাংস্কৃতিক মহল বা বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার খুব একটা পরিচয়ও ঘটেনি। এর একটা বড় কারণ, আমি একটি আপাত নীরস, গাণিতিক বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেছি। তাই আইয়ুব-দম্পতির কল্যাণে একটা নতুন জগতের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। ঐ ফ্ল্যাটেই বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপিকা আরতি সেন, সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ, মানবতাবাদী সুশীল ভদ্র ও শীতাংশু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শ্রদ্ধেয় মানুষদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ক্রমে দেখা গেল অনেক বিষয়েই আমরা সমমত পোষণ করি। সাম্যবাদ রাশিয়া বা চীনদেশে যেরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মূলে মানবকল্যাণ-আকাঙ্ক্ষা থাকলেও বাস্তব প্রয়োগে তা যে অনেকটাই গায়ের জোর, ভণ্ডামি ও অপপ্রচারের উপর নির্ভরশীল তাই পরিণামে শুভ হতে পারে না বা ইন্দিরা গান্ধীর 'জরুরি অবস্থা' যে ভারতেতিহাসের এক লজ্জাজনক অধ্যায় এ-ধারণা আমরা সকলেই পোষণ করতাম। অবশ্য গৌরীদি ছাত্রাবস্থায় ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় সদস্যা ছিলেন, তাই অনেক কমিউনিস্ট মতাবলম্বী শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে সশ্রদ্ধ সম্পর্ক রাখতেন, তাঁরাও গৌরীদি সম্পর্কে সমীহা পোষণ করতেন। পরে দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে সমকালীন রাজনীতি যে তামসিক রূপ গ্রহণ করেছে, সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যে-তুঘলকি কাণ্ডকারখানা চলেছে, চারদিকের মানুষদের আচরণে যে অসহিষ্ণুতা ও সামাজিক অবক্ষয়ের পরিচয় ফুটে ওঠে—এসবই আমার মতো তাঁকেও ব্যথিত করেছে। তবে অন্যায়ের প্রতিবাদে গৌরীদি যতটা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন আমি তা নিতে পারিনি। সাধারণভাবে বক্তৃতা-প্রবন্ধ ইত্যাদির মধ্য দিয়েই নিজের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের মতোই গৌরীদি ছিলেন বহুমাত্রিক মানুষ। গল্প-প্রবন্ধ লিখেছেন, বাড়িতে সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। সরকারি ভাষানীতির বিরুদ্ধে এবং

'সহজপাঠ' পাঠ্যতালিকা থেকে বর্জনের প্রয়াসের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন। আবার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে সমাজসেবার কাজে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যোদ্ধাদের এবং ঐ-দেশ থেকে উদ্বাস্তু মানুষদের সাহায্যদানের ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি রুগ্ন স্বামীর পরিচর্যার দিকে লক্ষ্য রেখেছেন, বাড়িতে অতিথি এলে তাঁদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিপদে পড়ে তাঁর কাছে ছুটে এসেছে, তিনি যথাসাধ্য তাদের সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেছেন। কোন্ দুঃস্থ-পিতামাতা অর্থাভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না, কোন মেয়ের স্বামী তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—এসব সমস্যারই তিনি মোকাবেলা করেছেন। মোকাবেলা করেছেন হাসিমুখে। আবার কখনও বা দেখা যেত পাড়ার কিছু ছেলে মেয়েকে নিয়ে পড়াতে বসেছেন। কখনও বা কিছু তরুণ তরুণী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসবে বলে গৌরীদির কাছে পড়াশুনোয় সাহায্য নিতে এসেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঢাকা থেকে অধ্যাপক আইয়ুবের আত্মীয়রা এবং গৌরীদিরও পিতার দিক থেকেও কিছু আত্মীয় অনেক সময় এ-বাড়িতে এসে থেকেছেন। গৌরীদি সস্মিত বদনে সকলের যত্ন-আত্যির দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। ১৯৮৯ গৌরীদির মা মারা গেলেন, তার আগে অনেকদিন গৌরীদি তাঁকে নিজের কাছে রেখেছিলেন। মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে মিলে গৌরীদিরা মুখ্যত বাংলাদেশ যুদ্ধের পর অনাথ শিশুদেব জন্য মধ্যমগ্রামের কাছে 'খেলাঘর' নাম দিয়ে একটি আশ্রম তৈরি করেছিলেন। মৈত্রেয়ী দেবীর মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই এর দায়িত্ব মুখ্যত গৌরীদিকেই বহন করতে হয়েছে।

গৌরীদির বৈশিষ্ট্য ছিল কারও কাজ বা কথায় অসন্তুষ্ট হলেও কখনও সে-অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না ; মনে মনে রাগ পুষে রাখাটাও ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। অন্য কেউ অপ্রিয় কথা শোনালেও তিনি হাসিমুখে তা শুনে গেছেন। প্রত্যাঘাত করতে কখনও দেখিনি বা শুনিনি। আমি নিজেও হয়তো তাঁর সঙ্গে আলোচনায় এমন কোনো কথা মাঝে মাঝে বলেছি যা পরে মনে হয়েছে না বলাটাই উচিত ছিল। কিন্তু সেসবও তিনি ধৈর্য ধরে হাসিমুখে শুনে গেছেন।

তিনি নানা সময়ে বলেছেন, তিনি নাস্তিক। অনেক নিরীশ্বরবাদীও যে বিপদে পড়লে ভগবানের নাম নেয় একথাটা তাঁকে মনে করিয়ে দিলে তিনি উত্তরে বলেছেন, এমন দুরবস্থা তাঁর তখনও হয়নি! অন্তরের এমন প্রশান্তির উৎস সাধারণত থাকে আধ্যাত্মিকতায়। কিন্তু গৌরীদির বেলায় প্রবল আত্মপ্রত্যয়, মানুষের শুভবুদ্ধিতে আস্থা এবং সংবেদনশীলতাই ছিল প্রশান্তির উৎস।

গৌরীদির যে গ্রন্থিবাত (osteoearthritis)-এর সমস্যা আছে এটা বোধ হয় আমরা জানলাম ষাটের দশকের শেষ দিকে। বেশি করে জল খাওয়া, ম্যাসাজ করা এসবে খানিকটা উপশম হলেও মাঝে মাঝেই ব্যথার ওষুধ খেতে হত। কিন্তু এটা নিয়ে তাঁকে পরিচিত জনের কাছে আহাঃ উহুঃ করতে দেখিনি। পরে ক্রমে রোগযন্ত্রণা বাড়তে থাকায় শ্রীশিক্ষায়তনে পড়াতে যেতেন রিকশয় চড়ে, শেষের দিকে একটা লাঠি নিয়েও চলাফেরা করেছেন। আইয়ুব সাহেব ১৯৮২ সালে মারা গেলেন। তার আগে থেকেই পুত্র পূষণ বম্বেতে থাকার ফলে গৌরীদি খানিকটা একা হয়ে পড়লেন। এ-সময়ে ক্রমে গ্রন্থিবাতের সমস্যা জটিলতর হতে থাকে। দু-বার বম্বেতে গিয়ে দু-হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করিয়ে এলেন, কিন্তু যে-যন্ত্রণাটা এতদিন হাঁটুতে ছিল তা সরে গিয়ে ক্রমে দু হাতে এসে জমা হল ; হাতের আঙুলগুলো বেঁকে যাওয়ার ফলে ক্রমে লেখার কাজ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, অন্যকে দিয়ে অনুলিখন প্রয়োজন হল। ক্রমে বাতের ব্যথাটা ঘাড়ে ও মাথায়ও ছড়িয়ে পড়ে। (গৌরীদির পিতাও মৃত্যুর আগে বারো-তেরো বছর গ্রন্থিবাতে আক্রান্ত

হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে রোগটা অত জটিল রূপ নেয়নি।)

এই সংবেদনশীল, সদালাপী, মৃদুভাষী মানুষটিই মৃত্যুর আগে বছর খানেক যে কতটা কষ্ট পেয়ে গেছেন তা আর বলার নয়। যেদিন বিকালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ক্লাস নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পার্ল রোডে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম, তখন নানা কথা হল। সেদিনই বুঝেছিলাম রোগশয্যা থেকে উঠে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। পরে তো রোগযন্ত্রণা বাড়তেই থাকল, চব্বিশ ঘণ্টা পরিষেবিকার তত্ত্বাবধানে থাকতে হত। একদিন পূর্বাহ্নে কলেজে যাওয়ার পথে তাঁকে দেখতে গেলাম। কিন্তু আমি তাঁর ঘরে ঢুকতেই আমাকে বললেন, "আমি তো তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারব না, তুমি বরং পাশের ঘরে গিয়ে কিছু বইপত্র পড়তে পার।" কিছুক্ষণ পরে যখন চলে আসছি, দেখলাম তাঁর তন্দ্রার ভাব এসেছে, আমি পরিষেবিকাকে ইশারায় জানালাম তাঁকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। পরে একদিন একইভাবে তাঁর ঘরে ঢুকতে গিয়ে যে-অভিজ্ঞতা হল তাতে খানিকটা হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম। তাঁর ঘরে একবার উঁকি দিয়ে আমি পাশের ঘরে বসেছি, কাজের মেয়েটি এসে বলল, "মাসি বলেছেন, তিনি তো আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না, আপনার কিছু জানাবার থাকলে আপনি আমাকে বলে যেতে পারেন।" আমি বললাম, "আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু গৌরীদিকে বলো তিনি তাঁর বোনকে বা বোনপোকে (অর্থাৎ আমার ডাক্তার পুত্রকে) যদি কিছু খবর পাঠাতে চান, তবে আমাকে বলতে পারেন।" সে ঘুরে এসে বলল, "মাসির কিছু খবর দেওয়ার নেই।"

গৌরীদির মৃত্যু তাঁকে নিদারুণ রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে। সব কিছু সুশৃঙ্খলভাবে, শোভনভাবে সমাপন করা তাঁর স্বভাব ছিল। তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর আমরা যখন ভাবছি তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কোথায় সম্পন্ন হবে, সে-বিষয়ে কী-কী সমস্যা দেখা দিতে পারে, তখন দেখা গেল সে-সমস্যারও একটা সুষ্ঠু সমাধান তিনি আগে থেকেই করে রেখে গেছেন!

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পিতার কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় যেমন করেছেন শ্রীশিক্ষায়তনে অনুষ্ঠিত শোকসভায়। ডঃ দত্ত মূলত ভারতীয় দর্শনের পণ্ডিত, পাশ্চাত্য দর্শনেও তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ পদচারণা। পোষাকে-আশাকে, জীবন-যাত্রায় নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী হয়েও, অনেক দিক থেকেই তিনি ছিলেন আধুনিক মনের মানুষ। একজন মুসলমান বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে গৌরীদির পরিণয়কে কেন তিনি ভালো মনে গ্রহণ করতে পারলেন না সে-প্রশ্ন অনেকের মনে উঠেছে। আমার কাছে এর একটা ব্যাখ্যা আছে, তবে তা এখানে উল্লেখ না করলেও চলবে। কিন্তু তাঁর ভাইবোনদের মধ্যে গৌরীদিরই চেহারায় পিতার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য ছিল। এবং ঐ একটি ব্যাপারে পিতার অবাধ্য হলেও তিনি পিতার অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। ঋজুতা, সংবেদনশীলতা, জীবনযাপনে শৃঙ্খলার সঙ্গে সারল্য, মৃদুভাষিতা, সঙ্কল্পে অবিচলতা এবং মননশীলতা—এ সবই উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। বছর কয়েক আগে একদিন সন্ধ্যাবেলায় পার্ল রোডের বাড়িতে গেছি—ঠিক মনে নেই, হয়তো সেদিন রাত্রে ওখানে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। যখন ফিরে আসছি, গৌরীদি ঘুমাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। যে তক্তপোষটির উপর দিনেরবেলা লেখা-পড়া করেছেন, যাতে শুয়ে বা বসে অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন, কাজের মেয়েটি তা-ই একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে দিল, তক্তপোষের এক পাশেই বই-খাতা সব সাজিয়ে রাখল। আমার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতার কথা মনে পড়ে গেল। তিনিও শান্তিনিকেতনের বাড়িতে এমনটিই করতেন। তিনি অবশ্য একটু বেশি শক্ত-সমর্থ ছিলেন। দু-বেলা খাওয়ার পর নিজের থালা-গ্লাস ধুয়ে রাখতেন, বিছানাটা নিজেই পেতে নিতেন, মশারি খাটিয়ে নিতেন। তাঁর তক্তপোষটিও ছিল একই ধরনের সাদাসিধে, তার পাশেও বই-খাতা

একইভাবে গুছিয়ে রাখা হত। আমি সাদৃশ্যটি লক্ষ্য করে সেদিন গৌরীদিকে বলেছিলাম, "সাহিত্যিক বদরুদ্দিন উমর একটা বই লিখেছেন "বাঙালি বুদ্ধিজীবীর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন"। আমরাও কি একটা বই লিখতে পারি, যার নাম হবে 'গৌরী আইয়ুবের পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন'?" কথাটা বলার পর সেদিন দু-জনই খুব মজা পেয়েছিলাম।

তাঁর মৃত্যুতে আমরা স্বাভাবিকভাবেই একটা শূন্যতা বোধ করছি। কিন্তু এটা ভাবতে ভালো লাগে যে তাঁর রচনাগুলির মধ্যে, 'খেলাঘর' ও অন্যান্য সমাজসেবার প্রতিষ্ঠানের কাজে, আমাদের সমাজ মনস্বতায় ও সমাজ রূপান্তরের প্রয়াসে, আমাদের শুভবুদ্ধি ও সুকৃতিতে, সুস্থ রাজনীতির প্রতি আমাদের অবিচল নিষ্ঠায় তিনি বেঁচে রয়েছেন, বেঁচে থাকবেন।

[ড অতীন্দ্রমোহন গুণ-এর পেশা অধ্যাপনা, নেশা সাহিত্য ও সমাজসেবা]

আমার দিদি

ইরা গুণ

দিদি আমার থেকে পাঁচ বছরের বড। আমরা ভাইবোন মিলে নয় জন ছিলাম। দাদা আব মেজদার পরে দিদি। তারপর সেজদা ছোড়দার পরে আমরা চার বোন। সবাই মিলে খুব জমজমাট পরিবার ছিল। আমরা থাকতাম পাটনায়—বাবার কর্মস্থলে। দিদির জন্মও পাটনায়।

দিদি তার স্বভাব, বুদ্ধি, বিবেচনার জন্য পরিবারে সবারই খুব আদরের ছিল। সে বাবার বড় প্রিয় ছিল। বাবার চেহারার সঙ্গেও ওর খুব মিল ছিল। আমার মা খুব সাধারণ মহিলা ছিলেন। তিনি দিদির ওপর খুব নির্ভর কবতেন। ছোটবেলা আমার ধারণা ছিল মা দিদিকেই বেশী ভালবাসেন। ওর পরামর্শেই সংসার চালান। এইসব চিন্তা ছোটবেলা আমাকে খুব কষ্ট দিত। আর আমি ভাবতাম কি করে দিদিকে হারানো যায়। কিন্তু মজা হল কোনও দিনই, কোনও ব্যাপারেই ওকে হারাতে পারি নি। বরং ওর সাহচর্যে ও উৎসাহে শিখেছি অনেক।

শান্তিনিকেতনে আসার আগে পর্যন্ত আমি একটুও মিশুক ছিলাম না। নতুন কাউকে দেখলে অস্বস্তি হত। দিদি কিন্তু খুব মিশুক ছিল। ওর কত বন্ধু ছিল। সবাই ওকে ভালোবাসত।

আমাদের পুতুলের বিয়ের সময় দিদি সুন্দর সুন্দর শাড়ি তৈরী করে দিত। পুঁতির মালা গেঁথে দিত। সবচেয়ে যেটা আনন্দের ছিল, তা হল দিদির হাতের ছোট্ট ছোট্ট লুচি ও বেগুন ভাজা।

দিদির কাছে পড়তেও ভাল লাগত। ওর হাত ধরেই আমার প্রথম স্কুল যাওয়া। পরবর্তী জীবনেও ওরই উৎসাহে কিছু বিদেশী ভাষা শেখার চেষ্টা করেছি। শান্তিনিকেতনেও এসেছি ওরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

ছোটবেলা থেকেই দেখেছি দিদি নানারকম বই পড়ত। বাবা ও উৎসাহ দিতেন, বই এনে দিতেন আমাদের। স্কুল থেকে ফিরে ছোট্ট চেহারায় মোটা মোটা বই হাতে জানলায় বসে পড়ছে—এ ছবি যেন এখনও দেখতে পাই। আমরা তখন গঙ্গার পাড়ে বালিতে হুটোপাটি করছি।

ধীরে ধীরে নিপুণহাতে সেলাই করতেও দিদি ভালবাসত। যে কোনও কাজই সুন্দর

হওয়া চাই। হাতের লেখাও ছিল খুব সুন্দর।

আমি যখন বেশ ছোট—দিদিও ছোট, দুইবোনে মিলে রবিবারে বাবার জন্য একটা কিছু রান্না করতাম। ছোট্ট তোলা উনুনে রান্না ঘরের দাওয়ায় চলত আমাদের রান্না—আমি শুধু খুন্তি নাড়ার চেষ্টা করতাম। বাবা এত তৃপ্তি করে খেতেন মনে হত যেন এমন সুখাদ্য আর কখনও খান নি। বড় হয়ে বুঝেছি এত সুখ্যাতি ছিল শুধু আমাদের উৎসাহিত করার জন্য।

প্রতি শীতে গঙ্গায় যখন চর ভেসে উঠত আমরা সবাই বাবা মায়ের সঙ্গে মস্ত এক নৌকোয় করে পিকনিক করতে যেতাম। সে কি আনন্দ! কতদিন আগে থেকেই প্রস্তুতি চলত। দিদি নানারকম কাগজ দিয়ে বিভিন্ন রঙের ও আকারের নৌকো বানিয়ে দিতে। সারাদিন হৈ-চৈ করে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে শুরু হত পরের বছরেব প্রতীক্ষা। পাটনার সেই দিনগুলো বড় মধুর ছিল।

ক্রমে দাদারা পড়াশোনার জন্য বাড়ি ছাড়ল। দিদিও বি. এ. পড়তে চলে গেল শান্তিনিকেতনে। সংসারটা যেন ঝিমিয়ে পড়ল। ছুটির অপেক্ষায় থাকতাম। দিদি এলে শান্তিনিকেতনের কত গল্প বলত। প্রমথ বিশী মশাই-এর বই, মাষ্টার মশাই-এর (নন্দলাল বসুর) বই নিয়ে এসেছিল আমাদের জন্য।

পরের বছর আমরা বাকী চার বোনও মায়ের সঙ্গে চলে এলাম শান্তিনিকেতনে। ফাল্গুন মাসের ভোরবেলা আমাদের রিক্সা যখন চীনাভবনের পাশের গেট দিয়ে ঢুকল, চারিদিকের শান্তপরিবেশ, বসন্তের ফুলের সম্ভার ও পাখির গানে বিভোর হয়েছি।

শান্তিনিকেতনকে ভালবাসলাম।

দিদির অভিভাবকত্বে আমাদের নতুন জীবন শুরু হল।

[শ্রীমতী ইবা গুপ্ত গৌরী আইয়ুব-এর সহোদরা]

আমার ভাবী

রীণা মমতাজ

আজ বারবার মনে পড়ছে হারিয়ে যাওয়া সেই অসাধারণ নারীকে যিনি আমার জীবনের দীর্ঘ বিয়াল্লিশটি বছর জুড়ে ছিলেন আর যাঁর প্রভাব আমার জীবনের প্রতিটি স্তরে গভীর ভাবে পড়েছে। আজ তাঁরই স্মৃতিচারণ করব।

খুব ছেলেবেলার আবছা স্মৃতি মনে পড়ে। আমি আর আম্মা রাতের ট্রেনে শান্তিনিকেতন যাচ্ছি। 'আম্মা' আমার মায়ের মা—সালেহা গনি। আম্মার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমিও গান করছি—তখন আমার বয়েস বোধহয় পাঁচ বছর—যাচ্ছি আমার ছোটে-ভাইয়ার কাছে। ছোটে-ভাইয়া আমার দাদামশায় ডাক্তার গনির ছোট ভাই। আমার ছোট-দাদু—আবু সয়ীদ আইয়ুব। সেই ছেলেবেলা থেকেই আমার অভ্যেস ছিল সব সম্পর্কগুলিকে নিজের ইচ্ছে মতো ওলট-পালোট করবার।

আম্মা যাচ্ছেন নিজের অধ্যাপক দেওরের সংসার গুছোতে। সঙ্গে আমিও যাচ্ছি কারণ আমি তো আম্মাকে ছেড়ে থাকতেই পারব না। ওখানে পৌঁছে সারাদিন একা-একা খুব ছুটোছুটি করে

খেলে বেড়ালাম। এতো গাছ, পাখি, কাঠবেড়ালী দেখে অবাক হয়ে গেলাম, তাই অন্ধকার নামতেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ যেন দামামার প্রচণ্ড শব্দে চমকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে ভাবলাম ঘরে আমি একা আর জানলার বাইরে ঘন অন্ধকার চিরে এই শব্দ ভেসে আসছে। ভয়ে বিছানার ভেতরে কুঁকড়ে গেলাম। এমন সময় একটি মেয়ে—মেয়েই বলব, কারণ সে আমার চেয়ে বছর তেরো-চোদ্দোর বড় হবে, কখন থেকে আমার পাশে বসে আছে। আমি ঘুমের ঘোরে টেরই পাইনি—আমার কাছে ঝুঁকে আমার নাম ধরে ডাকল। ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল চেপে ওকে কথা বলতে বারণ করলাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে মিটি-মিটি হাসতে-হাসতে বলল, "রীণা ভয় পেয়েছো?" ভয়ে-ভয়ে জানলার বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললাম "ডাকাত"! এবার সে হেসে ফেলল। আমার গালে হাত বুলিয়ে বলল, "না-না ওতো সাঁওতালেরা মাদল বাজিয়ে নাচছে, ওঠো দেখবে চলো।" হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, "না-না, আমি যাব না, তুমি যাও।" বলল, "ঠিক আছে কাল সকালে এসে তোমায় বেড়াতে নিয়ে যাব।"

পরের দিন ভোর বেলায় সে এলো। শাদা শাড়ি, দু'টি লম্বা বেণী, মুখে সেই হাসি আর কি নরম হাত। আমায় নিয়ে অনেক দূরে বেড়াতে গেল সাঁকো পাব হয়ে সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে আমি তার হাত ধরে কতো ঘুরলাম। তখন কি জানতাম এই মেয়েটিই আমার ছোটে-ভাইয়ার বউ হয়ে, আমার অতি আদরের ভাবী হয়ে আসবে। যার সঙ্গে আমার জীবনের বেয়াল্লিশটি বছর কেটে যাবে। সবার প্রিয় 'গৌরী দি' হলেও, আমার কাছে শুধুই 'ভাবী'। উনি ছিলেন আমার ছোটো-দিদা। আমার 'Friend, Philosopher and Guide'। প্রত্যেক বিপদ-আপদে ওঁর কাছে ছুটে গেছি, উনিও ভরসা দিতেন আমায় সবকিছুতে এবং নিজেও অনেক ছোট-খাটো সাংসারিক ব্যাপারে নির্ভর করতেন। শ্রদ্ধা-ভালবাসার এক আশ্চর্য সম্পর্ক ছিল। ওঁর কাছ থেকে কত কি যে শিখেছি তার হিসেব দেওয়া নয়। ওঁকে আমি দোষে-গুণে এতো কাছ থেকে দেখেছি আর অবাক হয়েছি। অনেক প্রতিভাময়ী নারী তো দেখলাম—কিন্তু আমার সারা জীবনে একই নারীর মধ্যে এতো বুদ্ধি, মেধা, সৃজনশীলতা, নান্দনিক চেতনাবোধ, মানবতাবোধ, যুক্তিবাদী বিশ্লেষণী মন, একই সঙ্গে এতো কিছুর সমন্বয় আগে কখনো দেখিনি—যা এই চার দশক ধরে খুব কাছ থেকে দেখলাম।

ভাবী প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি ছোটে-ভাইয়ার পরিবার সম্পর্কে দুকথা বলি। এই পরিবার সম্পর্কে বলবার লোকের সংখ্যা দিন-দিন কমে যাচ্ছে। সামান্য কিছু তথ্য হয়তো কোনো আইয়ুব-গবেষকেব কাজে লাগবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের কথা। মৌলবী আব্বাদ আবুল মোকারেম-রা সাত ভাই ছিলেন। সাত ভাইয়ের মধ্যে ছয় ভাই গ্রাজুয়েট ছিলেন (এক ভাই হতে পারেননি কারণ তিনি অল্প বয়সে মারা যান)। এঁর বাবা মৌলবী এলাহদাদ এবং শ্বশুর জুলফিকর আলী দু'জনেই পণ্ডিত মানুষ ছিলেন এবং দু'জনে 'সামসুল উলেমা' উপাধি লাভ করেছিলেন। আব্বাস আবুল মোকারেম কলকাতা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এঁরই চারছেলের মধ্যে একজন ডাঃ আবুআসাদ মহম্মদ ওবায়দুল গনি (আমার মা সাজেদা আসাদের বাবা, যাঁকে সবাই ডাঃ গনি নামে জানে।) আর কনিষ্ঠজন আবু সয়ীদ আইয়ুব (আমার ছোটে-ভাইয়া)।

শান্তিনিকেতনের সেই মেয়েটি একদিন আমাদের ঘরে বসে ছোটে-ভাইয়ার সঙ্গে কাগজপত্রে সই করে গৌরী দত্ত থেকে গৌরী আইয়ুব হয়ে গেলেন। ৫নং পার্ল রোডের (যা এখন ডাঃ গনি রোড) আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের স্থায়ী বাসিন্দা হলেন। এই বিয়েতে সাক্ষী

আমার দাদু ডাঃ গনি, শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী (বর্তমানে ইনি 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক) আর মীরা বালসুব্রমনিয়ম। শেষ দু'জন ভাবীর আত্মীয়। সেই দিন থেকে যে ভাবীর সঙ্গ নিলাম, সেই কাছ ছাড়া হলাম ভাবীর মৃত্যুর ঠিক ১৬ দিন আগে যখন আমার নিজের চিকিৎসার জন্য ছেলের কাছে যেতে বাধ্য হলাম।

ভাবী আর ছোটে-ভাইয়ার একমাত্র সন্তান পূষণের জন্ম আমার আজও মনে আছে। তখন আমার বারো বছর বয়েস। সংস্কৃত 'পূষণ' মানে সূর্য—ছোটে-ভাইয়ার দেওয়া নাম। সেদিন আমার 'আব্বা' আসলে দাদু ডাঃ গনি তার জীবনের প্রথম ইলেক্‌শন জিতেছেন কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে। সব স্তরের, সব ধর্মের এমনকি বিরোধী রাজনৈতিক দলের মানুষেরা পর্যন্ত সেই আনন্দ-উৎসবে যোগ দিয়েছে—এতোই তিনি সবার ভালবাসা পেয়েছিলেন। অনেকে আজও মনে করেন ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সেই ভয়াবহ দিনগুলির কথা যখন তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্য সম্প্রদায়ের প্রায় আশি জন মানুষকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে প্রাণ খোয়াতে বসেছিলেন। কিন্তু নিজের সম্প্রদায়ের সেই খুনীদের হাতে অসহায়, নিরপরাধ মানুষদের তুলে দেননি। পরে কিছু শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের হস্তক্ষেপে তিনি নিজেও বেঁচে যান এবং আশ্রিতদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। ভাবী এঁকে 'ভাইয়া' বলে ডাকতেন।

স্বাস্থ্যের জন্য ছোটে-ভাইয়া পারতেন না। কিন্তু ভাবী পূষণ্‌কে নিয়ে ট্রামে করে সারা শহর ঘুরিয়ে আনতেন। পূষণের একটি খুব সুন্দর কালো হুলো বেড়াল ছিল—যার নাম দেওয়া হয়েছিল শ্যামসুন্দর। হঠাৎ একদিন এই শ্যামসুন্দর pesticide খাওয়া আরশোলা খেয়ে মারা গেল। ছোট্ট পূষণের মনের কি অবস্থা। এই দুঃখ ভোলানোর জন্য তার বইভর্তি আলমারীর নাম দেওয়া হল 'শ্যামসুন্দর লাইব্রেরী'। ভাবী 'শ্যামসুন্দর লাইব্রেরী'-র একটা স্ট্যাম্প তৈরী করিয়ে দিলেন সেটা নিয়ে পূষণ নিজের প্রত্যেকটি বইয়ের ওপর ছাপ মারতে থাকলো। ভাবী জানতেন শিশুমনের গভীর দুঃখকে অন্য কাজের দিকে ঘুরিয়ে দিতে।

একবার ভাবীর কোনো এক বান্ধবী ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কি করে উনি সারারাত বসে পরীক্ষার খাতা দেখার পর, সারাদিন ক্লান্তিহীন ভাবে চাকরী, ছোটে-ভাইয়ার দেখা শোনা, ঘরের কাজ করেন। ছোট্ট পূষণ চুলভর্তি মাথা নেড়ে বলেছিলেন 'সতীত্বের তেজ'! এই গল্পটা ভাবী খুব মজা করে বলতেন। আমরাও হাসতাম। আসলে ভাবী তাকে যে চটি পৌরাণিক বইগুলি কিনে দিতেন, কথাগুলি সেখান থেকেই শিখেছিল সে। ছোটে-ভাইয়ার জন্য ভাবীর মনে যে শ্রদ্ধা-ভালবাসা ছিল এবং যা সেবা উনি করে গেছেন, সে-কেলে হলেও এই কথা দু'টির চেয়ে বাস্তব আর কিছু ছিল না।

বড় হয়ে 'শ্যামসুন্দর লাইব্রেরী'র এই ক্ষুদে লাইব্রেরিয়ানটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Gold Medalist এবং বর্তমানে Tata Fundamental Research Institute-এর একজন বিশিষ্ট Physicist এবং Professor। ছোটে-ভাইয়া আর ভাবীর যোগ্য পুত্র।

আমার আজও মনে পড়ে যেদিন প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরেজীর পক্ষে আন্দোলনে গিয়ে স্বেচ্ছায় গ্রেফতার হওয়ার পর ঘরে ফিরে এসেই অথবা ছোটে-ভাইয়ার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে 'দেশিকোত্তম' নিয়ে ফিরে এসেই, যে মেয়েটি ছোটে-ভাইয়াকে খাওয়াচ্ছিল তার হাত থেকে চামচ নিয়ে ভাবীই ছোট-ভাইয়ার মুখে খাওয়া তুলে দিতে থাকলেন। আশ্চর্য! কোনো ক্লান্তি নেই। নিজস্ব কোনো চাহিদা নেই।

ছোটে-ভাইয়াও আশ্চর্য মানুষ ছিলেন, 'Parkinsonison-এ সমস্ত শরীর অচল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মস্তিষ্ক সমানে কাজ করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, সুর, জীবন-দর্শন

নিয়ে তিনি শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়েছেন। এতো অসুস্থতার মধ্যেও কি অসীম ধৈর্য, একাগ্রতা! যেন কোনো ঋষি তপস্যায় মগ্ন হয়ে আছেন!

ছোটে-ভাইয়ার মৃত্যুর সময় ভাবী আর আমি ওঁর মাথার কাছে বসে নিচুস্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলে যাচ্ছি, ওঁর ঘুম ভাঙ্গার অপেক্ষায়—যেমন রোজ সকালে আমরা বসতাম ওঁর অসুস্থতার দিনগুলিতে। ভাবী বা আমি কেউ ভাবতেই পারিনি সময় ঘনিয়ে এসেছে। হঠাৎ ভাবী বুঝলেন আর ওইটুকু সময়ের মধ্যেই মাথাস্থির রেখে প্রাণপণে চেষ্টা করলেন যা করা সম্ভব। এমনকি সব শেষ হওয়ার পরও স্বামীর নিষ্প্রাণ দেহ নিয়ে কয়েক মিনিট আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। হঠাৎ বুঝলেন উনি একা। আমি একটু দূরে সরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার দিকে তাকিয়ে থমকে গেলেন। নিস্তব্ধ ঘরে আমরা দু'টি মানুষ একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। এবার বুঝলেন। পা টেনে-টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে ঢলে পড়লেন নিজের বিছানায়---সারা জীবনের যুদ্ধ হেরে ফিরলেন।

ভাবীর বিশ্বাস ছিল ছোটে-ভাইয়া আশি বছব পূর্ণ করবেন। আম্মাও প্রায়ই বলতেন "গৌরীর জন্যেই আবু সয়ীদ এতদিন বেঁচে রয়েছে।" ছোটে-ভাইয়া চলে যাওয়ার পর ভাবী যখন ভোরবেলায় শূন্য ঘরে খাওয়ার টেবিলে একা বসে থাকতেন, তখন ওঁর চোখেব দিকে তাকাতে পারতাম না—সারা দুনিয়ার নৈরাশ্য যেন ওঁর দু'চোখে নেমে এসেছে।

শেষের কয়েকটা বছর ভাবীর কাছে প্রচুর লোকজন আসতেন, সারাদিন ওঁকে একা পেতাম না, তাই রাতে ওঁর কাছে গিয়ে বসতাম। খুব বেশী আলোচনা হতো ছোটে-ভাইয়া আর 'বাইয়া'কে নিয়ে—ইনি ছিলেন আম্মার ভাই—পদ্মভূষণ হাবিব রহমান, ভারত সরকারের প্রধান স্থপতি। এদেশের অনেক কিছুর স্রষ্টা কিন্তু মানুষ হিসেবে খুব বড় মাপের। ভাবীর ও আমার খুব প্রিয়, বড়ো শ্রদ্ধার। সম্প্রতি ওঁর স্ত্রী ইন্দ্রাণী রহমান, ভারত নাট্যমের বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী (আমার দিদিমা) হঠাৎ মারা গেলেন। তিন বছরের মধ্যে এই তিনটি মৃত্যুর ধাক্কা সামলাতে হয়েছে আমাকে।

বাইয়ার অসুস্থতার সময় নিজের অসুস্থতাকে অগ্রাহ্য করে ভাবী তাঁকে দেখতে গেলেন ট্রেনে করে দিল্লী, নিজের বান্ধবী মৃন্ময়ী বসুকে সঙ্গে নিয়ে। ভাবীর খেয়াল রাখার জন্য খুব দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ সঙ্গে যাওয়াতে আমিও অনেক নিশ্চিন্ত হলাম। ট্রেনে বসে আমায় যে চিঠিটি লিখেছিলেন তার কিছু অংশ তুলে দিলাম।

"বাইরে শস্যের ক্ষেত—চাষীদের ঘর সংসার গ্রাম। ভেতরে হিন্দি ফিল্মী গান। চোখেব আবাম, কানের পীড়া—যেখানে সেখানে ট্রেনটা থামছে। গাজিয়াবাদে থামার বদলে সাহিবাবাদে থেমেছে দেখে মৃন্ময়ী খুব রেগে আছে। স্টেশনে লাল বোগানভিলিয়া আলো করে আছে। দেরী হলে যাদের ভাবনা হবে তাদের কথাই ভাবছি। শরীরও বিকল লাগছে। সারারাত ঘুম নেই।"

একবার পূষণের বিয়ের আগে আমাদের বাড়ীতে কোনো এক মহিলা এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন পূষণের বউকে আমরা ধর্মান্তরিত করছি কি না। এমন নির্মম প্রশ্ন যে কেউ করতে পারে আমার ধারণা ছিল না। আমাদের পরিবারের সব বউ অ-মুসলমান কিন্তু কোনো মানুষের নাম বদলে তার গোটা অস্তিত্ব ছিনিয়ে ধর্মান্তর করাকে, আমরা মহাপাপ মনে করি। আমার আগেই এর যোগ্য উত্তর ভাবী দিলেন "আমার স্বামীর পরিবারের কেউ ধর্ম দিয়ে মানুষ যাচাই করেন না। তাই আমি বা আমার আগে যাঁরা এবাড়ীর বউ হয়ে এসেছেন বা যারা বউ হয়ে আসবে তাদের কেউ নিজের নাম-ধর্ম বদলায়নি আর বদলাবেও না।"

সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, এ নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। ভাবীকে বার-বার বলতাম, এখন ওর দু'টি কাজ—সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কলম ধরা আর ছোটে-ভাইয়ার বিষয়ে লেখা। কিন্তু বড্ডো দেরী করে উনি নিজের আত্মজীবনী লেখা শুরু করলেন। শরীর তখন অচল, নিজের হাতে লেখার ক্ষমতাটুকুও চলে গেছে। তবুও এরই মধ্যে প্রতি সোম, বুধ আর শুক্রবার রাত আটটার পর আমাদের ওঁর ঘরে যাওয়া নিষেধ ছিল, কারণ ওই সময়টাতে ভাবী নিজের জীবনের কথা বলে যেতেন আর কয়েকঘণ্টা ধরে তা লিখে যেতেন ডাঃ কামাল হোসেন—বিশিষ্ট লেখক ও সাইকিয়াট্রিষ্ট। সে লেখা আর শেষ হল না, তার আগেই ভাবী চলে গেলেন।

ভাবীর মা শেষ জীবনে এ বাড়ীতে ভাবীর সঙ্গেই থাকতেন। শুধু মৃত্যুর আগে নিজের শান্তিনিকেতনেব বাড়ীতে ফিরে গিয়েছিলেন। ওঁর মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতন থেকে আমায় লেখা ভাবীব চিঠির কিছু অংশ তুলে দিলাম।

"আমরা এসে পৌঁছাবার দু'ঘণ্টা পর মায়ের সৎকার হল। বাগানের ফুল দিয়ে মালা গেঁথে মাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও তাদের বাগানের ফুল দিয়ে মাকে প্রণাম করছিলেন। বাচ্চুদি, ক্ষমাদি এবং আরো কেউ-কেউ বসে গান গাইছিলেন। এত সুন্দর বিদায় নেওয়া তো কলকাতায় সহজ হত না। তাই মনে হচ্ছে এখানে আসাই মার পক্ষে ভালো হয়েছে। মেয়ের বাড়িতে বলে যে কলকাতার চেয়ে এ জায়গা বেশি পছন্দ সই তা নয়। আমি যদি শান্তিনিকেতনে থাকতাম আর মার নিজের বাড়ি থাকত কলকাতায় তাহলে উল্টো হলেই ভাল হত—অর্থাৎ মেয়ের বাড়িতে মৃত্যু হলে।

রাত্রে একাদশীর জ্যোৎস্নায় বাবান্দায় বসে মনে হল যে এখানে বসেই বলা যায় "তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যত দূরে আমি ধাই। কোথায় মৃত্যু কোথায় দুঃখ কোথা বিচ্ছেদ নাই।" বললে মানায়। কলকাতার চার দেওয়ালে ঘেরা বন্ধ খাঁচায় মৃত্যুশোক দম আটকে দিতে চায়।"

শেষের দিকে ভাবী খুব ক্ষীণস্বরে মাঝে-মাঝে বলতেন, "আমাদের দু'জনের জন্যে খুব চিন্তা হয়।" কথাটাকে হাল্কাভাবে নিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, এই 'আমরা দুজন' কারা। উত্তর দিতেন, "তুমি আর আমি।" ভরসা দিয়ে বলতাম, "ভাবী, দেখবেন এই আমি আর আপনি দু'জনেই আবার ঠিক্ সেরে উঠবো।" উত্তর না দিয়ে চুপ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কি বিষাদ ভরা সেই চাহনি!

আমার নিজের চিকিৎসার জন্য ভাবীকে ছেড়ে বাধ্য হয়ে যখন ছেলের কাছে বম্বে চলে যাচ্ছি, বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যেই এগোতে যাব—ওঁর স্পষ্ট গলার স্বরে থমকে গেলাম— "রীণা, তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।" ছেড়ে যাচ্ছি বলে এমনিতেই মন খুব ভার ছিল। তক্ষুনি বসে পড়ে ওঁর নরম হাত দু'টি আমার দু'হাতের মুঠোয় নিয়ে কাঁপা স্বরে বললাম— "ভাবী এমন কথা কেন বললেন?" দৃঢ় স্বরে ছোট্ট করে উত্তর দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন, "তুম দেখ্না!" শান্তিনিকেতনের সেই প্রথম দেখার দিনটি থেকে এই শেষ দিন পর্যন্ত ভাবী আমার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলে গেছেন। এর ষোলো দিন পর পূষণ আমায় জানালো, তার মা আর নেই। আমার জীবনের বড় এক অধ্যায় শেষ হল। ছেলেবেলার দেখা শান্তিনিকেতনের সেই মেয়েটি আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, আমার ফিরে আসার অপেক্ষাও করল না সে—শেষ দেখা আর হল না। নিজের শেষ কথা রাখলো সে। ইচ্ছামৃত্যু??

[রীণা মমতাজ আবুসয়ীদ আইয়ুবের অগ্রজ ডা এ. এম. ও গণির দৌহিত্রী। পেশায় চিকিৎসক]

'বাণী মোর নাহি'

সন্‌জীদা খাতুন

একাত্তর সালে শরণার্থী অবস্থায় জাস্টিস্ মাসুদ আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন গৌরী আইয়ুব/আবু সয়ীদ আইয়ুবের বাসায়। আইয়ুব তখনো চেয়ারে বসে আলাপ করেন অতিথিদের সঙ্গে। মোটামুটি সুস্থই ছিলেন। তাঁর লেখা 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' বইটি আলী যাকেবের সূত্রে হাতে পেয়েছিলাম সত্তর সালের দিকে, পড়া শেষ হয়নি। যুদ্ধকালে ঢাকায় পরিত্যক্ত বাসা থেকে সে বই আর উদ্ধার হতে পারবে না শুনে নিজ হাতে নাম লিখে বইটি উপহার দিলেন। সেদিন গৌরীদি বাড়িতে থাকলেও শরণার্থী শিবিরের স্বেচ্ছাসেবা প্রসঙ্গ নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, খুব মন দিতে পারেননি আমার দিকে। তখন কলকাতার মুসলমানরা এপারের মুসলমানদের ওপারে আশ্রয় নেবার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট। মুসলিম মহল্লায় নানা জল্পনা কল্পনা হচ্ছে। এই নিয়ে বিশিষ্ট মুসলমানদের সাথে বৈঠক করবার বিষয়ে মাসুদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ-পরামর্শ করছিলেন গৌরী আইয়ুব।

আইয়ুব ঢাকায় পাকিস্তানী হানাদারদের হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে 'দেশ' পত্রিকায় তার লেখা 'কোথায় সনজীদা! কোথায় ফাহ্‌মিদা!' আলোচনা দেখতে দিলেন। গান নিয়ে আলাপ করলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত খোলা গলায় গাওয়া উচিত, এসব কথা বললেন। গৌরীদি তখন নান্দনিক আলাপচারিতে আগ্রহী নন মোটেই। ঢাকা থেকে রোজবু (সিধু ভাইয়ের স্ত্রী) বুদ্ধিজীবীদের সীমান্ত পার করিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন গৌরীদির কাছে, গৌরীদি তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করছেন ব্যস্তভাবে। মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে শরণার্থী শিবিরের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছেন। সে তো শান্তির সময় নয়! তাই তখন তাঁর সঙ্গে বসে আলাপ করা হয়নি আমার।

পান্নালাল দাশগুপ্তর 'কম্পাস' পত্রিকার সঙ্গেও মৈত্রেয়ী দেবী আর গৌরীদি সম্প্রদায়—চেতনাবিরোধী আন্দোলন করেছেন শুনেছি। পরেও 'খেলাঘর' প্রতিষ্ঠানের কাজে এঁরা সময় দিয়ে কত অনাথ মেয়েকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা দিয়েছেন, জানি। সমাজের কাজ আর যে কোনো ধরনের সেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা গৌরীদির স্বভাবজাত। মৃত্যুর পরও দেহটি রেখে গেছেন জনকল্যাণে ব্যবহারের জন্যে। মানবসেবার দিকে এমন ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল তাঁর।

দুই

উনিশ শো চুয়ান্ন সালের কথা। অনার্স পরীক্ষা দিয়ে শান্তিনিকেতনে পড়তে যাবার বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলেছি দেখে আব্বু বললেন আচ্ছা, ওখানে গিয়েই দুজনের সঙ্গে আলাপ করবে—একজন কৃষ্ণা আর একজন গৌরী। এঁরা তিপ্পান্ন সালে শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলায় স্বেচ্ছাসেবা দিয়ে মুগ্ধ করেছেন অতিথিদের। কৃষ্ণাকে খুঁজে পাইনি আজো। আর গৌরী? শুনেছিলাম শ্রীসদনের সামনের কাঁকুরে রাস্তাটা পশ্চিম দিকে গিয়ে যে—বাড়িতে ঠেকে—সেই বাড়িতে থাকেন গৌরী। একদিন চলে গেলাম। দেখি সেটি পাঠভবনের শুভাদের বাসা। গিয়ে 'গৌরী' নামের কে আছে জিগ্যেস করতে কেউ আর জবাব দেয় না, অন্য দিকে তাকায়। কিছুই বোঝা গেল না।

তারপর একাত্তর সালে দেখলাম গৌরী আইয়ুব আর আবু সয়ীদ আইয়ুব দত্তকে। হ্যাঁ,

শুনেছিলাম ইনি গৌরী দত্তকে বিয়ে করে প্রথম দিকে নিজ নামের শেষে দত্ত যোগ করতে শুরু করেছিলেন। ক্রমে শুনলাম, দর্শনের দুর্ধর্ষ অধ্যাপক ধীরেন্দ্রমোহন দত্তের কন্যা গৌরী আবু সয়ীদ আইয়ুবকে বিয়ে করবার ফলে পরিবারে ত্যাজ্যা হয়ে ছিলেন। তাইতেই তিপ্পান্ন সালের প্রাণোচ্ছল সেবাকর্মী গৌরীকে চুয়ান্ন সালে সে বাড়ির কেউ চিনতে চায়নি। দীর্ঘকাল পরে সে—ঘটনার অর্থ স্পষ্ট হয়েছিল আমার কাছে। চুয়ান্ন সালের পর একাত্তরসাল—কত বছর হল? সতেরো বছর!!

তারপরে কতবার গেছি ওপারে। শান্তিনিকেতন যাবার পথে কলকাতায় একবার আইয়ুবকে দেখে যাওয়া, তাঁকে গান শুনিয়ে যাওয়া ছিল আমার আনন্দময় অবশ্যকর্তব্য। আইয়ুব তখন শয্যাশায়ী। যেমন সমাজকর্ম নিপুণা তেমনি গৃহকর্মনিপুণা গৌরীদি প্রবেশপথের লাগোয়া প্রথম ঘরটিতে বসে কারো না কারো সঙ্গে আলাপ করছেন, দেখতে পেতাম। তারই ফাঁকে পুনদেও কিংবা অন্য সেবক সেবিকাদেব নানা নির্দেশ দিয়ে চলেছেন। সে ঘরে বসে চা/কফি পান করা হলে পাশেব ঘবে আইয়ুবের শয্যাপাশে চেয়ার বসানো হত। বলতেন, যাও এবার ওঁর সঙ্গে কথা বলো—গান শোনাও। গৌরীদি তখনো কথা বলছেন কখনো আরতিদি কখনো রুচিরা শ্যাম কখনো স্বপন মজুমদারেব সঙ্গে। আরতিদি আইয়ুবের এবং তাঁর পরিবারের বান্ধবী। রুচিরা শ্যাম আইয়ুবের 'পথের শেষ কোথায়' বইয়ের শ্রুতিলিখন নিচ্ছেন। স্বপন মজুমদার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে যুক্ত আইয়ুবের গ্রন্থের প্রকাশনা কাজে। সব কিছুর কেন্দ্রে আছেন গৌরীদি।

তিন

কেন যে গৌরীদি বলা। একত্রিশ সালে জন্ম, অর্থাৎ আমার চেয়ে মাত্র দুবছরের বড়। কিন্তু আইয়ুবের এই সহচরীকে আমি মহীয়সী রূপে দেখেছি যে! সে তাঁর কর্মদক্ষতার জন্যেও, আবার আইয়ুবের মতো মানুষের প্রেম অর্জনের যোগ্যা বলেও। আইয়ুবের মৃত্যুর পরে তাঁকে লিখেছিলাম, আইয়ুব যা লিখে যেতে পারলেন না তা লিখে শেষ করতে হবে আপনাকে। কাবণ, আইয়ুবের ভাবনার ধাবাটি জানা ছিল তাঁর প্রিয় জীবনসঙ্গিনীরই।

একমাত্র সন্তান পুষণের সঙ্গে চম্পাকলির বিয়ের পত্র পাঠিয়েছিলেন আমাকে ঢাকাতে। লাল কালিতে তাঁর হাতের লেখায় ছাপানো দর্শনীয় চিঠি, সংরক্ষণ না করে পারা যায় না।

শ্রীশিক্ষায়তন নামের কলেজে অধ্যাপনা করতেন। শান্তিনিকেতনে অধ্যায়নরত বাংলাদেশের ছাত্রীরা অনেকেই আসা—যাওয়াব পথে তাঁব বাড়িতে উঠত। আমিও দু-একবার উঠেছি। একবাব লেখাপড়া শেষ কবে ফিবতি পথে যাবতীয় লটবহর নিয়ে তাঁর বাড়িতে উঠলাম। স্থলপথে দেশে ফিরবার কথা। ভাবলাম পুনদেও ভোরবেলা সঙ্গে গিয়ে বনগাঁর ট্রেনে তুলে দেবে, তাতে সুবিধে হবে। পুনদেও তো ট্রেনে তুলে দিয়ে বিদায় নিয়ে ফিরে গেল, খানিক্ পরে ঘোষণা শুনলাম—ঐ ট্রেনটি বনগাঁ যাবে না। আর এক প্ল্যাটফর্ম থেকে বনগাঁগামী ট্রেন ছাড়বে। নির্দয় ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে মালপত্র নিয়ে কোনোমতে দ্বিতীয় ট্রেনে উঠলাম। কাঁদো কাঁদো অবস্থা! দেরিতে হলেও ট্রেন ছাড়ল, কিন্তু প্রতি স্টেশনে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। কানাঘুসা চললো যে, পথে কোথাও কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছে তাই ট্রেন বনগাঁ পর্যন্ত যাবে কিনা সন্দেহ। একটা জাংশনে এসে ট্রেন থামলো তো থামলো। তারপর ঘোষণা—ট্রেন বনগাঁ যাবে না। অনেকে নেমে ওভারব্রিজ পার হয়ে চলে গেল, বাস ধরে গন্তব্যে যাবে বলে। মালপত্রের দিকে তাকিয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করছে। তবু সে-সব হেঁচড়ে টেনে নামিয়ে

স্টেশনের বাঁধানো গাছতলায় বসে রইলাম। শুনেছিলাম, লাইন ক্লিয়ার হলে ট্রেন যেতেও পারে। একা অত জিনিসপত্র নিয়ে বাস ধরে বনগাঁ যাবার কল্পনা করা বাতুলতা। কুলিদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল ওসব সুবিধা হবে না। ততক্ষণে ঐ স্টেশনে শেয়ালদাগামী একটি ট্রেন আসছে বলে ঘোষণা হল। মাল নিয়ে ওভারব্রিজ পার হয়ে ফিরতি ট্রেনটা ধরাই যুক্তিসঙ্গত মনে হল তখন। বাকি বৃত্তান্ত থাক।

গৌরীদির বাড়িতে ঢুকতে, তিনি তো অবাক—কি হল! এতক্ষণে সত্যি সত্যি চোখ ভিজে উঠল। সব শুনে প্রশান্ত হেসে বললেন—'তাতে কি হল, কালকে যেয়ো। হাতমুখ ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করো।' সীমান্ত পাড়ি দিতে গোনাগাঁথা টাকা নিয়ে চলতে হয়, আমাদের মতো আইনভীরু মানুষদের। পুনরায় যাত্রা করবার মতো খরচ-খরচা নেই হাতে। গৌরীদি বললেন—'আমার কাছ থেকে টাকা নাও। আর শোনো, এ টাকা ফেরৎ দিতে হবে না। আবার যখন আসো, বাংলা একাডেমীর বই কিনে এনে আমাকে দিও।' বই কিনে দিয়ে সে-টাকা শোধ হয়েছিল কি? শোধ হবার? বড় বোনের মতো স্নেহালোকিত সেই মুখের ঋণ শোধ হয় না।

চার

স্বামীর আর্থারাইটিস্ রোগটি ধরেছিল তাঁকেও। এ রোগ ক্রমে তাঁর চলাচল ক্ষমতা হরণ করে নিচ্ছিল। তাও ঢাকার নায়েলা লুবনা তাদের মা সুলতানা জামান আর রোজবুদের আকর্ষণ, আরো নানা অনুরাগীর আকর্ষণে শরীরের বাধা অস্বীকার করে ঢাকায় এলেন একবার। আরো বড় আকর্ষণ ছিল জাহানারা ইমামের কাছে আসবার। গৌরীদিকে নিয়ে তখন খুব মেতেছিলাম আমরা সবাই। ভাষা ইনস্টিট্যুটের একতলার একটি ঘরে, একদিন গল্পসল্প হল। সব কথাতেই অনিবার্য চলে আসেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তনের প্রাঙ্গণে তাঁকে নিয়ে জমায়েত হল। গান শুনলেন, কথা শুনলেন, তারপর তাঁর অতুল ভাষায় সংবর্ধনার উত্তর দিলেন। বাংলা একাডেমী তাঁর উপস্থিতিতে আবু সয়ীদ আইয়ুবের লেখার পর্যালোচনার ব্যবস্থা করলেন।

জানতাম কাজী আব্দুল ওদুদের শেষ জীবনের রোগশোকাক্রান্ত দুঃখদিনে গৌরীদি তাঁর কাছাকাছি ছিলেন। চুরানব্বই সালে ওদুদ সাহেবের জন্মশতবর্ষে আমরা যেন ওদুদ সাহেবকে স্মরণ করতে না ভুলি, এই বলে চিঠি দিয়েছিলেন আমাকে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের তিনদিন ব্যাপী বক্তৃতার আয়োজনে গৌরী আইয়ুবকে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। অনেকদিন কোনো জবাব নেই। একেবারে শেষদিকে ক্যুরিয়ার সার্ভিসে পাঠানো বড়সড় চিঠি পেলাম তাঁর। দীর্ঘকাল বম্বেতে ছেলের কাছে ছিলেন চিকিৎসার প্রয়োজনে। ফিরে এসে আমার তিনখানি চিঠি একবারে পেয়ে দ্রুত জবাব পাঠিয়েছেন। আসামে যাবার কথা দেওয়া ছিল অনেক আগে থেকে, তাই তাদের আমন্ত্রণ রাখতেই হবে। আসতে পারবেন না ঢাকায়। মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তিনিও খুব দুঃখ জানিয়েছিলেন।

পাঁচ

যখনই কলকাতা গিয়েছি, প্রায় প্রতিবারই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। সেবার ফোন করেছি, গৌরীদি বিকেলে আসব। বললেন, বিকেলে আমার এখানে একজন* আসছেন বেগম

*শ্রীমতী শীলা চক্রবর্তী

রোকেয়ার ওপরে তাঁর লেখা নাটক শোনাবেন। খুশি হয়ে বললাম—বেশ তো সে নাটক শুনব, তারপরে গান শোনাব। আমার এই সেধে সেধে গান—শোনানোটা তাঁর ভারি পছন্দ ছিল।

শেষ তাঁকে দেখেছি এ বছরের জানুয়ারির ১৬ তারিখ সকালে। রোগে কাতর এ কোন্ গৌরীদি! ছটফট করছেন সারাক্ষণ। পুণ্‌দেও একবার হাত ধরে আস্তে ধীরে টেনে বসাচ্ছে, আবার খানিক পরে শুইয়ে দিচ্ছে। মুহূর্মুহু অবস্থান বদল করতে হচ্ছে।

পরে পরে দুবার অপারেশন করিয়েছিলেন দুপায়ে। প্রথমটায় ভাল থাকলেও আর্থারাইটিসের আক্রমণ উঠে এল দুহাতে। টেলিফোনে দুঃখ করে বলেছিলেন জানো, মশারির দড়িটাও আর নিজে বাঁধতে পারছি না। কয়েক মাস আগে লুবনা বলছিল—গৌরী নানীর বেঁচে থাকাটা আর তাকিয়ে দেখা যায় না, এবার ওঁর চলে যাওয়াই ভাল।

'প্রমা' পত্রিকাতে কয়েকটি সংখ্যা জুড়ে আইয়ুবের স্মৃতিচারণ করছিলেন কিংবা করবেন বলেছিলেন। সেই রকম সময়েই, তাঁর সঙ্গে যে-সন্ধ্যাটির স্মৃতি আমার মনকে ভরে রাখবে চিরকাল—সেই সন্ধ্যার কথা বলি। ঘরের আলো কমিয়ে প্রথমে গাইলাম 'নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে,/ ওগো প্রবাসিনী, স্বপনে তব/তাহার বারতা কি পেলে'। কেমন লাগল, বোঝা গেল না। ভয়ে থাকি, কারণ গানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন তাঁদের বাড়ি গিয়ে কত যে গান শুনিয়েছেন। আইয়ুবের মুখে শুনেছি, 'গৌরীর গানের গলা ছিল চমৎকার—চর্চা আর হলো না'। একটু থেমে গান ধরলাম—'বাণী মোর নাহি,/স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি'। চঞ্চল হয়ে বলে উঠলেন—'আইয়ুবের গান'। ফিবে ফিরে গাইতে হল এ গান। শেষে গানের ইতিবৃত্তান্ত বললেন। গ্রীষ্মের ছুটি হয়েছে, গৌরীদি গেছেন পাটনাতে। সেখান থেকে ৫ নম্বর পার্ল রোডে আইয়ুবকে লিখেছেন তাঁর 'প্রথম' চিঠি। দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করছেন চিঠির জবাবের জন্যে। চিঠি এল। তাতে 'বাণী মোর নাহি' গানটি আগাগোড়া লিখে নিচে নাম স্বাক্ষর করেছেন আইয়ুব।

বাণী মোর নাহি,
স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি।
আমি অমাবিভাবরী আলোহারা,
মেলিয়া অগণ্য তারা
নিষ্ফল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি।
তুমি যবে বাজাও বাঁশি   সুর আসে ভাস
নীরবতার গভীরে   বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমার সুরের প্রতিধ্বনি তোমারে দিই ফিরায়ে,
কে জানে সে কি পশে তব স্বপ্নের তীরে
বিপুল অন্ধকার বাহি।

আইয়ুবের স্তব্ধ প্রতীক্ষার নীরব গভীরে গৌরীদির বাঁশির সুর ভেসে এসেছিল। তিনি সেই সুরের প্রতিধ্বনিই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন গৌরীদির স্বপ্নের তীরে। এ গানের মর্ম তাঁদের স্মৃতি ঘিরেই গুঞ্জরিত হয়ে ফিরবে আমার কাছে আজীবন।

সৌজন্যে : সংবাদ সাময়িকী, জুলাই ২৩, ১৯৯৮

[সন্‌জীদা খাতুন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও লেখিকা]

তিনি সুন্দর ছিলেন

শুভাপ্রসন্ন

তাঁকে আমি জানতাম সেই সময় থেকে—যখন বুদ্ধিজীবী মহলে, শিক্ষা জগতে একজন দৃপ্ত, বলিষ্ঠ, সংস্কারহীন স্পষ্টবাদিনী হিসাবে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল সর্বত্র। ষাটের দশকে গৌরী আইয়ুব দত্তকে এভাবেই জানতাম। মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ পড়তাম। বিষয় হয়ত জটিল, গম্ভীর কিন্তু উপস্থাপনা ঝরঝরে আটপৌরে সহজ ভাষায়—। সেখানে পাণ্ডিত্যের গুরুগম্ভীর নিনাদ ছিল না।

তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল অনেক পরে। প্রথম দেখায় তাঁকে সুন্দর মনে হয়েছিল। শিক্ষিত মানুষ যেমন সুন্দর হন। তাঁদের রুচিবোধ যেমন স্বাভাবিক ভূষণ হয়। মানবিক ধর্ম যাঁদের উজ্জ্বল করে, ঠিক তেমনিই মনে হয়েছিল তাঁকে। স্পষ্ট অথচ তীব্র ছিল না তাঁর কণ্ঠস্বর। ব্যবহারে, কাজে, প্রকাশ ভঙ্গিমায় যথার্থভাবে রবীন্দ্র মননের অধিকারিণী ছিলেন তিনি।

মৈত্রেয়ী দেবী চলে যাবার পর খেলাঘরের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল তাঁকে। একদিন চিঠি পাঠিয়ে, টেলিফোনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন খেলাঘরে মৈত্রেয়ী দেবীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। সেই প্রথম আমার খেলাঘরে যাওয়া। কত অনাথ, ছিন্নমূল মানুষদের জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার যে স্বপ্ন পরিকল্পনা মৈত্রেয়ীদি এই খেলাঘরের মধ্যে শুরু করেছিলেন। তাঁর অবর্তমানে এই দায়িত্ব মৈত্রেয়ী-সুহৃদ গৌরীদি শারীরিক অক্ষমতা তুচ্ছ করে পালন করেছিলেন। সেদিনের সেই সুন্দর প্রভাতী অনুষ্ঠানের পর খেলাঘরের সমস্ত কর্মকাণ্ড একে-একে দেখিয়েছিলেন। পরে সুযোগ হয়েছিল একান্তে তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতার। প্রকৃতি, পরিবেশ আর মানুষের স্বাভাবিক শিল্প চেতনা, জীবনে শিল্পবোধের গুরুত্ব আর তারই পাশাপাশি সহজ অনাড়ম্বর জীবন চর্চার মধ্যে গান্ধীর জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে গৌরীদির নিজস্ব সমাজ ভাবনায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

আর একটি ছোট ঘটনার কথা মনে পড়ে। সে ঘটনা আমায় বিব্রত, বিচলিত করেছিল। একদিন কোনও এক অনুষ্ঠানের পর বাড়ী ফিরে যাবার জন্য উদ্যোক্তারা একটি ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দেন। কথামত ঠিক হয়, গাড়িটি প্রথমে পার্ক সার্কাসে গৌরীদিকে পৌঁছে দিয়ে আমায় কলেজ ষ্ট্রীটে নিয়ে যাবে। গৌরীদির সঙ্গে ছিলেন ওস্তাদ সাগিরুদ্দিন খান্ সাহেবের স্ত্রী। ড্রাইভারটি ছিল অবাঙ্গালী। মাঝ বয়েসী, সম্ভবত বিহারী। ট্যাক্সিতে ওঠার পর কিছু কথোপকথনে ড্রাইভারটি বুঝতে পারে মুসলমান সাগিরুদ্দিনের হিন্দু স্ত্রী তার আরোহিণী। হঠাৎই স্পর্দ্ধা শালীনতার সীমা ভেঙ্গে সে উপদেশ দেবার ভঙ্গীতে বলতে থাকে—মুসলমানেরা কৌশল করে হিন্দু জেনানাদের শাদী করে। হিন্দু সমাজের পবিত্রতা, আভিজাত্য নষ্ট হয় এইভাবে। আর কিছু লেড়কি আছে যারা হিন্দু হয়েও তাদের ধর্মকে, সমাজকে মুসলমানদের কাছে লুটিয়ে দেয়। ড্রাইভারটির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ক্রোধ মিলে এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি তখন। অশিক্ষা, অন্ধ সংস্কারের বিষে জর্জরিত ভারতবর্ষের চেহারা দেখছি ঐ লোকটির মধ্যে দিয়ে। আমরা সকলেই কিছুক্ষণ বেবাক! আমি তাকে বাধা দিয়ে থামতে বলার পরই-গৌরীদি লোকটির কাঁধে হাত রেখে বললেন, "জানো, আমিও একজন মুসলমানকে বিয়ে করেছি। কিন্তু আমরা তো এরকম কিছু ভাবিনি! মানুষের ধর্মে আমাদের শ্রদ্ধা ছিল, মিল ছিল, সেই মিলটাই

তো দরকার। আমাকে দেখে কি তোমার মনে হয়েছে—আমরা দেশকে, ধর্মকে, সমাজকে নষ্ট করে দিয়েছি? যে ধর্মই তুমি পালন কর, বিশ্বাস কর--সেতো মানুষ হবার কথা শেখায়। অন্যকে ঘৃণা করে বিদ্বেষ ছড়িয়ে তো ধর্ম পালন হয় না।"

গৌরীদি চেষ্টা করেছিলেন, তার "মানুষ"-টাকে ছুঁতে। যা সকলের খোলসের ভেতরে থাকে। যে খোলসে খোলসে কাদা মাখামাখি হয়, রক্ত মাখামাখি হয়—ভেতরের মানুষ হারিয়ে যায়। যে মানুষের কেনো বিশেষ রঙ নেই--কিন্তু রঙীন হবার মন আছে। মানুষে মানুষে, হৃদয়ে হৃদয়ে সেই মহামানবের সাগরতীরের বাসিন্দা ছিলেন তিনি।

জানিনা সেদিনের সেই স্পর্শ—লোকটিকে মানুষ করেছিল কিনা!

[শ্রী শুভাপ্রসন্ন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও লেখক]

গৌরীদিকে মনে পড়ে

জাহানারা বেগম

বেশ অনেকদিন হয়ে গেল আমি তখন কলেজের ছাত্রী, তখন প্রায়ই মনে হতো অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে ও তাঁর সহধর্মিণী অধ্যাপিকা গৌরী দত্ত আইয়ুবের সঙ্গে আলাপ করবো। তাঁদের নাম অনেক শুনেছি, বিদগ্ধ পণ্ডিত আইয়ুব, তেজী প্রতিবাদী মহিলা গৌরী দেবী। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে তখন আমরা আলিপুর 'হেস্টিংস হাউস কম্পাউন্ড' এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর হস্টেলে থাকি। তখনই শুনতাম মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনে যে তেজস্বী নারী নেতৃত্বের সারিতে রয়েছেন তিনি অধ্যাপিকা গৌরী দত্ত আইয়ুব। আইয়ুব দম্পত্তির সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা মনে মনেই রইল, পড়ার চাপে ও নানা কারণে যাওয়া হয়নি। তাছাড়া শুনেছিলাম আইয়ুব সাহেব অসুস্থ, তাই একটু সংকোচ ও দ্বিধাও ছিল। তবে একথাও জানতাম যে শারীরিক দিক দিয়ে তিনি অসুস্থ হলেও মনের দিক দিয়ে, প্রজ্ঞার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সুস্থ, পূর্ণ ও সজাগ। এখানে মনে পড়লো তাঁর নামের সঙ্গে 'সাহেব' কথাটির সংযোজন আবু সয়ীদ আইয়ুব পছন্দ করতেন না। শুধু আইয়ুব বললে খুশী হতেন। তাই তিনি ছিলেন সকলের সমাদরের 'আইয়ুব'। তাঁর সম্পর্কে আলোচনায় এই সংক্ষিপ্ত নামটিই তাঁর ও সকলের প্রিয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে কলেজে সবেমাত্র পড়াতে শুরু করেছি, সেইসময় ঠিক ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ের একদিন, (দিনটা ঠিক মনে নেই) আমরা তিনজন বন্ধু আমার মাতুল আব্দুস সামাদের সঙ্গে গেলাম পাঁচ নম্বর পার্ল রোডের বাড়ীতে, যেখানে আইয়ুব ও গৌরী আইয়ুব থাকতেন। প্রথমেই অধ্যাপিকা গৌরী আইয়ুবের মুখোমুখি হলাম। তাঁর ঝকঝকে চেহারা, সুমিষ্ট মৃদুভাষণ মন কাড়ার মত। প্রথম আলাপেই 'দিদি' বলে ডাকার মত পরিবেশ ও হৃদ্যতা তৈরী হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হল তাঁর সঙ্গে। যতদূর সম্ভব

মনে আছে আমাদের ঐদিনের আলাপচারিতা মূখ্যতঃ দুটি বিষয়কেন্দ্রিক ছিল। এক শিক্ষা সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন। দুই, সাধারণভাবে সমাজ ও মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা এবং বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের অবরুদ্ধতা ও বেগম রোকেয়ার নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলনের নানা প্রসঙ্গ। তখন মাত্র কিছুদিন হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনা পেরিয়ে এক মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছি। চোখে তখন অনেক রঙিন স্বপ্ন, মাথায় অনেক পরিকল্পনা, নতুন ছাত্রসমাজ, নতুন যুব সমাজ গড়তে হবে। পঠন পাঠনে যে কোন নিয়মিত ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষক অপেক্ষা ঐ সময় কম নিয়মানুগ নই। তাই গৌরীদির আলোচনা খুব ভাল লাগছিল। নিয়মিত ক্লাস করা, ছাত্রছাত্রীদের প্রতিদিন লেখা ও পড়ার কাজ দেওয়া, সেগুলো তারা ঠিকমত করল কিনা দেখা-এসবই শিক্ষকদের নিয়মিত করা অবশ্য কর্তব্য। শিক্ষকদের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পড়ার কাজ করিয়ে নিতে হয়, তাদের সঙ্গে প্রতিদিনের যোগাযোগ রাখতে হয়। তবেই তারা শিক্ষককে আপনজন করে নিতে পারে, সহজ করে তাঁদের কাছে মনের কথা বলতে পারে-- গৌরীদি এইধরনের সব কথা বলেছিলেন। তাই পরে যখন বারবার গৌরীদির কাছে গেছি প্রায়ই দেখেছি তিনি ছাত্রীদের খাতা নিয়ে বসেছেন—কখনও তাদের বাড়ীতে লিখতে দেওয়ার খাতা, কখনও টিউটোরিয়াল ক্লাসের খাতা, কখনও বা পরীক্ষার খাতা। দেখেছি কত ছাত্রছাত্রী, তরুণ-তরুণী তাদের নানা সমস্যা নিয়ে এসেছে। আর গৌরীদি শান্তমনে সেগুলো শুনছেন, কাউকে পড়াচ্ছেন, কারও কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা থাকলে তিনি সমাধানের পরামর্শ দিচ্ছেন জ্যেষ্ঠা ভগিনীসুলভ, কখনও বা মাতৃসুলভ স্নেহের সঙ্গে। সহানুভূতির সঙ্গে। তখন তাঁকে পরম শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিত্ব বলে মনে হতো। মনে হতো এই মানুষটিকে ভালবাসা যায়, প্রাণ খুলে মনের কথা বলা যায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনায় মন ভরে ওঠে। তাঁর স্নেহ ও ভালবাসার প্রবল টানে অনেকেই তার বাড়ী ছুটে যেত বারে বারে।

প্রথম দিনের সাক্ষাতেই গৌরীদির সমাজ ভাবনার পরিচয় পেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় মেয়েদের প্রকৃত সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা, মর্যাদা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গ উঠেছিল। মহিলারা যে চিরদিনই সব দিক দিয়ে বৈষম্যের বলি একথা বারে বারে তাঁর কথার মধ্যে উঠে এসেছিল। সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা ও নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল। পিতৃ সূত্রে জ্ঞানের জগতে অন্বেষা তাঁর ছিল স্বভাবসিদ্ধ। মেয়েদের সামাজিক অধিষ্ঠানকে তিনি ইতিহাসের আলোকে বহু উদাহরণ দিয়ে শাস্ত্রকার মনুর উদ্ধৃতি দিয়ে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর যুক্তিবাদী কথাগুলি খুবই মনোগ্রাহী ছিল। যতদূর জানি তিনি 'তথাকথিত নারীবাদী' ছিলেন না। কিন্তু তিনি মনে করতেন মানবমুক্তি ও বুদ্ধির মুক্তির সঙ্গে নারীমুক্তি যুক্ত।

সাক্ষাতের সেই প্রথমদিনে গৌরীদির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর আবু সয়ীদ আইয়ুবের কাছে পৌঁছলাম। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। একজন সুদর্শন মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, কিন্তু অদম্য তাঁর মানসিক বল, গভীর তাঁর প্রজ্ঞা। তাঁর মূল বিষয় ছিল পদার্থ বিজ্ঞান, কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে তিনি দর্শনের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের আলোচনায় ধর্ম ও দর্শন প্রসঙ্গ এসেছিল। বলা বাহুল্য দু'একটি জিজ্ঞাসা রেখে আমরা শ্রোতা হিসাবে প্রায় চুপ থেকেছি, উনিই বক্তার ভূমিকায় খুব ধীরে ধীরে কথা বলে চলেছেন। সেদিন তাঁর কাছে গীতা উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনেছিলাম। আর শুনেছিলাম কোরাণের সূরা ফতেহার ব্যাখ্যা। মনে আছে তিনি বলেছিলেন এই সূরাটিই কোরাণে প্রবেশের সিংহদ্বার, সমগ্র কোরাণের নির্যাস। সেদিন আইয়ুব দম্পত্তির কাছ থেকে ফিরেছিলাম স্মৃতি সুধার ভরাপাত্র নিয়ে। আজও তা মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত আছে। সেদিন তাঁদের দু'জনকে দু'জনের

পরিপূরক বলে মনে হয়েছিল। দু'জনের কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গী, অনুভূতির গভীরতা, বিচার ও বিশ্লেষণ শক্তি স্বকীয়তায় ছিল অনন্য ও আকর্ষণীয়।

এরপর যখনই মন চেয়েছে বা সময় হয়েছে অথবা কোন বিষয় ও ঘটনা, রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে নাড়া দিয়েছে নতুবা আঘাত হেনেছে তখনই গৌরীদির কাছে তাঁর বাড়ীতে গেছি। তিনিও কোন ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বা আলোচনায় মাঝে মাঝে ডেকেছেন। সেগুলি ছিল মূলতঃ কোন যুব ছাত্রদের চেতনার আসর, গৌরীদিদের শান্তিনিকেতনের শিল্পী বন্ধুদের গানের আসর, ওপার বাংলার বেগম সুফিয়া কামালসহ বহু কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে সাহিত্য বাসর ইত্যাদি। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে ১৯৭০-এর দশকের 'নবজাগরণ সমিতির'র কথা। পুনার 'সত্যশোধক মণ্ডল' ও 'মুসলিম মহিলা মণ্ডল' সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ. বি শাহ, হামিদ দালুই প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হই। নারী আন্দোলনের তরুণ নেত্রী নাজমা শেখ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। হামিদ দালুই আমাদের বাড়ী এলেন। আমি যেন পুনায় মহিলা সম্মেলনে যোগ দিই। ঐ সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সর্বভারতীয় আন্দোলনের পরিমণ্ডলে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করি। ইতিমধ্যে কলকাতার র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হলে আমাদের একসভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক অম্লান দত্ত সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। গৌরীদি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন কিনা ঠিক মনে নেই। তবে সভার দিনের পূর্বে ও পরে সভার উদ্দেশ্য আদর্শ ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে তার সঙ্গে বার বার আলোচনা করেছিলাম। প্রথম দিনের সভাতেই 'নবজাগরণ সমিতি' নামে একটি সংস্থা খাড়া করা হয়েছিল—যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম মহিলাদের সামাজিক ন্যায় ও সমতার ব্যাপারে জাগরণের জন্য আন্দোলন। ধর্মের দোহাই দিয়ে বা ধর্মের অপব্যাখ্যা করে মুসলিম মহিলাদের অবজ্ঞার ও বঞ্চনার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তা থেকে তাদের মুক্তি চাই এবং সেজন্য প্রয়োজন তাদের যথাযথ শিক্ষাদান, অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি, বহুবিবাহ রোধ ইত্যাদি। ব্যাপারটি যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল আমাদের নামসহ এবং সবিনয়ে বলি আমার নিবন্ধ "সামাজিক বিচারে বৈষম্য আর কতদিন" প্রকাশ পেল তখন রক্ষণশীলরা ও সমাজবিরোধীরা সমবেতভাবে শুধু কুবাক্য বলেই ক্ষান্ত হননি, সমবেতভাবে আমাদের বাড়ী পর্যন্ত আক্রমণ করেছিল। যাহোক সে ঘটনা অনেক বিস্তারিত ও তিক্ত এবং এখানে আলোচ্যও নয়। কিন্তু গৌরীদিকে মনে পড়েই সেই ঘটনার অবতারণা। ঐ সময় তিনি আন্দোলনের একান্ত সমর্থক ছিলেন এবং ছিলেন পরম উৎসাহদাত্রী ও পরামর্শদাত্রী। ঐ আন্দোলন যে ধর্মবিরোধী নয় সে ব্যাপারে আবু সয়ীদ আইয়ুবও রোগশয্যা থেকে পরামর্শ দিতেন, ঐ সমস্ত ব্যাপারে কোরাণ হাদিশের মূল বক্তব্য তুলে ধরতেন উদ্ধৃতি দিয়ে। ইসলাম যে বিবেকধর্মী সে কথা প্রসঙ্গে তিনি কবি ইকবাল-এর 'সিক্স লেকচার্স'-এর বক্তব্য তুলে ধরেন। তাঁর কাছে বইটির কথা শুনে পরে সেটা পড়ে নিই।

মুসলিম মহিলাদের দুরবস্থা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতকে কিভাবে নাড়া দিয়েছিল সেকথা গৌরীদি প্রায়ই আলোচনা করতেন। তিনি বলতেন, যে মহিলা মুসলিম সমাজের নারীদের শিক্ষার জন্য এবং অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তির জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তিনি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হওয়া উচিত। বেগম রোকেয়ার কাল থেকে সময় অনেকটা এগিয়েছে, কিন্তু মুসলিম নারীসমাজের দৈন্য ও অনগ্রসরতা অনেক বেশীই রয়ে গেছে। সেইজন্য কেউ যদি সেই নারীসমাজের উন্নতিতে সচেষ্ট হয়, তাহলে তা একপেশে বা সংকীর্ণ মানসিকতার

পরিচায়ক হতে পারে না। গৌরীদি প্রায়ই বলতেন মহিলাদের উন্নতির জন্য তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। তাদের শিক্ষালাভ করা প্রয়োজন, স্বাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন। তিনি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অনেক মেয়েকেই এ ব্যাপারে সাহায্য করতেন এবং অনেক সময় অনেকটা নীরবেই। প্রয়োজনে তিনি দুঃস্থ ও অসহায়কে সাময়িকভাবে আশ্রয় দিয়েছেন।

গৌরীদি যে, অনাথ, দুঃস্থ ও অসহায় শিশুদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তার বড় নমুনা মৈত্রেয়ীদির সঙ্গে গড়ে তোলা 'খেলাঘর'। বাংলাদেশের যুদ্ধের পর অনাথ শিশুদের জন্য তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ওপার বাংলার অনেক নেতার সাক্ষাৎস্থল ছিল তাঁর বাড়ী। তাছাড়া অসুস্থ শরীরে তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি ঐ সমস্ত স্থান তখন নিরাপদ ছিল না। প্রয়োজনে এমন স্থানেও আমাদের যেতে হয়েছে যেখানে কয়েক ঘণ্টা পূর্বে আমরা ঘুরে এসেছি, কয়েক ঘণ্টা পরে সেখানে পাক সেনার আক্রমণ শুরু হয়েছে। গৌরীদি ওপারে নির্ভীকভাবে গেছেন।

রাজনৈতিক চেতনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী মানসিকতায় গৌরীদি ছিলেন উজ্জ্বল। ছাত্রীজীবনে সাম্যবাদী-আদর্শ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। পরে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শে বিবর্তন আসে, কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রত্যয় ছিল স্বচ্ছ ও দৃঢ়। ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে জয়প্রকাশ নারায়ণ যখন দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার ও গণতন্ত্রের মুখোশে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী নাগরিক (সিটিজেনস ফর ডেমোক্রাসী) আন্দোলন শুরু করেন তখন গৌরীদি নানাভাবে সেই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। ঐ সময় প্রফুল্ল সেনের সভাপতিত্বে পশ্চিমবাংলায় 'নবনির্মাণ সমিতি' গড়ে উঠেছিল, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী। সর্বাত্মক বিপ্লব-এর ডাকে তখন সারা ভারতবর্ষ উত্তাল। ঐ ডাকের মূল কথা রামধনুর সাতটা রঙের মত ভারতের মানুষের জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও আত্মিক জীবনের পূর্ণ স্বাধীনতা, উন্নতি ও মুক্তি চাই। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫ শে জুন তদানীন্তন ইন্দিরা সরকার 'সেন্সরশিপ' জারী করলেন এবং জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেন। তখন গণতন্ত্রপ্রেমী কোন মানুষই স্থির থাকতে পারেন নি। গৌরীদিও পারেননি। তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। 'জন সংঘর্ষ সমিতি' ও 'ছাত্র-যুব সংঘর্ষ বাহিনী'র অনেকেই তাঁর বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। নানা গোপন 'লিফলেট' ও সংবাদ নিয়ে তাঁর বাড়ীতে আমরা যেতাম। লেখনীর স্বাধীনতাকামী, বাক্‌স্বাধীনতাকামী গৌরীদির অনেক বিদগ্ধ বন্ধুর তাঁর বাড়ীতে আনাগোনা ছিল। গৌরদা (সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ) যেদিন স্বৈরাচারী জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে মাতার প্রতি পত্র লিখে কারারুদ্ধ হন সেদিন গৌরীদির বাড়ীতে উপস্থিত থেকে লক্ষ্য করেছি তাঁর মানসিক অস্থিরতা। আবার জরুরী ব্যবস্থার প্রতিবাদে গৌরদার মাথামুড়ানো নিয়ে হাল্কা রসিকতাও তিনি করেছেন। ঐ সময় গৌরীদি কারার অন্তরালের বন্ধুদের প্রায় নিয়মিত খোঁজ খবর রাখতেন।

যখন স্থির হয় ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে ভারতে সাধারণ নির্বাচন হবে তখন জরুরী অবস্থার বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল হয়। ঐ সময় গৌরীদি স্বকীয় পন্থায় নির্বাচনের ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। মানুষের সুস্থ মতপ্রকাশ ও প্রচারেব ব্যাপারে তিনি কলম ধরেছিলেন। যতদূর জানি বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত না হয়েও দৃঢ় ও স্বচ্ছ রাজনৈতিক মত তিনি পোষণ করতেন। বিবেক বিচারশক্তি ও আত্মবিশ্বাস এবং মানবমঙ্গলকামী মানসিকতাকে তিনি চালিকাশক্তি বলে মনে করতেন। তাঁর পরিমণ্ডলের তরুণ-তরুণীদের তিনি সেরকমটাই

বলতেন এবং নিজের আচরণেও প্রকাশ করতেন। তাঁর ছিল প্রতিবাদী চরিত্র। যে কোন ধরনের অন্যায় অবিচার ও বঞ্চনা তা রাজনৈতিক সামাজিক ও ব্যক্তিগত যাই হোক না কেন-তার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার-বাক্যে ও লেখনীতে। ২১শে জুন, ১৯৭৭-এ জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হওয়ায় তিনি খুশী হয়েছিলেন এবং নির্বাচন যাতে নতুন ও সুস্থ এক রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারে সেজন্য বাড়ীতে বসেও কম কাজ করেননি।

রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে গৌরীদি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নেও সোচ্চার ছিলেন। কেরালার শাহবানুর মামলায় ঐ সময় সারাদেশে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শাহবানুর স্বামী পুনরায় দারপরিগ্রহ করেছেন, ফলে শাহবানু আদালতের দ্বারস্থ হন। শাহবানুর কাজকে সারাদেশের প্রগতিশীল মানুষরা সমর্থন করেন। যখন ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল সুপ্রীম কোর্ট রায় দেন যে মুসলিম মহিলাসহ যে কোন মহিলার স্বামী পুনরায় বিবাহ করলে অথবা কাউকে 'মিসট্রেস' হিসাবে গ্রহণ করলে প্রাক্তন স্ত্রী খোরপোষ পাওয়ার যোগ্য—তখন তাঁরা এটিকে ন্যায়বিচার বলে খুশী হন। কিন্তু রক্ষণশীলগোষ্ঠী ঐ রায় মেনে নিতে পাবেননি। যাহোক শাহবানু মামলা যখন তুঙ্গে এবং বিবেকবান সকলে যখন তাঁর পক্ষে তখন আমরা মুসলিম মহিলাদের নিয়ে—যাঁদের বেশীরভাগই ছিলেন উলুবেড়িয়ার বাসিন্দা এবং কেউ কেউ আবার বোরখা পরিহিতা—কলকাতায় গভর্নরের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম শাহবানুর সমর্থনে। সেখানে বিপ্লবী লীলা রায় প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় মহিলা সংহতি'র সমাজবাদী নেতৃবর্গ-সাগরদি (শ্রীমতী সাগরিকা ঘোষ), গীতাদি (স্বর্গতা গীতা বসুমল্লিক), আগমনীদি (অধ্যাপিকা আগমনী লাহিড়ী) প্রমুখের সঙ্গে গৌরীদিকেও পেয়েছিলাম।

১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাজস্থানের অষ্টাদশী রূপ কানওয়ারকে যখন স্বামীর চিতায় দগ্ধ করে 'সতী' ঘোষণা করা হয়, তখনও আমরা প্রতিবাদী সভাতে গৌরীদিকে পেয়েছি। তিনি ঐ জঘন্য ও লোভী কাজের নিন্দায় মুখর হয়েছেন। চীনে তিয়েন মেন স্কোয়ারে যখন ছাত্র নিধন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তখনও গৌরীদি চুপ করে থাকেননি। এইভাবে প্রতিটি রাজনৈতিক সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদী চরিত্র হয়ে দাঁড়াতেন এবং সমাধানেরও ইঙ্গিত দিতেন।

সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সম্পর্কে তিনি সজাগ ছিলেন। সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং বলতেন যে তাঁদের নিজেদের পরিশ্রম করে স্বচেষ্টায় অধিকার ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করা প্রয়োজন। সেটাই সম্মানজনক এবং টিকে থাকার পথ। তাদের 'ডমিনেন্ট মাইনরিটি' হতে হবে, কি রাজনৈতিক জীবনে, কি সামাজিক জীবনে বা পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সংকীর্ণতাকে তিনি প্রচণ্ড অপছন্দ করতেন। এব্যাপারে তিনি এতই কঠিন ও কঠোর ছিলেন যে মনে আছে এক তথাকথিত শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, যাঁর কাজ ছিল কেবল পরনিন্দা করা তাঁকে গৌরীদি বলেছিলেন—'আমার বাড়ীতে আর কখনও আপনার মুখদর্শন না করতে পারলে খুশী হব।'

একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সংবেদনশীলা গৌরীদি গভীর শ্রদ্ধা মমতা ও ভালবাসা দিয়ে অসামান্য প্রতিভাধর আইয়ুবকে ঘিরে রেখেছিলেন। চরম অসুস্থতার জন্য আইয়ুব সম্পূর্ণ বিকশিত হতে পারেননি। কিন্তু গৌরীদি তাঁর কাছে ছিলেন অপরিহার্য। তাঁর সেবা যত্ন ছিল তুলনাহীন। আইয়ুব বলে যেতেন কোন সময়—গৌরীদি লিখতেন। তারপর নিয়মিত অনুলেখক হিসাবে স্বপন মজুমদারকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন গৌরীদি। আইয়ুবের সঙ্গে কথা বলার সময় মনে হয়েছে তাঁর প্রত্যেকটি কথাই যেন লিখে রাখার মত। বসে বসে

শুনতাম—তিনি বলতেন তাঁর পরিবারের আদি ইতিহাস, অল্পবয়স থেকে কিভাবে তিনি মাতৃস্নেহহারা, কিভাবে তাঁর বাংলা শেখায় আগ্রহ বাড়ে, কলকাতায় কিভাবে পড়তে এলেন, ছাত্রজীবন অধ্যাপনা জীবন কেমন ছিল ইত্যাদি। অসুস্থতার জন্যই সীমিত মানুষের কাছে তাঁর কক্ষের দ্বার, না দ্বার নয়, পর্দা উন্মোচিত হত। কেন জানি না সৌভাগ্যবশতঃ আমার প্রবেশাধিকার ছিল অবারিত। গৌরীদি ও আইয়ুবের স্নেহের বন্ধনেই তা সম্ভব হয়েছিল। যখন গল্প করতে করতে আইয়ুবের মাথায় ও কপালে হাত বুলিয়ে দিতাম তখন তিনি বলতেন—'তুমি কি কোন কাজ করো না, তোমার হাতটা কি নরম। তোমার নরম হাতের স্পর্শ আমার মায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। তখনকার দিনে মুসলিম বনেদী পরিবারে প্রকাশ্যে সন্তানকে আদর করার রেওয়াজ ছিল না। তুমি আমার মায়ের সেই স্নেহের স্পর্শের অভাব পূরণ করে দিলে।' সেই সময় আমার মনে মনে খুব গর্ব হতো। আবার আমার ছোটবেলায় মা হারানোর ব্যথাও অনুভব করতাম। আইয়ুবের এই ধরনের কথা শুনে গৌরীদি হাসতেন।

আইয়ুবের মুখে শোনা তাঁর বাংলা শেখার ঘটনাটি এখানে সংক্ষেপে না বলে পারছি না। তিনি বলেন—'ছাত্রাবস্থায় প্রথমে গীতাঞ্জলির উর্দু অনুবাদ পড়ি, ভাল লাগে। তারপর পড়ি ইংরাজী অনুবাদ, আরও ভাল লাগে। তখন মনে হয় অনুবাদই যদি এত গভীর ও সুন্দর তাহলে মূল কাব্য কত হৃদয়গ্রাহী। তাই মূল 'গীতাঞ্জলি' পড়ার জন্য বাংলা শিখতে শুরু করি। কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় বাঙালী ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশায় আমার আগ্রহ ছিল বেশী। ঐ মেলামেশা বাংলা বলা ও শেখার পক্ষে সহায়ক ছিল।' বাংলা ভাষার ও কাব্যের প্রতি তাঁর এই আগ্রহ আইয়ুবকে রবীন্দ্রভাবনার গভীরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তাঁর দার্শনিক মননকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল অনেকদূর। কবিগুরুর সৃষ্টির প্রতি অনুরাগে আপ্লুত হয়ে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন 'পান্থজনের সখা', অন্বেষণ করেছিলেন 'পথের শেষ কোথায়'। লিখেছিলেন 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের জগতে তাঁর মননশীল সৃষ্টিগুলি স্বকীয়তায় অনন্য। তাঁর স্বহস্তের উপহার বই পেয়ে নিজেকে ধন্য বোধ করেছি।

গৌরীদির কথা বলতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে বার বার আইয়ুব প্রসঙ্গ এসে পড়ে। মনে পড়ে যেদিন আইয়ুবের জীবনাবসান হল—তারিখটা ছিল ১৯৮২ খৃস্টাব্দের ২১ শে ডিসেম্বর—তার ঠিক ছয় দিন পূর্বে, অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর বিকেলের দিকে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম, শুনেছিলাম তাঁর শরীরটা বেশী খারাপ হয়েছে। সেই সময় পুনদেও (তাঁদের সেবক) তাঁকে বাথরুমে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর এনে খাবার টেবিলের পাশে চেয়ারে বসালেন বিকেলের খাবার খাওয়ার জন্য। নিজে হাতে খেতে পারেন না, গৌরীদি চামচে করে খাইয়ে দিতে লাগলেন পরম যত্নভরে। আইয়ুব আমাকে বললেন—'তুমি আমার উল্টোদিকে কোনাকুনি চেয়ারে বোসো, না হলে তোমার মুখ দেখতে পাব না, একটা চোখে তো স্পষ্ট দেখি না'। আমি গৌরীদির সযত্নে দেওয়া খাবার নিয়ে সেইভাবে খেতে বসলাম। সেদিন গৌরীদি বাংলাদেশের বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া শুঁটকি মাছের সুস্বাদু আচার আমায় খাইয়েছিলেন, যা জীবনে খাইনি। কথার মাঝে হঠাৎ আইয়ুব বললেন—"জানো আমার রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতের সেই বিখ্যাত মর্মস্পর্শী কথাগুলো মনে পড়ছে—'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর'।" একথা শুনে গৌরীদি একটু যেন কেমন হয়ে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বললেন—'আপনি ওরকম করে বলছেন কেন?' এর ঠিক ছয়দিন পরই খবর পেলাম আবুসয়ীদ আইয়ুব আমাদের ছেড়ে চিরদিনের মত চলে গেছেন। তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে দেখি গৌরীদি-কি শান্তমনে প্রকৃতির বিধানকে মেনে নিয়েছেন। যে রবীন্দ্রসংগীত আইয়ুবের একান্ত

প্রিয় ছিল সেই সঙ্গীত দিয়েই বন্ধুরা তাঁকে স্মরণ করেছেন। তাঁর স্মরণে সকল বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটেছে। গৌরীদির সেদিনের শান্ত স্নিগ্ধ মূর্তি স্মরণে রাখার মত।

যতদুব জানি বিশ্বাসে গৌরীদি ছিলেন মানবতাবাদী যুক্তিবাদী। ব্যক্তির প্রাতিস্বিক মূল্যে ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তাঁর জ্যাঠাইমা অমিয়াদেবীর মৃত্যুতে তিনি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছিলেন সেখানে তিনি বলেছিলেন—"পৃথিবীর সব মন্দির-মসজিদ-গির্জা থেকে নিজেকে আমি নির্বাসিত করেছি অনায়াসে। মাথা নত করবার মতো কোনও দেবতা তো পাই না কোনও দেবালয়ে। বরং আমার পথের ধারেই এসে দাঁড়িয়েছেন কিছু প্রণম্য মানুষ। তাঁদের পায়ে মাথা রেখে আমি শান্তি পাই।' ('চতুরঙ্গ'—বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৫), এই বিশ্বাসই তাঁর মধ্যে দৃঢ়তর ছিল। তাঁর বিশ্বাস ও আচরণে প্রভেদ ছিল না। তিনি প্রায়ই বলতেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানুষের সুবিধা হল এই যে তাঁরা ভালমন্দ সবকিছুর ভার ভগবান ঈশ্বর বা আল্লার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু যাঁরা তা নন তাঁদের আত্মশক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। এ বড় কঠিন কাজ। গৌরীদির পরিচালিকা শক্তি ছিল ন্যায়, সততা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সত্য ও সুন্দর। মানুষকে নিয়েই তাঁর কারবার। তাই মানবতাবোধই ছিল তাঁর অবলম্বন।

মুম্বাই থেকে পা অপারেশন করে গৌরীদি যখন সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন খুব ভাল লেগেছিল, তাঁর প্রতি প্রত্যাশা দ্বিগুণ হয়েছিল। কিন্তু নিয়তির কঠোর পরিহাস, খুব বেশীদিন তিনি সুস্থ রইলেন না, বোঝা গেল 'মেডিক্যাল সায়েন্সের' সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যাহোক শেষ বিদায় লগ্নের কিছুদিন পূর্বে তিনি যখন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তখন তাঁকে দেখতে গেছি। খুশী হয়েছেন। কিন্তু স্নেহভরে বলেছেন—'তুমি অতদূর থেকে আমায় দেখতে আসো, আমি ভেবে কষ্ট পাই'। ভাবি কতটা মমত্ববোধ থাকলে এরকম অনুভূতি হয়। সেই একই স্নেহ মমতার বিপরীত প্রকাশ দেখেছিলাম আবু সয়ীদ আইয়ুবের মধ্যে। একবার তাঁকে বলেছিলাম—'আপনাদের কথা প্রায়ই মনে হয়, তবে নানা ঝামেলার জন্য আসতে পারি না।' তখন তিনি বলেছিলেন—'ভাববে কম আসবে বেশী তাহলে খুশী হব'। দু'জনের স্নেহই আমার কাছে অমূল্য সম্পদ।

গৌরীদি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এখন বেশী করে তাঁকে মনে পড়ছে। সামাজিক ভাঙন, রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার, মূল্যবোধের অবক্ষয় যত দিন দিন বাড়ছে ততই গৌরীদির মত যুক্তিবাদী সহৃদয় ও দৃঢ়চেতা মানুষের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। নতুনের প্রত্যাশা কতটাই বা করতে পারি। মনে হচ্ছে এখন 'শেষের সেদিন' বোধহয় এগিয়ে আসছে, দিন গোনার পালা শুরু হয়েছে, শুধু স্মৃতিভারে পড়ে আছি। গৌরীদির 'ভারমুক্ত' সত্তার প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

[জাহানারা বেগম-এর পেশা অধ্যাপনা, নেশা সমাজসেবা]

গৌরীদি

স্বপন মজুমদার

"স্নেহ-দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ-বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এপর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে।...যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইযাছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।" বিদ্যাসাগরের এই উদ্ধৃতি গৌরীদি বিষয়ে আমার মনের কথা, এর থেকে বেশি বলেও হয়ত গভীর ও সত্যতর কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

গৌরীদির সঙ্গে যখন আমার পরিচয় তখনও আমি কুড়িতে পা দিইনি। আইয়ুবের সঙ্গে কাজের সূত্রে সপ্তাহে তিন সন্ধ্যায় তাঁদের ৫ পার্ল রোডের বাড়িতে যাই। তাঁর অভিজাত্য ও শ্রুতকীর্তি পাণ্ডিত্য আইয়ুবকে সম্ভ্রমযোগ্য দূরত্বেই সম্ভবত রেখে দিত, যদি-না গৌরীদির মধ্যবর্তিতা ঘটত। প্রথম-প্রথম গৌরীদি বিশেষ আইয়ুবের বসার ঘরে আসতেন না, যখন আমি থাকতাম। বিকেলের দিকে পূষণকে নিয়ে অন্য ঘরে ব্যস্ত থাকতেন গৌরীদি। এ-ঘর থেকে বোঝা যেত না, ও-ঘরে দু'টি মানুষ—সাত-আট বছরের এক বালক আর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের এক যুবতী আছেন। না, যুবতী শব্দটা বয়সের হিসাবে বেঠিক না-হলেও, গৌরীদির স্বভাবের সঙ্গে মিলল না। তাঁর অনাবিল অশর্ত স্নেহ তাঁকে যেন প্রথম থেকেই মাতৃময়ী রূপ দিয়েছিল। আমাদের কাজের মাঝে, পৌঁছানোর অনতিপরেই, পরিচারকের হাতে এসে উপস্থিত হত দু'টি কাবাব ও সফেন এক কাপ কফি। কী উপায়ে তিনি জেনেছিলেন, আমিষে আমার অভিরুচি—আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু অন্য অভ্যাগতদের জন্য যখন আসত মিষ্টান্ন—প্রধানত সন্দেশ, কারণ আইয়ুব পছন্দ করতেন সন্দেশ, তখনও আমার জন্য আসত কাবাব। গৌরীদি, বত্রিশ বছরে কোনওদিন যে খাদ্যে আমার রুচি নেই, এমন আহারের অনুরোধে বিব্রত করেননি আমাকে। যা আমার রসনার তৃপ্তি, তেমন খাদ্যই পরিবেশন করেছেন। এই খাদ্যকাহিনীর উল্লেখ করছি তার কারণ এই নয় যে, আহার ও পরিবেশনই আমার ও তাঁর সম্পর্কের সেতু ছিল। বলছি এই জন্য যে নেপথ্যে থেকেও অন্যের রুচিকে জানার ও মানার মন ছিল তাঁর।

স্বভাবের এই সুকুমার কোমল দিকটি যেমন সত্যি ছিল তাঁর চরিত্রে, তেমনই সত্যি ছিল তাঁর বিশ্বাসের তেজ, তাঁর আত্মপ্রত্যয়। গৌরীদির কাছ থেকে প্রসঙ্গক্রমে যতটুকু শুনেছি, আমার মনে হয়েছে, তাঁর পিতার প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তিনি। একদিন পুরনো বইয়ের দোকানে হঠাৎ পেয়ে গিয়েছিলাম বিদেশ থেকে প্রকাশিত ধীরেন্দ্রমোহন দত্তের গান্ধীর ওপর বইটি। গৌরীদিকে বলায় তিনি চেয়ে নিয়েছিলেন বইটি আমার কাছ থেকে। এই একটি—একটি মাত্র—উদাহরণ আমার অভিজ্ঞতায়, যখন কিছু নিজে থেকে চেয়েছেন গৌরীদি। কিন্তু আইয়ুবের সঙ্গে বিবাহে পিতার অনুমত হতে পারেননি তিনি। তাঁর পিতৃবন্ধু নির্মলকুমার বসু তাঁকে শুধু সমর্থনই করেননি, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে মেনে নিয়েছিলেন বন্ধুবিচ্ছেদ। নির্মলবাবু বলতেন, আমাদের দেশ যথার্থ শিক্ষিত হলে গৌরীর কথা ইস্কুলের পাঠ্যবইতে সংকলিত হত।

মেশার ব্যাপারে আইয়ুব যেমন ছিলেন অতিবিচাবী, গৌরীদি তেমন ছিলেন না। কোনও বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, আইয়ুব উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন তীক্ষ্ম বিচারে। হঠাৎ কারও আগমন ঘটল, আইয়ুব সম্পূর্ণ স্তিমিত হয়ে যেতেন, যদি অভ্যাগতজনকে তিনি সে আলোচনাব অংশী না মনে করতেন। গৌরীদির কোনও কোনও প্রিয়জন বিষয়েও আইয়ুবের যে তেমন মনে হত না তা নয়। সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে গৌরীদিকে দেখেছি কী মাধুর্যে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে যাতে তাঁরা বেদনা বোধ না করেন। কিন্তু যদি আদর্শগত কোনও প্রশ্নে বা কারণে কোনও ব্যক্তিকে সততায় ঊন মনে হত তাঁর, গৌরীদির প্রতিরোধ হয়ে উঠত পর্বত প্রমাণ। আইয়ুবের এক মাননীয় অনুরাগীকে প্রায় বর্জন কবে ছিলেন গৌরীদি। আবার এও দেখেছি, মত ও পথে সম্পূর্ণ ভিন্ন অনেককে তিনি ঝুঁকি নিয়েও সাহায্য করেছেন. কারণ তাঁর মনে হয়েছে নিজেদের বিশ্বাসে তাঁরা মনিষ্ঠ।

কর্তব্য এক মূল্যবোধ হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনে। আর্থ্রাইটিসের প্রথম আক্রমণের পরেও কলেজে তাঁর অর্জিত ছুটি তো নয়ই, আকস্মিক ছুটিও ফুরত না। সহকর্মীদের অনুরোধ সত্ত্বেও, নির্দিষ্ট ক্লাস যদি থাকত তিনতলায়, যন্ত্রণাক্লিষ্ট পা নিয়েও তিনি সেখানেই পৌঁছবেন। অধ্যক্ষার কাছে নিবেদন পর্যন্ত করতে দেবেন না সতীর্থদের। তাঁর জন্য কোনও ভাবেই যেন বিব্রত হতে না হয় অন্যদের, এই চিন্তাই তাঁকে বিব্রত রাখত নিয়ত। চিকিৎসক পছন্দ না করলেও তিনি কর্টিজন খাবেন তার পবিণতির কথা জেনেও, না-হলে স্বামী-পুত্র বিপন্ন হবেন, সংসার চলবে কী ভাবে।

সংসারও গৌরীদি করেছেন ভালবেসে, সুন্দর কবে। সেখানে বাহুল্যের লেশমাত্র ছিল না, ছিল না প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনও আসবাব বা সজ্জাসামগ্রী। কিন্তু দীর্ঘদিন একটি আবাসের অর্ধাংশে দু'টিমাত্র ঘরে, একজন চিররুগ্ন গৃহস্বামী নিয়েও, এক আশ্চর্য সৌন্দর্যের পরিমণ্ডল ছিল তাঁব সৃষ্টি। চিন্তার মানবিক মাত্রা আর বিদগ্ধ সংলাপ সেই সৌন্দর্যকে পৌরুষ দিয়েছিল। সেই তেজ ছিল বলেই ৬৮-তে যখন 'কোয়েস্টে'র সঙ্গে সি. আই. এ-র ক্ষীণতম সংযোগের গুঞ্জন উঠেছিল, গৌরীদির আশ্বাস ছাড়া আইয়ুবের পক্ষেও পদত্যাগ করা হয়ত কঠিন হত। আইয়ুবের ষষ্ঠিবর্ষপূর্তি এই পরিবার রিক্ত করে শূন্য ঘরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছিল। পবিচারকসংখ্যা ন্যূনতম, ওষুধ অপরিহার্য, ব্যয় সংক্ষেপের সুযোগ নেই প্রায় এই মিতাচারী পরিবারে, তাও সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হয়নি আইয়ুব পরিবারের। সাময়িক উপার্জনহীনতায় বিষণ্ণ হয়ত হয়েছেন আইয়ুব, কিন্তু তখনই সচিবের মতো স্বামীকে তাঁর লেখা আর চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছেন গৌরীদি। আইয়ুবেব লেখার জীবনের উজ্জ্বলতম অধ্যায়টি উদ্ধার করেছিলেন তিনি।

আবার এই গৌরীদিই কোন্ বন্ধু ভালবাসেন কোন্ আচার বা মোরাব্বা তারও হিসাব রাখেন। অনুবাগীজনের সংখ্যা, শত্রুর মুখে দিয়ে ছাই, কম নয় ; তাদের রুচিও ততোধিক বিচিত্র। কেউ চান মিষ্টি আচার, কেউ টক, কেউ-বা ঝাল। ফলে আম, কুল, জলপাই, লঙ্কা, এমনকী রসুনের নানা স্বদের আচারের সংসার ভরে ওঠে অপ্রশস্ত বারান্দায় আর জানালার গরাদের ফাঁকে-ফাঁকে। এরই সঙ্গে চলে কোনও প্রিয়জনের ছেলের বা মেয়ের জন্য কাঁথা বা ন্যাপকিন বা নিকারবোকার তৈরি। অবসর নেওয়ার পরেও পৌত্রী অহনার বা তার বন্ধুদের মনোলোভা কোনও উপহার তৈরিতেও যেন ক্লান্তি নেই গৌরীদির।

কী বিস্তাব তাঁর অনুরাগীজনের! পিতৃবন্ধু নির্মলকুমার বসু ও রাসবিহারী দাস। আইয়ুবের সূত্রে সুধীন্দ্রনাথ. মুজতবা আলী, হুমায়ুন কবীর, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, অম্লান দত্ত, অশীন

দাশগুপ্ত, দয়াকৃষ্ণ। আর তাঁর নিজের? মৈত্রেয়ী দেবী, বীণাদি থেকে আরতিদি, কিশাদি, পারুদি গৌরদা ; শান্তিনিকেতনের আর পাটনার, যোধপুর পার্ক-সাউথ পয়েন্ট আর শ্রীশিক্ষায়তনের বন্ধুবর্গ নিয়ে এক বিশাল পরিবার তখন ৫ পার্ল রোড ঘিরে। দুই ঈদে, বাংলা আর ইংরাজি নববর্ষে, ক্রিসমাসে আর বিজয়ায় মুক্ত সম্প্রদায়ের মানুষের নিত্য আনাগোনা ওই অনতিপ্রসর আবাসে যার গৃহিণী সচিব সখা জননী গৌরীদি।

যিনি রাঁধেন তিনি কিন্তু চুলও বাঁধেন। কলেজে পড়ানোর সঙ্গে আছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্রত ; ফিল্ম সেনসর বোর্ডেব সদসাপদ যেমন আছে, তেমনই আছে 'খেলাঘর' পরিচালনা। আর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাদেশে রূপান্তরের বছরটি (১৯৭১) তো হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক এক মিলনসূত্র, ৫ পার্ল রোডে। একদিকে আইয়ুব লেখেন শামসুর রাহমানেব 'বন্দীশিবির থেকে'-র ভূমিকা, চলতে থাকে পাণ্ডুলিপি থেকে প্রেস কপি থেকে প্রুফ দেখা। শরণাগতদের পুনর্বাসন, মহিলাদের নানা ধরনের সমস্যা আর নিরাপত্তা, এমনকী বিয়ের আয়োজনও করতে হয় গৌরীদিকে।

এরই মধ্যে ভেতরের তাগিদে মাঝে-মাঝে লিখতে ইচ্ছে করে কোনও গল্প। সে-সময় হয়ে ওঠে না বিশেষ। কিন্তু রোজ যে-সব চিঠি না লিখলেই চলে না, সেও যেন গল্পের মতো কথা বলে, শোনা যায় গলার ওঠা-নামা, নিঃশ্বাসের শব্দ, দেখা যায় ভ্রূ আর ঠোঁটের বক্রতা বা স্মিততা। গৌরীদির চিঠি যদি সংকলিত হয় কখনও, আমাব বিশ্বাস, 'ছিন্নপত্রে'র দোসর হবে। কৃষ্ণ কৃপালনি দিয়ে গেছেন প্রিয়ংবদা দেবীর ডায়েরির প্রতিলিপি, লিখতে হবে তাঁকে নিয়ে। প্রিয়জনের নির্বন্ধে আইয়ুবের সঙ্গে তাঁর আলাপের ইতিকথা লেখারও ইচ্ছে হয় তাঁর। আবার কখনও মনে হয়, এত কাছে থেকেও কেন এত দুস্তর দূরত্ব সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, খুঁজে দেখা দরকার তাব শিকড়। তাই বলে কি বন্ধ থাকতে পারে ছোট্ট অহনাকে নিপ্পনি গল্প বলা? কিন্তু ডব্লু. বি. সি. এস দেবে যে ছেলেরা তাদের সাহায্য করার যে কেউ নেই। সুতরাং অবসর জীবনের অপরাহ্ণগুলো নিয়োজিত হোক তাদের জন্য। সন্ধ্যাগুলো আকস্মিক আগন্তুকদের জন্য অবারিত। সুতরাং সব কৃচ্ছ্রতাই চলুক নিজের ওপর দিয়ে। না-হয় নাই-বা হল নিজের লেখা।

চারপাশে যেমন নারীবাদীদের দেখি, তাই যদি নারীবাদের পরাকাষ্ঠা হয়, গৌরীদি নারীবাদী ছিলেন না। পুরুষকে তিনি আশ্রয়মাত্র ভাবেননি, আবার কেবল প্রতিযোগীও ভাবতে পারেননি। নারীত্ব হনন করে পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার কোনও বাসনাও তাঁর ছিল না। কিন্তু কর্মে আর চিন্তার সহযোগে নারী-পুরুষের যে পারস্পরিক আশ্বস্ততা যথার্থ নাবীবাদের লক্ষ্য, গৌরীদির জীবন তার বিরল উদাহরণ। সে-মুখের শ্রী তাঁর এতই স্বকীয়, এতই সম্পূর্ণ আর স্বয়ম্ভর যে কোনও আরোপিত মুখোশ তাঁকে পরে থাকতে হয়নি। সেই সততার সৌজন্যে ও সামর্থ্যে তিনি আমার প্রণম্য।

সৌজন্যে : চতুরঙ্গ বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৩ কার্ত্তিক, পৌষ ১৪০৬

[শ্রী স্বপন মজুমদার-এর পেশা অধ্যাপনা, নেশা সাহিত্যসেবা]

কিছু স্মৃতি কিছু কথা

মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

এম. এ পরীক্ষা দেবার পর আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে 'সখীসংবাদ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহী ছিলাম। এতে লেখক থাকলেও মূলতঃ আমরা লেখিকাদের উপরেই জোর দিতাম। প্রচলিত ধারার নামীদের বদলে নিভৃতচারী লেখিকাদের সন্ধানে আমরা পেয়ে গেছিলাম জ্যোতির্ময়ী দেবী, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসী দাশগুপ্ত, মালিনী ভট্টাচার্য সর্বোপরি গৌরী আইয়ুবকে। সম্ভবতঃ ১৯৬৬ সালের মার্চ-এপ্রিলের কোন একটা সময়ে টেলিফোন করতেই নির্দিষ্ট একটি বিকেলে তিনি পার্ক সার্কাসে তাঁর বাড়িতে যেতে বললেন। সেই বাড়ির দোতলার একদিকে থাকতেন তৎকালীন নামী সি. পি. আই নেতা এ. এম. ও গণি— উল্টোদিকের ফ্ল্যাটে গণির অনুজ আবু সয়ীদ আইয়ুব খ্যাতনামা পণ্ডিত, লেখক এবং সম্পাদক। তাঁর স্ত্রী গৌবী আইয়ুব বিখ্যাত দার্শনিক ধীরেন্দ্র মোহন দত্তের কন্যা এবং নিজের লেখিকা ও অধ্যাপিকা পরিচয়েই খ্যাত। সে বাড়ির তিনতলায় তখন থাকতেন সৈয়দ মুজতবা আলী। স্বাভাবিকভাবেই ৫ নং পার্ল রোডের বিখ্যাত সেই বাড়িটিতে খুব সঙ্কুচিতভাবে ঢুকেছিলাম নিতান্ত আনাড়ী আমরা তিনটি তরুণী। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার বাঁদিকে পিতলের ফলকে জ্বলজ্বলে তিনটি নাম-আবু সয়ীদ আইয়ুব, গৌরী আইয়ুব, পূষণ আইয়ুব। দরজা ভেজানোই ছিল, মৃদু ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে লোক এসে নাম জেনে চলে গেল—সমস্ত ব্যাপারটা এবং পরিবেশ ভারী গম্ভীর বলে মনে হচ্ছিল আমাদের। ঘরে যেতেই পরম সমাদরে গৌরীদি আমাদেব বসালেন। লাবণ্য আর মেধার যুগ্ম সম্মিলন তাঁর চেহারায় একটা অন্যরকম ব্যক্তিত্ব এনেছিল-তিনি একই সঙ্গে খুব দূরের আবার পরক্ষণেই কাছের মানুষ হয়ে যেতেন। আমরা তাঁর কথা শুনে এবং তাঁকে দেখে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ। এই পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা—তার বিষয়বস্তু সবকিছুই মন দিয়ে শুনে তিনি যেন সখীসংবাদের আর একজন সখী হয়ে গেলেন আমাদের—যাবতীয় সংকোচ আর ভয় কোথায় চলে গেল। সময়াভাবে মাত্র দুটি গল্প একটি পুস্তক সমালোচনা ছাড়া কিছু দিতে পারেন নি—তবুও তিনি আমাদেরই একজন হয়ে গেছিলেন।

১৯৬৬ সালেরই প্রথমার্ধে সখীসংবাদের লেখা চাইতে সেই যে ৫ নং পার্ল রোডে ঢুকে পড়লাম—কয়েকবছর পর সে পত্রিকার আয়ু ফুরিয়ে গেলেও আমার যাতায়াত চললো সুদীর্ঘ ৩২ বছর ধরে। আমার এক দিদি গায়ত্রী দত্ত ছিলেন গৌরীদির সহকর্মী ও বন্ধু, এই সুবাদেই ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিলো তাঁর সঙ্গে। সত্যি কথা বলতে কি—গৌরীদির কাজের জগৎ ছিল বিরাট, সাহিত্য জগতের রথী মহারথীরা, বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের কাছে আসতেন আর আমি এসব কিছু থেকে বহুদূরে অকাজের কারবারী। তাই তাঁর কাজের জগতের বা মননের জগতের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমি জানিনা—আমি শুধু ভরদুপুরে বটগাছের ছায়ায় বসতে যেতাম। ও বাড়ির সিঁড়িটা দিয়ে উঠলেই মনে হত নিরাপদ একটা জগতে চলে এসেছি—সেই স্মৃতিচারণাই করতে পারি।

ঐ বাড়িতে সাতসকালে, ভরদুপুরে, বিকেল, সন্ধে, রাতে কখন যে যাইনি মনে পড়েনা—প্রায় সর্বদাই দেখেছি আমারই মত দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ দর্শনার্থী ঘরে উপস্থিত—গৌরীদি মৃদু হেসে কথা বলছেন। মৃদু হাসি ছাড়া তাঁকে কমই দেখেছি—জোরে হাসি বা কথা শুধু নয় যে কোন চিৎকৃত ব্যাপারই তাঁর অপছন্দ ছিল। কঠিন হতেও দেখেছি তাঁকে—যে কোন অনৈতিক

কাজের বিরুদ্ধে, কুৎসাকারীর বিরুদ্ধে তাঁর অনমনীয়তা ছিল পাথরের মত শক্ত। এরজন্য দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গেও পাকাপাকিভাবে সম্পর্ক ছেদ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। সেই সময়ে তাঁর নিয়মিত বন্ধুদের মধ্যে দেখেছি আরতিদি, মৃন্ময়ীদি, কিশাদি, গৌরদা, শীলাবৌদি, মৈত্রেয়ীদি আর নারগিসকে। বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং বিদগ্ধজনদের আসা যাওয়াও দেখেছি। গৌরীদির ঘরের একপাশে ছিল শোবার তক্তাপোষ, অন্যদিকে খাবার টেবিল, আর একটা পর্দাঘেরা কোণে কাপড় ছাড়ার জায়গা, বাকি অংশের দেওয়ালে বইপত্রের তাক। পাশের ঘরে থাকতেন আইয়ুব, তাঁর ঘরে যেতে গেলে গলি দিয়ে সোজা গিয়ে দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ঢুকতে হতো—প্রায় সর্বদাই তিনি ব্যাধির প্রকোপে শয্যাশায়ী থাকতেন। আলাপের প্রথম কয়েকবছর তাঁকে কখনো বিকেল সন্ধ্যেয় নরম আলোয় ভবা ঘরে একটি পিঠ উঁচু সোফায় বসে কথা বলতে দেখেছি অতিথিদের সঙ্গে। সেসময় অতিথিরা অবশ্য নির্দিষ্ট সময়েই ও বাড়ি যাতায়াত করতেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চলাফেরা করতে কমবেশি অপারগ থাকার দরুণ তাঁদের বাড়ি ছিল ভৃত্যনির্ভর। আইয়ুব, গৌরীদি, পূষণ ছাড়া আরো প্রায় তিনজন সদস্য ছিল তাঁদেব পরিবারে—নূরজাহান, পুনদেও, মনা। অতগুলি লোক নিয়ে ঐ স্বল্প পরিসরেই নিপুণ দক্ষতায় গৌরীদি মসৃণভাবে সংসার পরিচালনা করতেন। বিছানার চাদর সর্বদাই নিভাঁজ পরিষ্কার, ঘরের তকতকে মেঝেতে একটা আলপিন পড়লে তুলে নেওয়া যায়, দেওয়ালের গা ঘেঁষে ছাদ অবধি উঠে যাওয়া বইএর তাকে কোথাও এক বিন্দু ধুলো জমতে দেখিনি কখনো। ঘরের সমস্যা তাঁর মিটেছিল ১৯৮০ সাল নাগাদ। ঐ বছরেই পূষণ-চম্পার বিয়েতে তিনদিন ধরে গৌরীদি ভিন্ন প্রকৃতির অতিথিদের আপ্যায়ন করলেন। বিয়েবাড়ির উৎসবে সবাইকে সমান মনোযোগ দিয়ে আপ্যায়ন করতে পারবেন না সেজন্য ছিল এই ব্যবস্থা, গৌরীদির নিপুণ গৃহিনীপনায় ছেলে-মেয়ের গায়ে হলুদ, বিয়ে, বৌভাত সব উৎসব সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। সেই বিয়েতে আমি এবং আমার স্বামী আলাদা কার্ড পেয়েছিলাম আত্মীয়দের দিন আর লেখকদের দিন আলাদা হবার দরুণ। পরের বছরই বোধহয় পূষণ-চম্পা বোম্বেতে চাকরি পেয়ে চলে গেল, আইয়ুব সে বছরের ডিসেম্বরেই গৌরীদির সেবা যত্ন আর মায়ার বন্ধন কাটিয়ে চিরদিনের জন্য চলে গেছিলেন। খাবারঘর, রান্নাঘর, অতিথিঘর আর দুটি শোবার ঘর নিয়ে গৌরীদি তখন পরিচারক বাহিনীর মধ্যে একা। হেসে বলতেন 'ব্যাপারটা Monkey's paw গল্পের মত হল আর কি।' আজ কত রকমের স্মৃতি যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে—আলাদা করা মুশকিল।

হঠাৎ করে কিছুটা ফাঁকা সময় পেলেই ওঁদের বাড়ি চলে যেতাম দরকারে অদরকারে। গৌরীদির সঙ্গে কথা বলতে বলতে হয়ত আইয়ুবের খাবার সময় হয়ে গেছে—পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি হুইল চেয়ারে আইয়ুবকে বসিয়ে ওঘর থেকে পুনদেও ঠেলে এনে এঘরে তাঁকে খাবার টেবিলে বসিয়ে দিল। ভাত, ডাল, সবজি, মাছ ইত্যাদি সিদ্ধ করা একটা মস্ত বড় একটা ছাঁকনিতে ছেঁকে পাতলা করে নিয়ে চামচে করে গৌরীদি পরম যত্নে খাইয়ে দিচ্ছেন খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক আইয়ুবকে—ঠিক আমার ছেলেমেয়েকে যেভাবে খাওয়াতাম! তবে তফাৎ ছিল, আমি তাদের খাওয়াবার জন্য এত যত্ন এত সময় দিতাম না। মাঝেমধ্যেই আইয়ুব মাথা নাড়ছেন, গৌরীদি প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলছেন, "আচ্ছা মীনাক্ষী, এবারে ভূপালে 'ভারতভবন' উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে গায়কোয়াড়ের সেই গায়ক কি যেন বলেছিলেন?" বলতে হোতো উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে একটি তিনতারা হোটেলে শক্তি কেমন আধময়লা পাজামা পাঞ্জাবী পরে ঘুরতো, আর আমি সর্বদাই সেজেগুজে। পাশের ঘরের অশীতিপর গায়ক ভীমরাও শাস্ত্রী অনুষ্ঠানের এক পর্বে আমাকে পাশের চেয়ার থেকে হঠাৎ চোস্ত হিন্দী বুলিতে জিজ্ঞাসা করলেন—'উও বুঢ্‌ঢা আপকা

নোকর হ্যায়?"—

আইয়ুব মৃদু হেসে বললেন, "তুমি ভুল করছো 'আপকি' বলেছিলেন তা তুমি কি বললে?—" "আমি তো প্রথমে ওঁর কথাই বুঝতে পারিনি বার দুতিন শোনার পর ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললাম, 'নেহি নেহি উও মেরি পতি হ্যায়'।" আবার আইয়ুবের প্রশ্ন, "শক্তি শুনে কি বললেন?" "বললে না কেন বহুত পুরানা নোকর হ্যায়।" তারপর সম্মিলিত হাসি, এই ফাঁকে আইয়ুবের চার পাঁচ চামচ বেশি ভাত খাওয়া হয়ে গেছে, খুশী গৌরীদি। গৌরীদির কাছে নানা প্রতিষ্ঠান থেকে লেখালিখির আর্জি, খেলাঘরের প্রয়োজনে কতরকম লোক আসতেন। অনেক বন্ধু, ভক্ত এবং অনুরাগীরা আইয়ুবের সঙ্গে দেখা কবতে আসতেন। কিন্তু আইয়ুব ছিলেন 'চুজি'; তাছাড়া বিনা এ্যাপয়েন্টমেন্টে উনি কারো সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন না। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি এলেও মাঝে মাঝে তিনি সাক্ষাতে অরাজী ছিলেন। গৌরীদি পড়তেন বিপাকে। আইয়ুবের গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি যেমন আরতিদি বা রুচিরা, কোনসময় আমাকেও বলতেন ওঘরে গিয়ে একটু গল্প করতে। বাইরে অপেক্ষমান অন্য অতিথিদের তিনি এঘবে আপ্যায়ন করতেন। সেই সময় কৌতূহলী আইয়ুবকে আমার ভালোলাগা উপন্যাসগুলি পড়তে দিয়েছি—মহাস্থবির জাতক, সতীনাথ ভাদুড়ীর গ্রন্থাবলী, সমরেশ বসুর টানাপোড়েন, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের নাইরোবি থেকে রবি। সন্ধ্যেবেলায় গৌরীদি তখন নিয়ম করে খানিকক্ষণ বই পড়ে শোনাতেন তাঁকে।

আমার মেয়ের বয়স যখন আড়াই তিন বছর—১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি আইয়ুব তখন শয্যাশায়ী, মেয়েকে নিয়ে মাঝে মাঝে ওঁর কাছে গিয়ে বসতাম। আইয়ুব রাগিণীর নামে ওর নাম 'সিন্ধুরা' রাখতে বলেছিলেন—দুঃখের বিষয় সেটা হয়ে ওঠে নি। আইয়ুবের বিছানায় থাকত একটা টর্চ আর লোকজনকে ডাকার জন্য একটা ছোট পিতলের ঘন্টা। তিতি সেগুলি নিয়ে খেলা করতো, হঠাৎ একদিন ঘোষণা করলো "এগুলো আমি নিয়ে যাবো"—আইয়ুব বললেন, "কি করবে?" ও বলল—'বাবাকে দেবো, তাহলে বাবার আর দুঃখ থাকবে না।' অশান্ত বাবাকে দেখে ও বোধহয় ভাবতো বাবার মনে দুঃখ আছে তার প্রিয় খেলনাদুটি পেলে বাবা এগুলো নিয়েই খুশী থাকবে—আইয়ুব বললেন—'দ্যাখো তোমার বাবার তো দুঃখ থাকবে না, কিন্তু ওগুলো না থাকলে আমার তো খুব দুঃখ হবে আমি তো শুয়ে ঘন্টা বাজিয়ে লোক ডাকি।" কন্যা বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি সবসময় শুয়ে থাক কেন?"

আমার ছেলে অবশ্য ছোটবেলায় পূষণ দাদারই বেশি ভক্ত ছিল। আইয়ুব তখন আরো অসুস্থ।

গায়ত্রীদিই ওঁদের কাছে আমাদের প্রাকবিবাহ পর্বের রহস্যটি ফাঁস করে দিয়েছিলেন। ফলতঃ শক্তিকে নিয়ে যেতে হয়েছিল, ও গান জানে শুনে ওঁদের আগ্রহে গান শোনাতে হয়েছিল। মনে আছে ও গেয়েছিল "জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি।" আর ওর অনুরোধে সেদিন আরতিদি গেয়েছিলেন "দূরে কোথায়।" আইয়ুব, গৌরীদি দুজনেই ছিলেন রোমান্টিক; রবীন্দ্রসংগীতেরও ভক্ত ছিলেন প্রচণ্ড. সেরা গায়িকার তাঁদের বাড়ি গিয়ে গান শুনিয়ে আসতেন।

আমাদের বিয়ে নিয়ে পরিবারিক অশান্তি জোরদার হওয়ায়, দিনটা পিছিয়ে দেব ভেবেছিলাম প্রথমে কিন্তু ওঁদের পরামর্শেই দিনটা আর পিছিয়ে দিইনি আমরা। বিয়ের পর রীতিমত নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন গৌরীদি। এমনিতেই ওঁদের বাড়ি থেকে শুধুমুখে কোন অতিথিকে ফেরৎ যেতে দেখিনি।

শারীরিক অসুবিধার জন্য নিজে হাতে রান্না করতে না পারলেও কতরকম রান্না যে তিনি জানতেন। সুদক্ষ পরিচালনক্ষমতা থাকার দরুণ নির্দেশ দিয়েই রাঁধুনিদের তিনি রীতিমত কুশলী

কারিগর করে তুলতেন। সাধারণতঃ শামী কাবাব, মাছের কোর্মা এবং মাংসের পোলাও এগুলোই ছিল অধিকাংশ নিমন্ত্রণের পদ, 'বুফে' পদ্ধতিতে হাতে থালা নিয়ে খাবাব জন্য ওটাই ছিল সুবিধা। তবে নিরামিষ রান্নার সমঝদারদেরও তিনি রীতিমত চমকে দিতে পারতেন। গৌরীদি খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন, ভোজনরসিক শক্তির জন্য মাঝেমাঝেই মূলোর ঘন্ট, শুকতো এবং তার পছন্দের বীফকাবাব পাঠাতেন। গৌরীদি নিজে নিরামিষেরই ভক্ত ছিলেন। নানারকম আচার বানাতেন কাজের লোকদের দিয়ে। দেখতাম ঝড়ে পড়া ঝুড়িভরা আম এসেছে—'খেলাঘর' থেকে। চোখের সামনে বসিয়ে কাটা থেকে নুন হলুদ মাখানো তেল দেওয়া সব আলাদা নির্দেশ দিচ্ছেন পুনদেওকে। খেলাঘরের ছেলেদের জন্য ওগুলি যেত। এছাড়াও জলপাই, চালতা, কামরাঙা আরো কতকিছুর আচার যে বানাতে পারতেন! আমার ছেলেমেয়েরা ভালবাসতো বলে বহুদিন পর্যন্ত জলপাইএর আচার আসতো আমাদের বাড়িতে। নিজে খেতেন খুব কম, চালভাজা বাদামভাজা, নানখাটাই বিস্কুট নিয়ে গেলেই খুশি হতেন। বলতেন 'আমি মিষ্টান্নের নই, লাবণ্যের ভক্ত'।

১৯৭৭-৮৯ পর্যন্ত আমি পার্ক সার্কসের কর্ণেল বিশ্বাস রোডের বাড়িতে থাকার দরুণ গৌরীদির প্রতিবেশী ছিলাম। ফলে সেই সময়টাই তাঁর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল ঘনিষ্ঠভাবে। সাতসকালে, ভরদুপুরে, সন্ধ্যের পরের রাতে যখন তখন হাজির হয়েছি কাজে অকাজে। হেন সমস্যা নেই যা নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হইনি, যেমন—গোদরেজের আলমারির চাবি হারিয়ে ফেলেছি, এক্ষুনি আলমারি খোলা দরকার চাবিওয়ালা কোথায় পাবো? মেয়ের মুখটা পরীক্ষার আগের দিন বেঁকে গেল। ভালো ডাক্তার কোথায় পাব? ওদের জন্য ভালো দুধ কোত্থেকে জোগাড় করবো? বাড়িতে কাজের লোক দরকার, আমি প্রচণ্ড অসুস্থ কি করবো? সাদাত হাসান মান্টোর লেখা সরাসরি মূল উর্দু থেকে অনুবাদ করতে চাই কে মূল লেখাটা পড়ে দেবে? কোন জরুরী বইপত্র দরকার—কোথায় পাবো? এমনকি কাজের মেয়েটির অনিচ্ছায় সন্তান সম্ভাবনা তার কি উপায় হবে? স-অ-ব দায় গৌরীদির। ১৯৭৮ সালে প্রবল বৃষ্টিতে সব রাস্তা নদী হয়ে গেছে, গৌরীদি বাঁধা রিকশায় রাস্তা থেকে খোঁজ নিয়ে গেছেন কি দরকার। গৌরীদি ম্যাজিক জানতেন, আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। তিনি ছিলেন আমার মুশকিল আসান! আজও কোন সমস্যা হলে বা নতুন ভালখবর হলেই সবার আগে তাঁর নাম মনে পড়ে।

গৌরীদির লেখার হাত ছিল চমৎকার! প্রবন্ধ, গল্প এবং সময়োপযোগী সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর তাঁর লেখা মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পড়েছি। লেখায় যাকে বলে প্রসাদ গুণ তা ষোলো আনা বজায় থাকত তাঁর লেখায়। সেই সঙ্গে যুক্তির ঠাসবুনোট আর স্বচ্ছ চিন্তাধারা। এখুনি মনে পড়ছে অনেকদিন আগের একটি লেখার কথা—

গর্ভপাত আইনসিদ্ধ হবার পর যখন চারিদিকে 'গেল গেল' রব উঠেছিল, গৌরীদি ঐ আইনের পক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চমৎকার ছোট লেখা দিয়েছিলেন যার মধ্যে বিরোধীদের সব তর্কের জবাব ছিল। ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর 'দেশ' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় দোষে গুণে ভরা ইন্দিরার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর অনেক গল্প হারিয়ে গেছে, কয়েকটি বাছাই গল্প নিয়ে শুভানুধ্যায়ীরা যে সংকলন-"তুচ্ছ কিছু সুখ দুঃখ" বার করেছিলেন তার মধ্যে শিক্ষানবিশীর কোন ছাপ নেই। নাতনি হবার পর মাঝে মাঝে তার সঙ্গ পেতেন তিনি, সেই নাতনি ছিল তাঁর শেষজীবনের একমাত্র লিপ্ত ভালোবাসার—আলোচনার বিষয়। আদর করে তার জাপানী নাম রেখেছিলেন রূপকথা থেকে 'সুরু সান'। নাতনির সঙ্গ উপভোগের কাহিনী 'এই যে অহনা'—গৌরীদির শেষতম মুদ্রিত পুস্তক। কতবার যে পড়েছি

তার ঠিক নেই। বাচ্চাদের এবং বড়দের সবার জন্য সরল সুন্দর ভাষায় লেখা একদম অন্যরকম বই। অনেক নবীন দিদিমা, ঠাকুরমাকে শিশুদের কৌতূহল মেটাবার পথনির্দেশ হিসাবে বইটি আমি উপহার দিয়েছি।

শেষদিকে ওকাকুরা এবং প্রিয়ংবদা দেবীর পত্রালাপ নিয়ে তাঁর জীবনী লেখার কাজে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু সম্ভবতঃ শেষ করতে পারেন নি। গৌরীদির কাছে বিভিন্ন সংস্থা থেকে লোকজনের আসা-যাওয়া ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছিল। তাঁর কাছে সর্বদাই অন্যের কাজ এবং অতিথিরা অগ্রাধিকার পেতেন, নিজের কাজ পরে। অনেক বিখ্যাত ব্যাক্তিত্বের সঙ্গও তিনি পেয়েছিলেন, সবনিয়ে একটি স্মৃতিকথামূলক আত্মজীবনী লেখার কথাও শুনেছিলাম। সম্ভবতঃ শেষ হয়নি। কখন লিখবেন? গৌরীদি প্রকৃত অর্থেই ছিলেন নিবেদিতা। যতদিন আইয়ুব বেঁচেছিলেন—চাকরির সময় ছাড়া অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হত অসুস্থ স্বামীর শারীরিক এবং মানসিক স্বাচ্ছন্দবিধানে, বাকি অংশ কিশোর পুত্রের তত্ত্বাবধানে এবং অতিথিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায়। তারই মধ্যে একটি দিন বার করে নিয়ে মৈত্রেয়ীদির সঙ্গে যেতেন খেলাঘরের কাজে। আজ বড় লজ্জা হয়, অপরাধবোধ হয়—হায়। হায়, আমিও তো কত সময় নিয়ে নিয়েছি তাঁর কাছ থেকে, ঐ সময়টুকু হয়তো তিনি নিজের মত ব্যবহার করতে পারতেন!

গৌরীদির এক নিজস্ব রাজনীতির জগৎ ছিল। আবাল্য তিনি ছিলেন গান্ধীবাদী। বরাবর তাঁকে ৩০ শে অক্টোবরের দিনটিতে গান্ধীহত্যার স্মরণে সারাদিন উপোস করে সন্ধ্যায় সামান্য খাদ্যগ্রহণ করতে দেখেছি। ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থা জারীর বিপক্ষে জনমত গঠনের একান্ত প্রচেষ্টা ছিল তাঁর। শিল্পীসাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ করে ইন্দিরা গান্ধী যে চা-চক্রের আয়োজন করেছিলেন, তাবৎ সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সেখানে গেলেও শক্তি সেই নিমন্ত্রণে যে রাজভবনে যাননি এজন্য গৌরীদি যেন ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ ছিলেন তাঁর প্রতি। জ্যোতির্ময় দত্ত, গৌরকিশোর ঘোষের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল, তাঁরা গৌরীদির বাড়ি আসতেন গোপন বৈঠকে। প্রথম যৌবনে অসহযোগ আন্দোলনে কিছুদিন তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল বলে আইয়ুব ভয় পেতেন পুলিশের যদৃচ্ছ ধরপাকড়ে গৌরীদি তো জেলে যাবেনই, তিনিও বাদ যাবেন না। পূষণ আর গৌরীদি তাঁর এই ভয়কে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে বলতেন 'জেলে নিয়ে গিয়ে হুইল চেয়ারে ওঠানো বসানো, খাবার খাওয়ানো, একবার ঠাণ্ডাজল একবার গরম জল দেওয়ার ঝামেলা দেখলে তারা সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে ছেড়ে দেবে।' কঠিনকেও সরস করে তোলায় তাঁর জুড়ি ছিল না।

আইয়ুব চলে যাওয়ার পর সবকিছু থেকেই গৌরীদি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। বইপত্রগুলি সব ফেরৎ পাঠিয়ে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন 'কিছুই ভাল লাগেনা মনের মধ্যে উত্তরের জানলাটা দিয়ে সর্বদাই হুহু করে বাতাস আসে।' মৈত্রেয়ীদি তখন পরম স্নেহে তাঁকে টেনে নিয়ে 'খেলাঘরের' কাজের সঙ্গে বেশি করে যুক্ত করেছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি অন্যসব কাজ বাদ দিয়ে ঐ অনাথদের উন্নতিকল্পেই নিজেকে বেশি ব্যস্ত রাখতেন। মাঝে মাঝে তাদের বাড়িতে এনে রান্না করেও খাওয়াতে দেখেছি। ঐ ছেলেরাও যে তাঁকে কত ভালবাসতো সেটা আরো বেশি বুঝেছি তাঁর স্মরণসভায় 'খেলাঘরে' গিয়ে। প্রতিটি বালককে দেখে মনে হচ্ছিল তারা সদ্য মাতৃহারা হয়েছে। কোনদিনও কোন উপহার নিয়ে তাঁকে মাথা ঘামাতে দেখিনি, কিন্তু খেলাঘরের ছেলেদের জন্য পর্ষদ প্রকাশিত কিছু বই উপহার পেয়ে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না—কতবার যে লোকের কাছে সেকথা বলতেন! শুনে লজ্জা করত।

আর্থারাইটিসের প্রকোপে তাঁর হাঁটুদুটি বরাবর অকেজো ছিল। ক্রমশঃ তার প্রকোপ বাড়ায় তিনি দাঁড়াতেও পারতেন না। পূষণের কাছে বোম্বে গিয়ে হাঁটু অপারেশন করিয়ে এসেছিলেন

দু দফায়। তখন তিনি হাঁটতে পারতেন, ছেলেমানুষের মত খুশি হতে দেখেছি সে সময়ে। প্রতিবার চলে আসার সময়ে বিছানা থেকে নেমে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এসে বিদায় জানাতেন, ইচ্ছা প্রকাশ করতেন একদিন হয়তো এভাবে বাসে না হলেও ট্রামে চড়তে পারবেন। তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। ব্যাধির প্রকোপে শেষের কয়েকবছর তিনি আবার বিছানাবন্দী হয়ে পড়েছিলেন। আগে আইয়ুবের বিছানার পাশে যে পিতলের ঘন্টাটি ছিল পরবর্তীসময়ে সেটি তাঁর বিছানা দখল করেছিল। মাথার দিকের জানালাটা খুলে দিলে একটু আকাশ দেখতে পেতেন। আকাশে মেঘ জমলে হঠাৎ গুনগুন করে উঠতেন কখনো, কি যে সুকণ্ঠ ছিল তাঁর। বারান্দায় কয়েকটা পাতাবাহার, কৃষ্ণকলি, নিশিপদ্মের টব ছিলো, ঐ দেখেই তাঁর বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের স্বাদ মিটত। গাছপালা-প্রকৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর নাড়ির যোগ। আমার বিয়ের পর বেহালার বাড়িতে গেছিলেন গায়ত্রীদির সঙ্গে। সেখানে আমাদের হাস্যকর রকমের এলোমেলো বাগান আর লতিয়ে ওঠা ঝুমকোলতা-বসার জন্য দুটি গাছের গুঁড়ি দেখেই তিনি উচ্ছ্বসিত—"চমৎকার! তবে আইয়ুব যদি কোনদিন আসেন একটা বাড়তি চেয়ারের ব্যবস্থা রেখো।" পার্কসার্কাসের বাড়িতেও মাঝে মধ্যে গেছেন, স্থায়ী নিবাস বেলেঘাটার বাড়িতে বেশ কয়েকবার এসেছেন। আমার সব বাড়িগুলি একতলা হবার জন্য আসতে তাঁর সুবিধা হত। এখানে বাড়িব দুপাশে দেবদারু আর সুপুরির সারি আর সামান্য ফুলপাতার বাগান দেখে তিনি ভারি খুশি হতেন।

বেলেঘাটায় এসে আগের মত ঘন ঘন যেতে না পারলেও অফিস ফেরৎ দুসপ্তাহে অন্তত একবার তাঁকে দেখতে যেতে না পারলে মনটা ভার হয়ে থাকত। আমি নিজেও ক্রমশঃ আর্থারাইটিসের জন্য চলাফেরা সীমিত করতে বাধ্য হয়েছিলাম। গৌরীদি আমার বেল্ট দেখে নিজের কথা ভুলে আমার কষ্টের জন্য উতলা হতেন, তখনও তাঁর ঘর ফাঁকা থাকত না—তাঁর অবসর ছিল না। কখনও দেখি জাপানী ছাত্রছাত্রীদের তিনি বাংলাভাষা ও সাহিত্য শেখাচ্ছেন, কখনও পরিচারিকার ছেলেকে পড়াশুনা করাচ্ছেন—আবার কোনদিন দেখেছি কিছু মুসলিম যুবককে W. B. C. S এর ইংরাজী পড়াচ্ছেন—আবার কখনও দেখি প্রতিবেশিনীর বা পরিচিত জনদের ব্যক্তিগত সমস্যা শুনছেন প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে। নিজের জন্য ব্যয় করার মত সময় তাঁর ছিল না। বিভিন্ন সেমিনার বা আলোচনাসভাতেও মাঝে মাঝে যেতে বাধ্য হতেন। পান্নালাল দাশগুপ্তের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। এতকিছু কাজকর্মের মধ্যে থেকেও তাঁর মনে হত পান্নাবাবুর মত জীবনটা কেন দেশের কাজে উৎসর্গ করতে পারলেন না। আমার চরমতম দুর্দিনে অশক্ত শরীর নিয়েও গৌরীদি এসে তাঁর উপস্থিতি দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছেন—লণ্ডনে গায়ত্রীদিকে ফোন করে খবর দিয়েছেন এবং পুনদেওকে দিয়ে সেই খবর পাঠিয়েছেন। দীর্ঘদিন অবসন্নতার পর আবার ওঁর বাড়ি ধীরে ধীরে যাওয়া শুরু করেছিলাম—ওঁর আন্তরিক ব্যবহার সঞ্জীবনীর কাজ করতো, ওঁরই উৎসাহে অন্যধরনের কাজকর্মের মধ্যে যুক্ত হয়ে মুক্তি খুঁজতে চেষ্টা করি। আমার ঘরেবাইরে তখন অদ্ভুত এক সংকটকাল। কাজকর্ম করতে গিয়ে বিচিত্র জটিলতার জালে আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম ক্রমশ—গৌরীদি এগিয়ে এসেছিলেন সাধ্যমত সমাধানের জন্য, কিছুটা সক্ষমও হয়েছিলেন আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নিজের উদাহরণ দিয়ে বলতেন আইয়ুব যাবার পরে তাঁকেও কত আঘাত সহ্য করতে হয়েছে, ব্যঙ্গোক্তি পর্যন্ত এসেছে অপ্রত্যাশিত মানুষজনের কাছ থেকে। গৌরীদি মানে তাই আমার কাছে রুক্ষ মরুভূমিতে একটুকরো মরুদ্যান—হিংস্র নোনা সমুদ্রের মধ্যে গাছপালায় ঘেরা শ্যামল দ্বীপ—প্রাণের আরাম।

শেষের দিকে আর্থারাইটিস প্রবল বিক্রমে তাঁর দেহের সর্বত্র থাবা বসাচ্ছিল। শুয়ে থাকতেন—ফোনটা ধরতেও কষ্ট হত। বেশি কথা বলতে পারতেন না—তবু গেলে খুশি হন,

কথা আমিই বেশি বলি। খবরাখবর দিই। কখনও বলেন, 'আমি একটু চোখ বুজে থাকি—যেও না।' আমার চোখে জল এসে যেত। শেষপর্যায়ে বিশেষ ধরণের খাটে শুয়ে তিনি ট্রাকশন নিতেন, সোজা হয়ে, নড়াচড়া করতে পারতেন না। একদিন গিয়ে দেখি ওভাবে শুয়েই এক বিদেশি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিশেষতঃ গীতাঞ্জলি বুঝতে সাহায্য করছেন তাঁকে। এত অসুস্থ শয্যাশায়ী মহিলা যে তাঁকে এভাবে সাহায্য করার জন্য সময় দেবেন ভদ্রলোক সেকথা ভাবেননি। তাঁর চোখমুখে ছিল বিহ্বলতা আর কৃতজ্ঞতা। তিনি গৌরীদির মৃত্যুর পরে নেতাজীভবনের স্মরণ সভায় সেকথা বলেছিলেন। সাড়াপেয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন জো উইন্টার এর সঙ্গে। বললেন উনি শান্তিনিকেতনে অতিথি অধ্যাপক হয়ে এসেছেন। আমার পরিচয় দিলেন "ইনি নিজেও লেখালিখির মধ্যে আছেন এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী।" সবসময় গৌরীদি এভাবেই পরিচয় করাতেন অন্যদের সঙ্গে এবং আমি লজ্জায় মরমে মরে যেতাম, আমি তো সত্যিই লেখালিখির জগতে নেই।—প্রতিবাদ করেও ফল হয়নি। গৌরীদি প্রতিটি মানুষকে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী করাতেন। এটাই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। উচ্চকিত নারীবাদী তিনি কখনই ছিলেন না, কিন্তু যে কোন অসহায় মেয়েকেই তিনি তাঁর সাধ্যের বাইরে গিয়েও—তাদের আত্মমর্যাদা নিয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করতেন। সাম্প্রদায়িকতা আর কুসংস্কার এদুয়ের সঙ্গে তাঁর ছিল আজীবন লড়াই। সমাজসেবী কথাটার মানে গৌরীদিকে দেখলে বোঝা যেত।

১৯৯৮ এর জানুয়ারী আমার কন্যার বিয়ের খবরে খুব খুশী হলেন। ওর ছোটবেলার গল্পগুলি মনে করলেন এবং ওকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ—লাবণ্যময়ী গৌরীদির ধ্বংসাবশেষ দেখে আমার কন্যা প্রায় কেঁদে ফেলল "গৌরীমাসি কি চেহারা হয়েছে তোমার।" উনি সে কথায় আমল না দিয়ে বললেন, "আমার চোখের সামনে এস তিতি, নইলে তো তোমায় দেখতে পাব না।" নিজের শারীরিক কষ্টের কথা বলতে তিনি কখনো ভালবাসতেন না। পুনদেওকে নির্দেশ দিলেন আলমারির বিশেষ একটি জায়গা থেকে একটি প্যাকেট বার করে দেবাব জন্য—তার মধ্যে তিতির বিয়ের জন্য ছিল কিছু উপহার।

বি. জে. পি. সরকার ক্ষমতায় আসার পর লণ্ডনের বি. বি. সি. থেকে টেলিফোনে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিল। তিনি তখন বলেছিলেন সরকার বদলে এখন তাঁর কিছু নতুন করে যায় আসে না, তবে তাঁদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, 'বি. বি. সি-র নিমাই চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শক্তির কিছু কবিতা টেপে ধরা আছে সেটা যেন তিনি মীনাক্ষীকে পাঠিয়ে দেন।'

এভাবেই সারা জীবন গৌরীদি দুহাত ভরে দিয়ে গেছেন—সে বস্তুতে, কি মননে কি ভালোবাসায়। মৃত্যুর পরেও তাঁর দেওয়া শেষ হয়নি—নিজের শরীরটিও মানুষের কল্যাণে দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনি চলে গেলেন ১৩ই জুলাই। বিহ্বল বিমূঢ় আমার চোখের সামনে অন্ধকার—তখন গৌরীদির চোখদুটি অন্যকে আলো দেবার জন্য সংগৃহীত হচ্ছে। ৫ নং পার্ল রোডের বাড়ির নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা ভেঙে তখন চুরমার—আমার মনে হল দাঁড়াবার জায়গাটুকুও আর খুঁজে পাবনা। শুধু আমি নই, আমার মত কত মানুষ যে আমাবই মত সেদিন নিরাশ্রয় হয়েছিল তার ঠিক নেই। যা কিছু তাঁর ভালো ছিল আক্ষরিক অর্থেই সকলকে বিলিয়ে গেছেন অসামান্যা এই রমণী। অনেক সৌভাগ্য মানি দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে তাঁকে কাছ থেকে দেখেছিলাম, কিন্তু এমন অকিঞ্চিতকর মানুষ আমি—কিছুই শিখিনি তাঁর কাছ থেকে—শুধু নিয়েই গেছি, দিতে পারিনি মানুষকে ভালবাসার যে পরাকাষ্ঠা গৌরীদি সারাজীবন ধরে দেখিয়েছেন—শারীরিক

সীমাবদ্ধতা আর পারিবারিক দায়দায়িত্বের গণ্ডী পেরিয়ে গিয়ে সে ক্ষমতাই তাঁকে অসাধারণের পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

[শ্রীমতী মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় সরকারী চাকুরীজীবী, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী]

কাছের মানুষ গৌরীদি

অর্ঘকুসুম দত্তগুপ্ত

গৌরীদিকে আমি ও আমার স্ত্রী সিপ্রা, খুব ভালোবাসতাম। ভালোবাসার বাড়তি কারণ ছিল, তাঁর কাছে সবাই পৌঁছুতে পারতেন—জ্ঞানী বা কম জ্ঞানী, নামী বা কম দামী, সবাই। গৌরীদি অবশ্যই কখনো কখনো ভুল বিচার করতেন কিন্তু সে সব ছিল কাষ্ঠং শুষ্কং যুক্তিবাদের সঙ্গে আবেগপ্রবণ মনের খাদ ঘটিত। কে না জানে সোনার সঙ্গে খাদ না মেশালে সে সোনা ব্যবস্থারযোগ্য হয় না। আর খাদের মিশেলটাই আমাদের তাঁর কাছে টানতো, কারণ আমি এমন এক খাদহীন যুক্তিবাদীদের পরিবার থেকে এসেছি—যে পরিবেশ আমার স্বাভাবিক মনে হত না।

তাতে যেন কেউ মনে না করেন গৌরীদি সাধারণ বাঙালিদের মতো কথার খেলাপ ও ঢিলেঢালা আচরণ সহ্য করতেন। তাঁর এই অপছন্দটা তিনি, একান্ত তাঁর ভঙ্গিতে, কোমলে কঠোরে জানান দিতেন, যাতে ভবিষ্যতে সবাই সতর্ক থাকে।

আরেকটা জিনিষ আমাদের আকৃষ্ট করতো—তাঁর কাজকর্ম চলাফেরার নিরাভরণ আভিজাত্য। তাঁর ছেলে পূষণের বিয়ের আমন্ত্রণপত্রটি পোষ্টকার্ডে স্বহস্তাক্ষরে লাল কালিতে লিখেছিলেন এবং তাতে অলংকরণ হিসেবে এক এক চিঠিতে এক এক রকম ফুল—একটি কি দুটি-এঁকে দিয়েছিলেন! এই ছোট্ট ব্যাপারটিতে যে আন্তরিকতা, আত্মবিশ্বাস পরিশ্রমী মন ও পরিকল্পনার ছাপ ছিল তা মনকে স্পর্শ না করে পারে না। এই নিষ্ঠাপ্রবণতা ছিল গৌরীদির ঘর সাজানো, পোষাক আশাক, কাজকর্ম, লেখা, ব্যবহার, সংগঠন—সব কিছুতে। গৌরীদি এতোই সৎ ও সাহসী ছিলেন যে, কাউকে খুশী করার জন্যও প্রিয় কিন্তু অসত্য স্তোকবাক্য ব্যবহার করতেন না।

তাঁর নারী-প্রগতি বা স্বাধীনতাবোধ লোক দেখানো বা সদা-হারানোর ভয়ে কম্পমান ছিল না ; নারীর স্বাভাবিক কোমল স্বভাব বা সেবাপরায়ণতাকে তিনি কুসংস্কার বা স্ত্রী-স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করতেন না, শক্তির একটি বাড়তি উৎস বলে মনে করতেন ; শেষ জীবনে অসুস্থ আবু সয়ীদকে তিনি সেবা যত্ন করে যে ভাবে ফলপ্রসূ করে রাখতেন তাতো কল্পকাহিনীসম। হীনমন্যতা তাঁকে স্পর্শও করতে পারতো না। তিনি এতো সব কঠিন কাজ এতো সহজে করতেন যে, মনে হত কাজটাই বোধ হয় কঠিন নয়। এই মনোভাব তিনি বেশ কিছুপরিমাণে সহকর্মীদের মধ্যে সঞ্চালিত করতে পেরেছিলেন।

সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধ তাঁর খুবই ছিল, কিন্তু যদি কখনো সামজিক কোন প্রথাকে

প্রগতিবিরুদ্ধ বা উন্নয়নবিমুখী বলে মনে হত তাহলে গৌরীদি হেলায় সে শৃঙ্খল অস্বীকার করতেন।

বজ্রের মতো কঠোর কিন্তু তৃণের মতো কোমল—একথাটাকে আমরা পালনঅসম্ভব শাস্ত্রবচন বলেই মানি, কিন্তু বাস্তবেও যে তা করণসম্ভব তা গৌরীদিকে কাছ থেকে না দেখলে জানতেও পারতাম না।

[শ্রী অর্ঘকুসুম দত্তের পেশা ও নেশা সাংবাদিকতা এবং সমাজসেবা]

খেলাঘরের গৌরীদি

সমর বাগচী

স্মৃতিচারণায় গৌরীদিকে মনে আনলেই এক মৃদু, নরম আমেজ মনে আসে। অনেকটা ওঁর কাজের মানুষ পুনদেওকে ডাকবার জন্য যে ঘন্টাধ্বনি করতেন তার মৃদু আওয়াজের মত নরম ছিল তাঁর মন। কাউকে ডাকবার জন্য ঘন্টাধ্বনি যে অত মৃদু হতে পারে তা ওঁর স্বভাব বৈশিষ্টকেই চিনিয়ে দেয়। গৌরীদিকে কখনও উচ্ছল, চিৎকৃত হতে দেখিনি। অথচ নিজের বিশ্বাসের দিক থেকে ছিলেন একনিষ্ঠ, দৃঢ়।

একজন মানুষকে গভীরভাবে জানতে গেলে যে নৈকট্য প্রয়োজন, অর্থাৎ মানসিক নৈকট্য, সেরকম কাছাকাছি আমরা আসিনি। একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ দূরত্ব দুজনের মধ্যে ছিল। ওঁর সাথে আমার পরিচয় প্রায় ৩৫ বছর। পরিচয়টা সামাজিক কর্মের সূত্রে। ১৯৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে দাঙ্গা হয় সেসময় 'কাউন্সিল ফর প্রমোশন অফ কমিউনাল হারমনি' গঠিত হয়। গৌরী আইয়ুব, মৈত্রেরী দেবী, অধ্যাপক মাহমুদরা ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা। সেই দাঙ্গার সময় উত্তর চব্বিশ পরগনার এক গ্রামে, সম্ভবত শ্যামনগর, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টি করার জন্য একটি ক্যাম্প হয়। সেই ক্যাম্পে, সুবক্তা শ্রী শঙ্কর চক্রবর্তী মানুষের ক্রমবিকাশ বিষয়ে স্লাইড সহযোগে এক বক্তৃতা দিতে যান। বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে বোঝান যে মানব জাতির সৃষ্টির উৎস এক। একই রক্ত সবারই মধ্যে প্রবাহিত হয়। আমি সেখানে গিয়েছিলাম শঙ্করবাবুর স্লাইড প্রজেকশনিস্ট হিসাবে। সেই প্রথম গৌরীদি ও মৈত্রেয়ীদিকে দেখা। মৈত্রেয়ীদি জনসমাবেশে বক্তৃতা দিলেন। গৌরীদি জনসমাবেশে বক্তৃতা দেওয়া পছন্দ করতেন না। আসলে তাঁর চরিত্রই ছিল শান্ত, স্নিগ্ধ, মৃদু। কোন উচ্চকিত বক্তৃতা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল গৌরীদিকে জানতাম সুপণ্ডিত, রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ আবু সয়ীদ আইয়ুবের সহধর্মিণী হিসাবে। তার বেশি পরিচয় আমার জানা ছিল না। এরপর একদিন শঙ্করবাবুর সঙ্গে আইয়ুব সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাই। শ্রী আইয়ুব তখন একেবারে শয্যাশায়ী। গলার আওয়াজ খুবই ক্ষীণ। গৌরীদির কোমল প্রতিমূর্তি সেদিন দেখলাম। কী মমতা নিয়ে অসুস্থ স্বামীর সেবাযত্ন করছেন! আইয়ুব খুবই মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করছিলেন। কী ঔৎসুক্য নূতন খবর জানবার!

তারপর এল ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। আমি গৌরীদি ও মৈত্রেয়ীদিকে নিয়ে

চলেছি আমার গাড়িতে বাংলাদেশ সীমান্তে বয়রা গ্রামে। উদ্দেশ্য ওঁরা কাউনসিল থেকে ওখানে ক্যাম্প স্থাপন করবেন বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য। তখনও শরণার্থী আসা তেমন শুরু হয়নি। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম ওঁদের দুঃসাহসের কথা। ওঁদের তখন নিজেদের গাড়ি নেই। ভাবছিলাম কীভাবে ওখানে যাওয়া আসা করবেন। কলকাতা থেকে প্রায় ৮০-১০০ কি. মি. দূরে। কিন্তু ওঁরা ওখানে ক্যাম্প স্থাপন করলেন। তারপর যখন স্রোতের মত লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আসতে শুরু করল আর সরকার থেকে রাস্তার ধারে ধারে ক্যাম্প তৈরী হতে লাগল তখন গৌরীদি-মৈত্রেয়ীদি ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে শরণার্থীদের মধ্যে মনোবল সৃষ্টি করতে শুরু করলেন এবং নিজের দেশের কথা তাদের মনে জাগ্রত রাখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁদের দেখেছি বৃষ্টির সময় কাদার মধ্যে মড়াকে পেরিয়ে ক্যাম্পে ক্যাম্পে যেতে।

ঐ সময় প্রচুর শিশু অনাথ হয়ে যায়। ভারত সরকারের অনুরোধে ওঁরা কল্যাণীতে একটি অনাথ শিশু নিবাস গড়ে তুললেন। বাংলাদেশ হয়ে যাবার পর ঐসব শিশুদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মৈত্রেয়ীদি-গৌরীদি অনুভব করলেন যে আমাদের দেশেও ত প্রচুর অনাথ শিশু। তাদের জন্য একটি অনাথাশ্রম এবং পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য পালনকারী মাতা-পিতা জোগাড় করে দেওয়ার কাজ করা যাক। আমার মনে আছে বাদুতে যেখানে এখন 'খেলাঘর' তার জমি দেখানোর জন্য আমি গাড়ি করে ওঁদের নিয়ে গেলাম। তারপর ১৯৭২ সালে খেলাঘরের প্রতিষ্ঠা। এই খেলাঘরের শিশুদের মা ছিলেন মৈত্রেয়ীদি-গৌরীদি। গৌরীদির শরীরও তখন খারাপ হয়ে আসছে। পায়ের ব্যথায় হাঁটতে খুবই কষ্ট। কিন্তু ঐ শরীর নিয়ে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত খেলাঘর যাতায়াত করতেন। উনি প্রথম থেকে ছিলেন খেলাঘরের সম্পাদিকা। মৈত্রেয়ীদি মারা যাবার পর হন সভাপতি। খেলাঘরের শিশুদের শিক্ষার ভার ছিল তাঁর ওপর। খেলাঘরের শিক্ষার দুটি বিশেষত্ব ছিল—শিশুদের দৈহিক শ্রমের প্রতি মর্যাদা দিতে শেখানো এবং শিশুদের নান্দনিক বোধের বিকাশ। শিশুরা 'খেলাঘর' আশ্রমকে পরিষ্কার রাখে, চাষের, তাঁতের, সেলাই, মাছ ধরা ইত্যাদি নানা কাজ করে। এছাড়া সপ্তাহে দুদিন নাচ, গান শেখে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত। প্রতি সপ্তাহে একদিন দেশ বিদেশের গল্প, মহাকাব্য, নাটক ইত্যাদি শোনে। বিশেষ অনুষ্ঠানে, যেমন বসন্তোৎসব কিম্বা বৃক্ষরোপণ উৎসবে নাচ, গান, নৃত্যনাট্য, নাটক ইত্যাদি করে। শিক্ষায় বৈচিত্র্য আনবার জন্য কত মানুষকে খেলাঘরে টেনে নিয়ে আসতেন গৌরীদি। কখনও দার্শনিক, কখনও শিক্ষাবিদ, কখনও সমাজতাত্ত্বিক। গৌরীদি-মৈত্রেয়ীদির পরিচিতির বিরাট গণ্ডী খেলাঘরকে ছোঁয়। মৈত্রেয়ীদি ও গৌরীদির মৃত্যুতে এই মহতের ছোঁয়া থেকে 'খেলাঘর' কিছুটা বঞ্চিত হয়েছে। আমরাও অনাথ হয়েছি।

[শ্রী সমর বাগচী 'খেলাঘর'-এর একজন অন্যতম পরিচালক ও সমাজসেবক]

গৌরী আইয়ুব স্মরণে

নিরঞ্জন হালদার

অধ্যাপিকা গৌরী আইয়ুব ৬৭ বছর বয়সে গত ১৩ জুলাই ('৯৮) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গৌরী আইয়ুবের মৃত্যুতে পার্ক সার্কাসে ৫ নম্বর পার্ল রোডের ঐতিহাসিক গুরুত্বের অবসান ঘটল। গৌরী দত্তের সঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুবের বিয়ের আগে থাকতেই ৫ নম্বর পার্ল রোডে দেশবিদেশের লেখক-কবি, দার্শনিক, রাজনৈতিক নেতা, নেত্রী, ঐতিহাসিক, বুদ্ধিজীবী ও সমাজসেবীদের আনাগোনা ছিল। কে না এসেছেন এই বাড়িতে? বন্ধু হুমায়ুন কবির তো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। এম. এন. রায়, জয়প্রকাশ নারায়ণ, সোশালিস্ট নেতা মুন্সী আহমেদ দীন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক অম্লান দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, আর্থার কোয়েশলার, এডোয়ার্ড শিলস, এলেন রায়। আরও কত লোক! যাঁরা সৈয়দ মুজতবা আলির সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তাঁরা একবার আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে দেখা করে যেতেন। আর বাংলাদেশ থেকে কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, গায়ক-গায়িকা কলকাতা এলে একবার ৫ নম্বর পার্ল রোডের ফ্ল্যাটে আসতেন। ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে কবি শামসুর রহমান বলেছিলেন, 'বুদ্ধদেব বসু মারা গিয়েছেন। তাই কলকাতার প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই'। তারপর নিজের ভুল সামলে নিয়ে বলেছিলেন, 'আবু সয়ীদ আইয়ুব যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন কলকাতায় আসতেই হবে।' আবু সয়ীদ মারা যান ১৯৮২ সালে ৭৬ বছর বয়সে। তারপর থেকে ঐ বাড়িতে ভিড় হত বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী, এদেশের শিক্ষাব্রতী, ঐতিহাসিক, সমাজসেবী, নতুনভাবে ভাবতে চাওয়া মুসলমান তরুণ-তরুণীদের। গৌরী আইয়ুবের কাছে তাঁরা আসতেন নানা বিষয়ে আলোচনা করতে। সংস্কারমুক্ত নতুন পথের নিশানা পেতে।

আবু সয়ীদ আইয়ুব ১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্ডিয়া স্টাডিজ বিভাগের প্রথম অধ্যাপক হয়ে অস্ট্রেলিয়া যান। সেখানে প্রচণ্ড গরম ও তীব্র শীতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শরীর এত খারাপ হয় যে, এক বছর পরেই তাঁরা দেশে ফিরে আসেন। গৌরী আইয়ুব ফেরেন বাত নিয়ে। সেই বাতই পরে তাঁকে পঙ্গু করে। হাঁটবার ক্ষমতা ছিল না, তাই টানা রিকশায় করে বাড়ি থেকে লর্ড সিন্‌হা রোডের শ্রীশিক্ষায়তন কলেজে যেতেন। অবসর গ্রহণের পর এই বাতই তাকে শয্যাশায়ী করে। একবার আকাশবাণীতে নাস্তিকতা নিয়ে আলোচনার সময় একজন প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার চরম দুঃখের মুহূর্তে আপনার কি ঈশ্বরের কথা মনে হয় না?' গৌরী আইয়ুব জবাব দিয়েছিলেন, 'আমার এখনও অতটা অধঃপতন হয়নি।' ঈশ্বরে ও পরলোকে অবিশ্বাসী গৌরী আইয়ুব মৃত্যুর পর নিজের দেহকে 'গণদর্পণ'-এর মাধ্যমে মেডিক্যাল কলেজকে দান করে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের আই ব্যাঙ্ক তাঁর চোখ দুটি নিয়ে যায়। আর মৃতদেহ নেয় ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগ। চোখ দুটি দুই দৃষ্টিহীনকে এই পৃথিবী দেখতে সাহায্য করবে আর মৃতদেহ মেডিক্যাল ছাত্রদের দেহ ব্যবচ্ছেদে সাহায্য করবে।

গৌরী আইয়ুবের মৃত্যুর পর কার্ড ছাপিয়ে ছটি শোকসভা হয়েছে। আর কার্ড না ছাপিয়ে স্মরণ সভা অনেক হয়েছে। এক নাস্তিকের প্রতি এই শ্রদ্ধা প্রমাণ করে, মানুষ বেঁচে থাকে তাঁর কাজের জন্য, ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য নয়। গৌরী আইয়ুব সারা জীবন স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গিয়েছেন। দার্শনিক ও গান্ধীবাদী অধ্যাপক ধীরেন্দ্রমোহন দত্তের মেয়ে গৌরী দত্ত ১৯৪৯

সালে পাটনার জেলে যান কম্যুনিস্ট ছাত্র সংগঠনের সদস্যা হিসাবে। পরে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও অন্যান্য র‍্যাডিকেল হিউম্যানিস্টদের সংস্পর্শে এসে তিনি মার্ক্সবাদে আস্থা খুইয়ে মানবতাবাদী হন। গৌরী দত্ত শান্তিনিকেতন থেকে দর্শনে অনার্স পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এডুকেশনে এম. এ. পাশ করেন। প্রথমে আসানসোলে, পরে কলকাতার একাধিক স্কুলে পড়িয়েছেন। ১৯৫৬ সালে পরিবার ও বন্ধুদের সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করে নিজের চেয়ে ২৫ বছরের বড় শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষক আবু সয়ীদ আইয়ুবকে বিয়ে করেন। আইয়ুবের দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি ছিল। ডঃ রাধাকৃষ্ণান সম্পাদিত 'ইস্ট-ওয়েস্ট ফিলসফি' বইয়েও তাঁর লেখা ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁর কোনো স্থায়ী রোজগার ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে পড়ানোর সময় প্লুরিসিতে আক্রান্ত হন। বন্ধু সৈয়দ মুজতবা আলি তাঁকে নিয়ে ভেলোরে যান। ভেলোর থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন। ভেলোরে সারাদিন সময় কাটানোর জন্য সৈয়দ মুজতবা আলি লিখতে শুরু করেন। এইভাবে 'দেশেবিদেশে' বইটি লেখা হয় এবং সৈয়দ মুজতবা আলি বাংলা ভাষার লেখক হন। আবু সয়ীদ আইয়ুব শান্তিনিকেতনেও কিছুদিন পড়ান। কিন্তু তিনি প্রায়ই অসুস্থ হতেন। আবু সয়ীদ আইয়ুবকে বিয়ের ব্যাপারে গৌরীদির আত্মীয় অমিতাভ চৌধুরীর প্রধান আপত্তি ছিল বয়স্ক আইয়ুব সাহেবের রোগ জর্জর দেহ। যদিও শেষ পর্যন্ত তিনিই বিয়েতে সাক্ষী হয়েছিলেন। আইয়ুব থাকতেন। তাঁর দাদা ডাঃ এ. এম. ও গণি ও বৌদির পরিবারের একজন হয়ে। এহেন আবু সয়ীদ আইয়ুবকে বিয়ে করে কী দুরবস্থায় পড়তে হবে, তার প্রস্তুতি হিসাবে গৌরী দত্ত দক্ষিণ কলকাতার এক গ্যারেজে থাকতেন। বিয়ের পরেও দুজনকে দাদা-বৌদির ফ্ল্যাটে গিয়ে খেতে দেখেছি। সৈয়দ মুজতবা আলি শান্তিনিকেতনে পড়ানোর চাকরি নিয়ে একতলার ঘর ছেড়ে দিলে ঐ ঘরটি তখনই গৌরীদির দখলে আসে এবং দুজনের পৃথক রান্নার ব্যবস্থা এবং অতিথিদের জন্য আপ্যায়ন শুরু হয়।

গৌরী দত্তের সঙ্গে বিয়ের পর আমি আর আবু সয়ীদ আইয়ুবের ঘরে যাইনি। আমার শিক্ষক অধ্যাপক অম্লান দত্ত আমাকে একদিন আইয়ুব সাহেবের বাসায় নিয়ে যান। গৌরীদির ধমকেই আমার শিক্ষককে 'স্যার' বলা বন্ধ হয়। পরের দিন থেকে তাঁকে 'অম্লানদা' বলতে হয়। আবু সয়ীদ আইয়ুবের বাড়িতে মাসের দুই রবিবার আলোচনার সভা হত। অধ্যাপক অম্লান দত্ত একদিন বললেন, 'আইয়ুব চান, তুমিও আমাদের আলোচনা সভায় যোগদান কর।' জ্ঞানচর্চার দিক থেকে গৌরী আইয়ুবের স্থান যে কত উঁচুতে ছিল, তা জানার সুযোগ হয় ঐ আলোচনা সভায় যাওয়ার পর। ঐ আলোচনা সভায় থাকতেন অধ্যাপক আইয়ুব, অধ্যাপক অম্লান দত্ত, অধ্যক্ষা প্রতিমা বাওয়েস, শীতাংশু চট্টোপাধ্যায়, নির্মল মুখোপাধ্যায়, আমি এবং গৌরীদি। নিয়ম ছিল, উপস্থিত সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ঐ আলোচনা সভাতেই অধ্যাপক আইয়ুব দুদিন অস্তিত্ববাদ ও সার্ত্রের দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। জ্যাঁপল সার্ত্রের বক্তব্য ছিল মানুষ সব অবস্থাতেই চিন্তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে এবং মানুষের কাজ হবে সমাজ পরিবর্তনের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাওয়া। আমার মনে হয়, গৌরীদি অস্তিত্ববাদী দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে সারা জীবন সমাজ-মানসিকতা বদলানোর কাজ করে গিয়েছেন। আমাদের আলোচনাসভার শেষের দিকে আমার বন্ধু জ্যোতির্ময় দত্ত ও মীনাক্ষী দত্ত যোগ দিতেন। জ্যোতির্ময় তখন স্টেটসম্যানে চাকরি করতেন। এক রবিবার এসে বলে, আমাদের একটা আন্দোলন করতে হবে। সরকারী ভাষা কমিশনের রিপোর্ট কিছুদিনের মধ্যেই বের হবে। কমিশনের সুপারিশে থাকবে অবিলম্বে ইংরেজী বাতিল করে হিন্দীকেই একমাত্র সবকারী ভাষা

করতে হবে। তখনও পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল হিন্দী ভাষা অনুন্নত বলেই রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না। ঐ সভাতেই আলোচনা হয়, হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হলে অন্য ভারতীয় ভাষার উন্নতি ব্যাহত হবে, হিন্দীভাষীরা রাজনীতি কব্জা করবে। তখন শ্লোগান হবে, হিন্দী ও হিন্দুধর্ম। সেক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে। ইংরেজী কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা রাখার জন্য কলম ধরেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, অম্লান দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, মৈত্রেয়ী দেবী আর সক্রিয় আন্দোলনকারীদের মধ্যে ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, নরেন্দ্রদেব প্রভৃতি। এই ভাষা আন্দোলন থেকে গৌরী আইয়ুবকে আবার কর্মীর ভূমিকায় দেখা যায়। কলকাতার সম্মেলনে রাজাগোপালাচারীকে কলকাতায় আনার পরে ভাষা আন্দোলন মাদ্রাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং তামিলনাড়ুর আন্দোলন শেষ পর্যন্ত হিন্দীভাষার আগ্রাসন রুখে দেয়। অধ্যাপক অম্লান দত্তের ইচ্ছাতেই আবু সয়ীদ আইয়ুব ও অম্লান দত্ত এক সময়ে ত্রৈমাসিক 'কোয়েস্ট' পত্রিকার সম্পাদক হন। বেতন ছিল মাসে ৫০০ টাকা। অম্লান দত্ত কিছু নিতেন না। পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল আবু সয়ীদ আইয়ুবের। সারা দিন এই পত্রিকার জন্য ব্যস্ত থেকে ও সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে আইয়ুব সাহেব সুস্থ হয়ে যান। যোধপুর গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষায়িত্রীর বেতনে নিজেদের সংসার ও অতিথি আপ্যায়নের খরচ চলত না। তাই গৌরীদি মাড়োয়ারি বৌদের ইংরেজী কথা বলার টিউশনি নিতেন। তারপর ১৯৬১ সালে সপরিবারে মেলবোর্ণে যান। ফিরে এসে শ্রীশিক্ষায়তন কলেজে চাকরি পান। ১৯৬৩ সালে বৃহত্তর কলকাতায় মুসলমানবিরোধী দাঙ্গা হয়। আনন্দবাজার পত্রিকার খবর, সম্পাদকীয় এবং বেনামে নিখিল সরকারের তিনটি প্রবন্ধ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে মদত দেয়। কবি সমর সেন মুসলমান-বিরোধী সংবাদের প্রকাশ বন্ধ করতে না পেরে হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডের যুগ্মসম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এই সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অন্নদাশঙ্কর রায়; কাজী আবদুল ওদুদ, নারায়ণ চৌধুরী, মৈত্রেয়ী দেবী, বিচারপতি মাসুদ, গৌরী আইয়ুব প্রভৃতি গড়ে তোলেন কাউন্সিল ফর প্রমোশন অফ কম্যুন্যাল হারমোনি। মৈত্রেয়ী দেবী সংস্থার আহ্বায়িকা হন। সেই থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গৌরী আইয়ুবের বাইরে বের হওয়া শুরু। কোথাও দাঙ্গা হয়েছে খবর পেলে মৈত্রেয়ী দেবী ও গৌরী আইয়ুব সেখানে গিয়েছেন। যখন লোক পাননি, আমাকে ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরুণ মুখার্জীকে ডেকেছেন সঙ্গে যাওয়ার জন্য। অবশ্য তার আগেই ১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পর ৫ নম্বর পার্ল রোড রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্র হয়। আদর্শগত কারণে যারা আক্রমণকারী চীনকে সমর্থন করছিল তাদেরও জাতীয় চিন্তাধারায় ফিরে আনার জন্য কমুনিজম বনাম গণতন্ত্রের সংগ্রামে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের কর্মসূচী নেওয়া হয়। গঠিত হয় 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ'। আইয়ুব দম্পতি, বুদ্ধদেব বসু দম্পতি, সন্তোষ কুমার ঘোষ, সাগরময় ঘোষের সঙ্গে যুক্ত হন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গুজরাতী লেখক শিবকুমার প্রমুখ।

যাইহোক, গৌরীদির সঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কাজের মাধ্যমে। সেই বন্ধুত্ব দুজনের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। নকশাল আন্দোলনের সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য গোপাল বসু খুন হন। খুনের ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত। মৈত্রেয়ী দেবী ও গৌরী আইয়ুব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকজন নিয়ে সভা করতে যান মানুষের মন থেকে ভয় দূর করার জন্য আর ভ্রান্ত-পথের যুবকদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্য।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ থেকে দলে দলে বাস্তুহারা ভারতে আসতে থাকে। মৈত্রেয়ী দেবী ও গৌরী আইয়ুব গিয়েছেন বয়রা সীমান্তে শরণার্থীদের ক্যাম্পে। যুবকদের বলছেন ক্যাম্পে

আশ্রয়প্রার্থী না হয়ে ট্রেনিং ক্যাম্পে শিক্ষা নিয়ে খান সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে। এঁরা দুজন পরে পূর্ব পাকিস্থান থেকে আসা অনাথ শিশুদের জন্য কল্যাণীতে একটি আশ্রম গড়ে তোলেন, নাম দেন "খেলাঘর।" বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'খেলাঘর' ঢাকায় চলে যায়। পরে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের অনাথ শিশুদের জন্য মধ্যমগ্রামের নিকট বাদু গ্রামে স্থাপন করেন 'খেলাঘর'। মৈত্রেয়ী দেবীর মৃত্যুর পর গৌরীদি আমৃত্যু ঐ সংস্থার সভানেত্রী ছিলেন। গৌরীদির কলেজ-জীবনের বন্ধু ডঃ আরতি সেন সব সময়ে গৌরীদির পাশে থেকে তাঁর কাজকর্মে সাহায্য করেছেন।

১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে পান্নালাল দাশগুপ্ত রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ডের সদস্য হয়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্লকে সার্বিক গ্রাম উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করেন। সেইসব প্রকল্পের মহিলা-কর্মীরা গৌরীদির কাছে আসতেন এবং তাঁদের কাজের ব্যাপারে অর্থের অভাবের কথা বললে গৌরীদি তাঁদের টাকা দিতেন। ঐ টাকা দিলে তাঁদের সংসার কীভাবে চলবে, এ চিন্তা তাঁর মনে আসত না। জরুরী অবস্থায় আত্মগোপনকারী জ্যোতির্ময় দত্ত মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতেন টাকার জন্য। ১৯৭৭ সালে লোকসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে আনন্দবাজার পত্রিকা মেয়েদের মতামত ছাপে। একমাত্র গৌরী আইয়ুবই নির্বাচনের মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্রকে উৎখাতের আবেদন জানিয়েছিলেন। জরুরী অবস্থায় মৈত্রেয়ী দেবীকে সামনে রেখে কলকাতায় রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী ও মহিলাকর্মীদের এক সভা ডেকেছিলেন, যে সভায় আলোচনার জন্য আমেদাবাদ থেকে সাহিত্যিক উমাশঙ্কর যোশী ও পুরুষোত্তম মবলঙ্কর এসেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের আমলে দুবার তাঁকে রাস্তায় দেখা যায়। কসবার বিজন সেতুতে আনন্দমার্গী সন্ন্যাস-সন্ন্যাসিনীদের পুড়িয়ে মারার প্রতিবাদে মৈত্রেয়ী দেবী ও অন্নদাশঙ্কর রায় দেশপ্রিয় পার্ক থেকে বিজন সেতু পর্যন্ত এক শোক মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন। গৌরী আইয়ুব এই মিছিলে লোক আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষায় পাস-ফেল প্রথার প্রবর্তন ও ইংরেজী পড়ার দাবিতে সিধু-কানু ডহরে সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে হাঁটতে না-পারা প্রতিভা বসুর সঙ্গে গৌরী আইয়ুবও ছিলেন। ১৯৮৩ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পরে কলকাতার শিখদের উপর নির্যাতন, বাড়ি ও দোকান লুটপাট হয়। তখন ভয়ার্ত শিখদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অনেকেই গৌরী আইয়ুবকে নিতে এসেছিলেন।

গৌরী আইয়ুব আবু সয়ীদ আইয়ুবকে বিয়ে করেছিলেন বলেই আমরা এক নতুন রবীন্দ্র-ভাষ্যকারকে পাই। ১৯৬৭ সালে আবু সয়ীদ আইয়ুব 'কোয়েস্ট' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তারপর থেকে তাঁর ধারাবাহিক রবীন্দ্র চর্চা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথকে তিনি 'পান্থজনের সখা' হিসাবে গণ্য করতেন। আইয়ুব সাহেব যখন পড়তে পারেন না, লিখতে পারেন না, তখন গৌরীদি আইয়ুব সাহেবকে বই-পত্রিকা পড়ে শোনানো ও শ্রুতিলিখনের জন্য কর্মী নিয়োগ করেছেন। তাঁরা অবশ্য ঐ কাজ করতেন, আইয়ুব দম্পতিকে শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন বলে। মাসুদ সাহেব হাইকোর্ট থেকে অবসর গ্রহণের পর বাড়িতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য ট্রেনিং ক্লাস খোলেন, গৌরীদি সেখানে ইংরেজী পড়াতেন। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটেও তিনি নিয়মিত ক্লাস নিতেন। সকলেই বলেছেন, গৌরীদি নিয়মনিষ্ঠ আদর্শ শিক্ষিকা ছিলেন।

১৯৮২ সালে আবু সয়ীদ আইয়ুব মারা যান। তারপর থেকে কে ওখানে থাকে, আর কে ওখানে থাকে না, তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না। হয়তো আরতিদি, মৃন্ময়ী বসু, রুচিরা শ্যাম, নার্গিস আহমেদ বা ডঃ মীরাতুন নাহার বলতে পারেন।

এত সব কাজের মধ্যেও গৌরীদির সাহিত্যিক-জীবন অব্যাহত ছিল। একটি ছোট গল্প সংকলন, একটি অনুবাদ গ্রন্থ ছাড়া অজস্র প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে অগ্রন্থিত আকারে। ১৯৭০ সালের আগে আমি বেগম রোকেয়ার নাম শুনিনি। সেখ আজিজুর রহমান সম্পাদিত 'সংকেত' পত্রিকায় তিনি বেগম রোকেয়ার কথা লেখেন। তিনি নতুন প্রজন্মের মুসলমান ছেলেমেয়েদের স্ব-নির্বাচিত পথে চলার কথা বলতেন। তারাও তাঁকে খুব ভালবাসত। আমিও ব্যক্তিগতভাবে কম ঋণী নই। অনেক বন্ধু পেয়েছি ঐ বাড়ি থেকে। শান্তিনিকেতনের তরুণ অধ্যাপক ডেভিড ম্যাক্কাচন অস্ত্রোপচারের পর পি. জি. হাসপাতালে একা পড়েছিলেন। গৌরীদি আমাকে বলেন ওকে দেখতে যেতে। পরে পূর্ব ভারতের মন্দিরের স্থাপত্য বিশেষজ্ঞ ডেভিড মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমার বন্ধু ছিল।

গৌরী আইয়ুব সারা জীবন যে-সব কাজ করে গিয়েছেন, তার কী মূল্য আছে? ডঃ অশীন দাশগুপ্ত "ভারতের ইতিহাস ও আবু সয়ীদ আইয়ুব" প্রবন্ধে ঐ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, ভারতের ইতিহাসে এঁদের নাম থাকবে না। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে ধর্মনিরপেক্ষ ধারাকে এঁরা শক্তিশালী করে গিয়েছেন। এখানেই তাঁদের গুরুত্ব।

গৌরী আইয়ুবের মৃত্যুর পর এক টি ভির সাক্ষাৎকারে ডঃ হোসেনুর রহমান বলেছিলেন, "এই রকম এক মহিয়সী মহিলাকে আমরা অনেকদিন পাব না। এঁর মত মানুষের মৃত্যু হয়, কিন্তু শূন্যে মিলিয়ে যান না। এরা বেঁচে থাকেন এঁদের কাজের জন্য, পরবর্তী প্রজন্মকে প্রেরণা দেওয়ার জন্য।" এই বিশ্বাস আমারও।

সৌজন্যে ঃ প্রবাহ, শারদসংখ্যা ১৪০৫

[শ্রী নিরঞ্জন হালদার বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমাজসেবক]

অনেক বড়মাপের মানুষ ছিলেন গৌরীদি

আবদুর রউফ

গৌরী আইয়ুবের কথা মনে হলেই যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের চিত্তে যে ভাবের উদয় হয় তার নাম শ্রদ্ধা। এটাই প্রমাণ তিনি বড় মাপের মানুষ ছিলেন। অথচ তাঁর এই 'বড়ত্ব' বা 'বিরাটত্ব' আপাতদৃষ্টিতে তেমন কিছুই ছিল না। তিনি সাধারণ বাঙালি রমণীদের তুলনায় উচ্চতায় কিঞ্চিৎ খাটোই ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির বহর তাঁর এমন কিছু ছিল না। চাকরিও করেছেন খুব সাধারণ মাপেরই। কিছু কিছু অনবদ্য প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি লিখে থাকলেও সেসবের পরিমাণ এত বেশি নয় যার জোরে তাঁকে একজন খ্যাতিমান বড় লেখিকা হিসাবে গণ্য করা যায়। অর্থনৈতিক বিচারেও তিনি ছিলেন নিতান্তই সাধারণ মধ্যবিত্ত গোত্রের মানুষ। এসব দিক থেকে বিচার করলে তাঁকে 'বড়লোক' বলার কোনও উপায় নেই।

কেউ কেউ তাঁকে সমাজসেবিকা এবং সমাজসংস্কারক হিসাবে বড় করে দেখাতে চেয়েছেন। আমার ধারণা, তাঁর সামনে কেউ তাঁকে এধরনের বিশেষণে বিশেষিত করতে চাইলে তিনি ঘোরতর আপত্তি জানাতেন। আমি কেন এমন কথা বলছি তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন

তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝবেন। তাঁর বহু আন্তরিক প্রয়াসকেই সমাজসেবামূলক কিংবা সমাজসংস্কারমূলক বলা যায় ঠিকই, কিন্তু সমাজসেবী কিংবা সমাজসংস্কারক হয়ে ওঠার বাসনা থেকে এসব কাজ তিনি কখনওই করেননি। বিশেষ করে সমাজসেবা তো ইদানীংকালে একটি পেশার নাম। পেশাদার সমাজসেবীদের সঙ্গে সমগোত্রীয় করতে না চাইলেও এধরনের বিশেষণের দ্বারা তাঁর মহত্ত্বকে ছোট করে ফেলা হয়।

দুঃস্থ মানুষের সেবামূলক কাজ তিনি যা কিছু করেছেন, সবই করেছেন গভীর হৃদয়বত্তার কারণে। ইদানীংকালে সংসারে সচরাচর যা দেখা যায় না সেই দুর্লভ হৃদয়বত্তার অধিকারী হওয়ার কারণেই দুঃস্থ মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম দরদ। এই দরদবোধের তাড়না থেকেই তিনি তাঁর পরিচিত, অর্ধপরিচিত, এমনকী অপরিচিত মানুষদের ও যাঁরাই তাঁর সান্নিধ্যে এসে হাজির হত তাঁদের দুঃখ লাঘবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভেবে দেখার প্রয়োজনই বোধ করতেন না। আর্ত মানুষ তাদের বেদনার কাহিনী তাঁকে শুনিয়েও শান্তি পেত। অসীম ধৈর্য সহকারে তিনি শুনতেন সেসব কথা। নিজের জরুরি কাজকর্ম পণ্ড করে, ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু নিজের দরদী মনের সাহচর্য দিয়েই তিনি অনেকের হৃদয়ের ভার লাঘব করতেন। এতে তাঁর কোনও ক্লান্তি ছিল না। আমরা নিজেরাও তাঁর এই দরদী মনের দাক্ষিণ্য পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেছি। দরদী অন্তঃকবণের কারণেই তিনি ছিলেন অসাধারণ স্নেহময়ী। তাঁর স্নেহের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়ে গেছেন বহুমানুষ। সেসব স্পর্শ দুর্লভ স্মৃতি। তাঁর এই দরদী অন্তঃকরণের কারণেই আর পাঁচজন হিসেবি সমাজসেবীদের তুলনায় অনেক বড় মাপের মানুষ ছিলেন তিনি।

গৌরী আইয়ুবের এই অপরিসীম স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর প্রখর যুক্তিবাদী মানসিকতা। কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি স্নেহান্ধ হয়ে যে মানসিকতাকে তিনি কোনও সময়েই বিসর্জন দেননি। ফলে অতি নিকটজনের, পরম আত্মীয়ের কিংবা বন্ধুজনের অযৌক্তিক বক্তব্য কিংবা মতবাদের একদেশদর্শিতা খণ্ডনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিরলস তার্কিক। তাঁর তর্কে উগ্রতা থাকত না, অন্যের বক্তব্যের প্রতি বিন্দুমাত্রও তাচ্ছিল্য থাকত না। কিন্তু সেই বক্তব্যের অযৌক্তিক দিকগুলি তিনি অত্যন্ত নম্রভাবে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে নস্যাৎ করে দিতেন। এই নম্রতার কারণেই তাঁর তর্কপূর্ণ প্রবন্ধগুলির মধ্যে দেখা দিত অসাধারণ এক প্রসাদগুণ যা পাঠককে আকর্ষণ করত। মূলত সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলিই যেহেতু ছিল তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু, তাই কখনও কখনও মনে হওয়াই স্বাভাবিক, তিনি বোধ করি সমাজসংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছেন। কিন্তু সত্যিই সেরকম কোনও ভূমিকা নেওয়ার বাসনা গৌরী আইয়ুবের আদপেই ছিল না। আসলে তিনি চাইতেন সবার মধ্যেই যুক্তিবাদী মননশীলতা গড়ে উঠুক—তারপর যা হওয়ার আপনিই হবে। এই যুক্তিবাদী মননশীলতা গড়ে তোলার প্রয়োজনে তিনি হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্মীয় এবং সামাজিক ধ্যান-ধারণায় যেসব যুক্তিহীনতা এবং অমানবিকতা রয়েছে সেগুলিকে সমালোচনার বিষয়বস্তু করে তুলতেন। এই সমালোচনা সামনাসামনি বিতর্কে কিংবা লেখালিখিতে যেভাবেই প্রকাশ পাক, সব সময়েই তাতে তাঁর মানবতাবাদী দরদী হৃদয়ের স্পর্শ লেগে থাকত।

এ ধরনের সমালোচনার প্রশ্নে মুসলমানদের সংখ্যালঘুসুলভ মানসিকতার স্পর্শকাতরতা তিনি বুঝতেন। যে কারণে ধর্মীয় ব্যাপারে স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখার পক্ষপাতী মুসলমানরাও তাঁর সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠার অবকাশ পেতেন না। তাঁরা বুঝতেন গৌরী আইয়ুবের সমালোচনায়ও তাঁদের বক্তব্য অনুধাবন করার আন্তরিক প্রয়াসে কোনও ঘাটতি থাকত না। ফলে

তাঁর সমালোচনা ছিল অনেক বেশি কার্যকরী। বিশেষ করে তাঁর সংস্পর্শে আসা মুসলিম তরুণদের মধ্যে যুক্তিবাদী মননশীলতা বিকশিত করার প্রশ্নে এই সমালোচনার প্রভাব ছিল অমোঘ। তার ফলে এই পশ্চাদপদ সমাজে সংস্কার কিছু ঘটে থাকলে সেটা ঘটেছে উল্লেখিত মননশীলতার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে। এর জন্য গৌরী আইয়ুবকে সমাজসংস্কারক হিসাবে বড় করে দেখাতে চাইলে তিনি যে-বিশেষণ কখনওই গ্রহণ করতে সম্মত হতেন না সেটাই তাঁর উপর আরোপ করা হয়।

সমাজসংস্কারক হতে না চাইলেও দুঃস্থ মানবতার সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রশ্নে তাঁর কখনওই আগ্রহের অভাব ঘটেনি। সেই ১৯৬৪ সালের বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় থেকে তাঁকে এই ভূমিকায় অক্লান্ত এবং অবিচল থাকতে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এই সময় মৈত্রেয়ী দেবীর সহযোগী হিসাবে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী সম্প্রসারণ সমিতির কাজে তাঁর সুগভীর নিষ্ঠা ছিল আমাদের কাছে প্রেরণার বস্তু। বস্তুত আমাদের ছাত্রাবস্থায় উল্লেখিত সমিতির কাজের মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আন্তরিকতার স্পর্শ আমাদের এমনভাবে অভিভূত করে যে তাঁকে নিতান্ত আপনজন ছাড়া আমরা অন্য কিছু ভাবতে পারিনি। আমাদের তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করার ভাষা আমার আয়ত্তে নেই। ভয়াবহ দাঙ্গার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় আমরা তখন বিহ্বল এবং দিশেহারা। সেই দুঃখের দিনগুলিতে গৌরীদির মতো পরম আপনজনের স্নেহস্পর্শে আমাদের হৃদয়ের ভার অনেকখানি লাঘব হয়ে গিয়েছিল। সম্বোধনে দিদি বললেও আমরা তাঁকে মাতৃস্বরূপিনী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনি।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সময় মৈত্রেয়ী দেবীর সহযোগী হিসাবে অনাথ বালকবালিকাদের লালনপালনে তিনি যে ভূমিকা পালন করেন তাতেও আমরা তাঁকে পেয়েছি আর্ত মানবতার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ জননী রূপেই। কেবলমাত্র অনাথ বালক-বালিকারাই নয়, যে-কোনও আর্ত মানুষ যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তারা সবাই তাঁকে পেয়েছে কল্যাণময়ী জননী রূপে। এরকম কল্যাণময়ী জননীর ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তাঁর নিজের সময় বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। যেসব লেখা তিনি চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর লিখে শেষ করবেন বলে ভেবেছিলেন সেসব করে ওঠার আর সময় পাননি। যতখানি সময় পেয়েছেন তার অধিকাংশই ব্যয় করেছেন তাঁর সংস্পর্শে আসা আর্ত অভাবগ্রস্ত, সমস্যাপীড়িত মানুষদের সেবায়, তাদের ব্যথা-বেদনা লাঘব করার কাজে। জীবনের শেষ দিকটায় এটাই হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখ্য ভূমিকা। তাই তাঁর অনুরাগীদের কেউ কেউ তাঁকে একজন বড় লেখিকা হিসাবে না পাওয়ার কারণে বেদনা অনুভব করেছেন। কারণ, একজন বড়মাপের লেখিকা হয়ে ওঠার জন্য যে ধরনের যোগ্যতা এবং উপকরণের প্রয়োজন হয় সেসব তাঁর প্রভূত পরিমাণেই ছিল। কিন্তু যাঁরা তাঁকে মহৎহৃদয় জননীরূপে পেয়েছেন, যাঁরা তাঁর কল্যাণময়ী রূপের দীপ্তি প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরাই জানেন যে কোনও খ্যাতি-প্রতিপত্তির অধিকারী লেখক কিংবা বুদ্ধিজীবীর তুলনায় তিনি কতখানি উঁচুদরের মানুষ ছিলেন।

অত্যন্ত উঁচুদরের মানুষ ছিলেন বলেই খ্যাতির মোহ বা যশোলিপ্সা তাঁকে কোনও দিনই পেয়ে বসেনি। নিজের কাজকর্ম প্রসঙ্গে পরিকল্পিতভাবে যে ধরনের ভূমিকা নিলে মানুষের নাম দ্রুত সবার নজরে আসে তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে সেগুলি এড়িয়ে চলতেন। আকাশবাণী, দূরদর্শন, খবরের কাগজ ইত্যাদি সংবাদমাধ্যমগুলিকে তিনি যশ অর্জনের জন্য কখনওই ব্যবহার করার কথা ভাবেননি। কোনও কোনও ইস্যুতে নিজের অত্যন্ত ন্যায্য বক্তব্য তুলে ধরার জন্য তিনি

এসবের সহায়তা নিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সংবাদমাধ্যমগুলিকে তার বেশি পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন তিনি কখনও অনুভব করেননি। তিনি নিজে প্রচার না চাইলেও কোনও কোনও বহুলপ্রচারিত পত্রিকা কিংবা টেলিভিশনের বিশেষ বিভাগ তাদের নিজেদের প্রয়োজনে গৌরী আইয়ুবকে পাদপ্রদীপের আলোয় আনার জন্য কখনও কখনও তৎপরতা দেখিয়েছে। কিন্তু কোনও কোনও সময় তাদের অসৌজন্যমূলক আচরণে তাঁর দৃপ্ত মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হত। নির্দিষ্ট সময় পূর্ব-নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও এইসব মিডিয়ার লোক অসময়ে এলে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন। বলতেন, 'এরা হয়ত ধরে নিয়েছে, ব্যক্তিবিশেষকে প্রচারের আলোয় এনে ফেলার ক্ষমতা যেহেতু এদের আছে তাই কৃতার্থ বোধ না করে এদের অসৌজন্যমূলক আচরণে ক্ষুব্ধ হওয়ার অধিকার কারও নেই। কিন্তু এমন মানুষও যে আছে যারা প্রচার পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে নেই, কৃতার্থও হতে চায় না—সেটা এদের বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।' সত্যি সত্যি তিনি যে সেটা বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন এমন অন্তত দুটি ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি নিজে। অথচ সাধারণ আর্ত মানুষের ক্ষেত্রে তাঁর কাছে আসার জন্য সময়-অসময় বলে কিছু ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভাল, তিনি যে মানুষকে শুধু আদর করতেন তাই না, দুষ্টপ্রকৃতির মানুষদের ভর্ৎসনা করতেও তাঁর এতটুকু দ্বিধা ছিল না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভর্ৎসিত মানুষদের দ্বারা তাঁর অখ্যাতি হত। কিন্তু তিনি সেটার পরোয়া করতেন না। গৌরী আইয়ুব জীবিতকালেই সত্যি সত্যিই খ্যাতি-অখ্যাতির ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন।

এরকম হওয়ার কারণ, নিজের জীবনে তিনি যা কিছু পেয়েছিলেন তাতেই পরিতৃপ্ত এবং পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি বিকশিত হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর কোনও অভাববোধ ছিল না। যে ধরনের স্বামী এবং সন্তান নিয়ে যে স্বপ্নের সংসার তিনি কামনা করেছিলেন, তেমন প্রাপ্তি তাঁর জীবনে সম্ভব হয়েছিল অনেকখানি তাঁর নিজের গুণে। আইয়ুবকে তিনি ভালবেসেছিলেন নিজের প্রাণের সবটুকু সুধা উজাড় করে দিয়ে। সেই মহান ভালবাসাকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় গ্রহণ করার যোগ্যতা আইয়ুবেরও কোনও অংশেই কম ছিল না। ভালবাসা তাই শতদল পদ্মের মতো তাঁদের জীবনে বিকশিত হয়েছিল অপার মহিমায়। ভালবাসার এই মহিমাই জীবনের আর সব ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকাকে মহিমান্বিত করে তোলার মূলে তাঁকে নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়েছিল। এভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ার কারণে এবং সচেতন অনুশীলনের ফলে অত্যন্ত উন্নতমানের রুচি-সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করত তাঁর প্রতিটি আচার-আচরণ। কোনও রকম ক্ষুদ্রস্বার্থবুদ্ধি তাঁর চিত্তকে স্পর্শ না করার কারণে যেসব মূল্যবোধকে তিনি অনায়াসে সারাজীবন লালন করে গেছেন, কেবলমাত্র সেই নিরিখে বিচার করলেও বোঝা যায় তিনি কতখানি বড় মাপের মানুষ ছিলেন।

এরকম একজন বড় মাপের মানুষের সঙ্গে প্রায় চৌত্রিশ বছর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকতে পেরেছিলাম বলে নিজেকে আজ কৃতার্থ মনে হয়। এই দীর্ঘ সময়সীমায় তাঁর অপার স্নেহের কত অসংখ্য স্মৃতিই না জমা হয়ে আছে আমার মতো তুচ্ছ মানুষের জীবনে পরম প্রাপ্তির স্মারক হিসাবে। সেসব কথা স্মরণে এলেই এই অধমের কাঙাল হৃদয় উদ্বেলিত হয়, দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। তখনই একথাও মনে হয় এসব সূক্ষ্ম স্নেহস্পর্শের যে আনন্দানুভূতি তা ব্যক্ত করার ভাষা আমার আয়ত্বে নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর স্নেহস্পর্শ ছিল নিরুচ্চার—সহৃদয় হৃদয় সংবাদী। তবে তাঁর টুকরো টুকরো চিঠিপত্রগুলির মধ্যেও প্রায়শই লেগে থাকত তাঁর স্নিগ্ধ হৃদয়ের যাদুস্পর্শ। তাঁর ঘনিষ্ঠ জনমাত্রেই জানেন তিনি চিঠি লিখে মনের কথা ব্যক্ত করতে ভালবাসতেন। তাঁর স্নেহভাজনদের একজন হিসাবে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের

সম্পর্কের কারণে আমার ভাণ্ডারেও জমে উঠেছে এমনই অসংখ্য চিঠি।

আমি নিতান্ত তুচ্ছ মানুষ বলেই সেসব একান্ত ব্যক্তিগত চিঠিপত্র সবার সামনে মেলে ধরতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। আমি জানি, আমার নিজের কাছে মহামূল্যবান হলেও অন্যদের কাছে এসব চিঠির তেমন কোনও তাৎপর্য নেই। তবে 'চতুরঙ্গ' সম্পাদক হিসাবে কোন কোন নিবন্ধ তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে গিয়ে যেসব পত্রালাপের প্রসঙ্গ স্বাভাবিক নিয়মে এসে গিয়েছিল সেগুলি ততটা ব্যক্তিগত ছিল না। সেসব পত্র থেকে বাছাই করে কয়েকটি এই লেখার সঙ্গে জুড়ে দিলাম। হয়ত গৌরী আইয়ুবের মানসিকতা অনুধাবনের ক্ষেত্রে এসব পত্র পাঠকদের পক্ষে কিছুটা সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

সবাই জানেন কেতকী কুশারী ডাইসন লিখিত "রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে" বইটির দীর্ঘ সমালোচনা তিনি লিখেছিলেন চতুরঙ্গ পত্রিকায়। সেই সমালোচনা নিয়ে কেতকী কুশারীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ বিতর্কও ছাপা হয়েছিল এই পত্রিকায়। প্রাথমিক সমালোচনা প্রবন্ধটি তিনি প্রথম লেখেন ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে। লেখা শেষ হলে একটি ছোট্ট চিঠি লিখে তাঁর সন্তানপ্রতিম সেবক পুনদেও মারফৎ তিনি আমাকে ডেকে পাঠান—

রউফ,

লেখাটা খুব দীর্ঘ হয়ে গেছে। তা ছাড়া বোধ হয় একটু কঠোর এবং অশ্লীলও (কেতকী থেকে quote করছি বলে)। তুমি আজ সকালে একটু এসে শুনবে? লেখালিখির ব্যাপার বলে সকালেই ডাকছি। ফোন নম্বরটা হারিয়ে ফেলেছি বলে পুনদেওকেই যেতে হল।

তুমি শুনলে আমি নিশ্চিন্ত হই যে পাঠকরা shocked হবে কিনা। তাছাড়া এই সমালোচনা প্রবন্ধ দুই সংখ্যায় ছাপা যায় কিনা।

গৌরীদি

২১/৫/৯১

এরপর এই সমালোচনা প্রবন্ধ সম্পর্কে তিনি আমাকে পত্র লেখেন মুম্বইয়ে তাঁর পুত্রের কর্মস্থল T. I. F. R. থেকে ১৯৯১ সালের ১৪ই অক্টোবর। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই পত্রটি আমি আমার সংগ্রহের মধ্যে খুঁজে পাই নি। পরবর্তী পত্রেরও স্থান T. I. F. R. এবং তারিখ ৭/১২/৯১

রউফ স্নেহাস্পদেষু,

তোমার ২৪ নভেম্বরের চিঠি আজ সন্ধ্যায় পেয়ে খুব ভাল লাগছে। তুমি যে মনে করে আনন্দবাজারের cutting পাঠিয়েছ এতে আমার খুব উপকার হল। আশাকরি আমার আগেকার চিঠি (১৪ই অক্টোবরে লেখা) তুমি পেয়েছিলে। কেতকীর জবাব কি সমস্তটাই ডিসেম্বরে ছাপছ না ডিসেম্বর ও জানুয়ারি-তে? তাহলে আমার প্রত্যুত্তর কি জানুয়ারিতে ছাপবে না ফেব্রুয়ারিতে please একথাটা জানিও একটা post card লিখে। আমার আবার operation-এর তারিখ দিয়েছে। জানি না এবারেও হবে কিনা। যদি হয় তোমাকে পরে জানাব। তবে আমার প্রত্যুত্তর তার আগেই লিখে ফেলার চেষ্টা করব। আমার মন নানা কারণে এমন অস্থির হয়ে আছে যে কি যে লিখব জানি না। বিশেষ করে বইটিও হাতে নেই।

ছোটী* ও আফরোজ* ভালো আছে তো? নাতনীর সঙ্গে নানা গল্প করতে করতে মনে হয় আফরোজকেও তোমরা গল্প বলো তো? অবশ্য দুজনেই হয়ত ক্লান্ত থাক সারাদিনের পর। তবু তাকে একটু মানসিক সঙ্গ দিও। আমি শ্রেয়াকে মাসদেড়েক আগে রামায়ণের গল্প বলতে শুরু

---

* স্ত্রী ও *পুত্র

করেছিলাম। ও এখন আর থামতে দিতে চায় না। সব সময় ওই নিয়েই এত প্রশ্ন করছে যে পূষণ বলছে যে আমি নাকি একটা BJP-র লোক তৈরি করছি বাড়িতে। আমি বলছি, খুব ছেলেবেলা থেকেই antidote দিয়ে দিচ্ছি। সীতার অগ্নিপরীক্ষা. বালীবধ ইত্যাদি নিয়ে সে এখনই আমাকে প্রশ্ন করছে।

আমি নভেম্বরের "চতুরঙ্গ" এখনও পাইনি। অবশ্য চিঠিপত্র আসতে মাঝে মাঝে ১৫/২০ দিন দেরি হয়ে যায় দেখছি। আমার লেখা কোন্ তারিখের মধ্যে পৌঁছাতেই হবে জানিও।

তোমরা আমার স্নেহ ও শুভেচ্ছা জেন।

গৌরীদি

পুনশ্চঃ আমার সমালোচনার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া আর কারুর কাছে থেকে এসেছিল কি?

এরপর উল্লেখিত সমালোচনা প্রবন্ধ এবং বিতর্ক সংক্রান্ত আরও কিছু ছোট ছোট চিঠি লেখার পর T. I. F. R. থেকেই তিনি অপেক্ষাকৃত একটি বড় পত্র লেখেন ১৯৯২-এর ৩০ জানুয়ারি।

স্নেহের রউফ,

জানুয়ারি মাসের 'চতুরঙ্গ'-ও এসে পৌঁছে গেছে ২/৩-টি of print সহ। অনেক ধন্যবাদ। আমার জবাবটা আমি মোলায়েম রাখতে চেয়েছিলাম, তবু দুচারটা কথা কেতকী চুপচাপ হজম করবে বলে মনে হয় না। ওর স্বভাব যতটা জানি, তর্ক চালিয়ে যেতে চাইবে। তাই ওর বক্তব্য ও বলুক এবং তুমিও ছাপতে দ্বিধা কোর না। তবে আমি তর্ক করে যেতে আর উৎসাহ বোধ করছি না—যদি না কোনো তথ্যগত ভুল করে ও। কিংবা খুব offensive হয়।

গতকাল কামালের চিঠি পেয়ে জানলাম যে কেতকী এখন কলকাতায় এবং গৌরকে*[১] দিয়ে তোমায় ফোন করিয়েছিল। ও যে আসবে সে আমি শুনে এসেছিলাম। এবার নাকি কোন foundation থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এসেছে; উদ্দেশ্য : প্রমাণ করা যে রবীন্দ্রনাথ রংকানা ছিলেন। জানি না সেই project নিয়েই কাজ করছে কিনা। সম্ভবত আগামীকাল গৌরের পুত্রের বিয়েতে গিয়ে কেতকীর সঙ্গে তোমার দেখাও হয়ে যেতে পারে। তখন সে তোমায় ধরবে, কেন আমার মতো biased লোককে দিয়ে তার যুগান্তকারী বইটির সমালোচনা লেখান [illegible] বিরামবাবু*[২] কি সত্যিই বিতর্কে যোগ দেবেন? কেতকীর লেখা পড়ে ওর অনুরাগীরাও কেউ কেউ ওর পক্ষে অবতীর্ণ হতে পারেন। আমি ফিরে যাবার পর শিববাবুর*[৩] যথার্থ মত ([illegible] বইটা সম্পর্কে) জানতে চাইব ওঁর কাছে। আমার নিজের ধারণা যে এঁরা কেউ কেউ ভদ্রতার খাতিরে প্রশংসা করেছেন এবং ওর 'সাহসিকতা'-র জন্য মতামতের জন্য বোধ হয় ততটা নয়। কিন্তু আনন্দ পুরস্কার সম্বন্ধে বিস্ময় রয়েই গেছে আমার মনে। অবশ্য [illegible] মিতাদির*[৪] (অমর্ত্যের মা) ধারণা যে বইটা তাঁরা ভাল করে পড়েও দেখেননি। সে কি হতে পারে?

যাক তোমরা আশা করি ভাল আছ। ....

আমি একটি পায়ের operation করিয়েই এ যাত্রা বিরত হয়েছি। কারণ এই মেরামত করা মহামূল্যবান পাখানিকে নিজের বশে আনতে খুব পরিশ্রম করতে হচ্ছে প্রতিদিন। তবু শিগগির সম্পূর্ণ বশে আসবে না। তাই এই অবস্থায় অন্য পাটিকেও ডাক্তারদের হাতে সমর্পণ করলে

*[১] সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ।

*[২] কবি বিরাম মুখোপাধ্যায়।

*[৩] বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক প্রফেসর শিবনারায়ণ রায়.

*[৪] নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য

আরো অনেক মাস আমাকে শয্যায় লগ্ন হয়ে থাকতে হত। এখন আশা করছি এপ্রিল মাস নাগাদ ফিরতে পারব—তাও প্রধানত ওই পচা, না-মেরামত করা পায়ের সাহায্যেই।

তোমরা সবাই ভাল থেক। —গৌরীদি

এরপর ১৯৯২ সালের শেষদিকে ২৩ নভেম্বর তারিখে পার্ক সার্কাসে তাঁর পার্ল রোডের (তিনি লিখতেন পাল্টে যাওয়া নামটাই ড. এ. এম ও গণি রোড) বাসস্থান থেকে মাত্র কয়েকশ গজ দূরে আমার ঠিকানায় ডাকযোগে তিনি যে পত্র পাঠিয়েছিলেন সেটি উল্লেখ করেই এই চিঠিপত্রের প্রসঙ্গ শেষ করব।

স্নেহের রউফ,

টেলিফোনে বলতে লজ্জা করছে বলেই চিঠি লিখছি।

চতুরঙ্গের জন্য "বাঙালীত্বের ভাগ বাঁটোয়ারা" লিখতে শুরু করেছি অন্তত দশ দিন আগে। কিন্তু আজ পঞ্চম বার শুরু করেও মনের মতো হচ্ছে না। আরও কিছু পড়ে নেওয়া দরকার মনে হচ্ছে বলে নীহার রায়ের বাঙালির ইতিহাস দুখণ্ড নিয়ে বসেছি। যদি একটানা লেখাপড়া করে যেতে পারতাম তাহলে কাজ এগোত। কিন্তু বার বার বাধা পড়ে, খেই হারিয়ে যায়, কি ভাবছিলাম ভুলে যাই।

তাই তোমার কাছে নিবেদন তুমি আমাকে আনন্দের সঙ্গে পড়তে লিখতে এবং ইচ্ছামতো সময় নিতে দাও। এবার যা লিখব, চতুরঙ্গের জন্যই লিখব। কিন্তু কেবলই যদি মনে হয় দেরি হয়ে যাচ্ছে রউফ রাগ করবে তাহলে আমার লেখাপড়ার আনন্দ চলে যায়। তোমার সঙ্গে ঘাতক-কাবলিওয়ালা, চোর-পুলিশের সম্পর্ক হয়ে যায়। সেটা বড় কষ্টকর। তাই সবটা বুঝিয়ে লিখলাম।

এই চিঠিটুকু লিখতে লিখতে তিনটি ফোন এল। একটা ঢাকা থেকে কাতর প্রার্থনা "চাচী আমার জন্য O positive পাঁচজন straight donor জোগাড় করেছেন তো? যা খরচ করতে হয় করবো।" চাচীকে এখন Countess Dracula হতে হবে।

অন্য ফোনের বক্তব্য : হাই কোর্টের injunction*এর বিরুদ্ধে যে petition এসেছে তার xerox কপি করে পাঠাচ্ছি পড়ে আপনার মত দেবেন।

তৃতীয়টা : "সন্দেশ" অফিসে একটা চিঠি লিখে রাখবেন আমরা কোন কোন সংখ্যা পাইনি—তাহলে ড্রাইভার এখনই গিয়ে ওটা নিয়ে আসবে।

এইটুকু একটানা লিখেছি অবশ্য। কিন্তু এখন বইখাতা তুলে রেখে ফাইফরমাস খাটতে হবে। রাগ কোর না।

গৌরীদি

এভাবে 'ফাইফরমাস খাটতে হবে' বলে যতই তীর্যক মন্তব্য করুন, এটা তাঁর আসল মনোভাবের পরিচয় নয়। তাঁর প্রশ্রয় পাওয়ার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই জানেন এরকম হাজার ফাইফরমাস তিনি খাটতেন অক্লান্তভাবে হাসিমুখে। যে দরদভরা অন্তঃকরণের কারণে সেটা সম্ভব হত তার সম্যক পরিচয় যতই দেওয়ার চেষ্টা করি না কেন, কেবলই মনে হয় অসম্পূর্ণ রয়ে গেল সেই পরিচয়।

[আবদুর রউফ বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক ও 'চতুরঙ্গ' সম্পাদক]

*'খেলাঘর' সংক্রান্ত মোকদ্দমার ব্যাপার।

মানবিকতাই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান

অমিতা চক্রবর্তী

গৌরী আইয়ুবের সম্বন্ধে কিছু লিখতে হবে তার প্রয়াণের পরে এ কথা কখনও ভাবিনি। কিন্তু সেই কঠিন বেদনাদায়ক সত্যটা মেনে নিতে হয়েছে। সহকর্মিণী গৌরী আমাদের পরম আপনজন ছিল।

তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সূত্র ধরেই বলি। সম্ভবত ১৯৬২ সাল—শ্রীশিক্ষায়তন কলেজে তার তিন বছর আগে যোগ দিয়েছি। হিন্দী বিভাগের একটি আলোচনা চক্রে বাঙলা ভাষার বিশিষ্ট কয়েকজন সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ জানানোর ভার পড়েছিল আমার ওপরে। সেই সূত্রে আবু সয়ীদ আইয়ুবের পার্ল রোডের বাড়িতে গেলাম। পদার্থ বিজ্ঞান এবং দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিত, রবীন্দ্রনাথে সমর্পিত প্রাণ আবু সয়ীদ আইয়ুব তখন সাহিত্য জগতে একটি বিশিষ্ট উজ্জ্বল নাম। শোনা গেছে, শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা-কালে গৌরী দত্তের সঙ্গে আইয়ুবের পরিচয় এবং বয়সের বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও গৌরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বন্ধন। খুব কৌতূহল ছিল জানতে, কেমন সেই মহিলা যিনি আবু সয়ীদ আইয়ুবের হৃদয় জয় করেছেন। দরজা খুলে যিনি সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন তিনিই স্বয়ং গৌরী আইয়ুব। নাতিদীর্ঘ আকৃতি, লাবণ্যময়ী গৌরী স্মিত হাসিতে অনুচ্চবচনে মনের মধ্যে এমন একটা ছাপ রেখে দিলেন যে মনে হ'ল ইনি আইয়ুবের যোগ্য সহধর্মিণী। সম্ভবত, তার পরের বছরেই গৌরী আমাদের কলেজে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে এসে যোগ দেন আর একটানা ত্রিশ বছর অধ্যাপনার পরে অবসর গ্রহণ। অল্প সময়ের মধ্যেই সাধারণ পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হ'ল—সম্বোধন "আপনি" থেকে "তুমি"তে পৌঁছতে দেরি হয়নি আর ক্রমশঃ সেই বন্ধুত্ব গভীর এবং নিবিড় হয়ে ওঠে।

বাহুল্যবর্জিত রুচিসম্মতভাবে সাজানো পরিচ্ছন্ন মাঝারি মাপের যে বসবার ঘরখানিতে দেশ-বিদেশের মনীষী-সাহিত্যিক-শিল্পী সমাগম হত পার্ল রোডের বাড়িতে সেখানে আমাদেরও ছিল অবাধ বিচরণ। আইয়ুবের জীবিতকালে তো বটেই, পরবর্তীকালেও ওই ঘরখানিতে কখনো উপলক্ষে এবং কখনো বিনা উপলক্ষে গৌরীর উদ্যোগে আমাদের বৈঠকের আয়োজন হ'ত মাঝে মাঝেই—তা সে গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনাই হোক, কিংবা নিছক গান-বাজনা গল্পের আসরই হোক। চা-কফি সহযোগে গৌরীর হাতে তৈরি কাবাব ছিল অন্যতম আকর্ষণ। আদর্শ শিক্ষিকা হিসেবে ছাত্রীদের সঙ্গে তার ভাব-বিনিময় ছিল সত্যিই মনে রাখার মত। অতি সাধারণ বেশবাসে গৌরীর মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তাকে অসাধারণ মর্যাদায় ভরে রাখত। সংসারে তাকে দেখেছি কল্যাণী মূর্তিতে। বৌদ্ধিক জগতে গৌরী ছিল আক্ষরিক অর্থে আইয়ুবের সচিব-সখী-প্রিয়শিষ্যা—আবার রুগ্ন স্বামীকে সেবায় ও পরিচর্যায় ভরিয়ে রাখাও ছিল তার অন্যতম কর্তব্য। অতিথি-অভ্যাগতদের দিকে যেমন ছিল তার সজাগ দৃষ্টি, তেমন ভাবনা-চিন্তা ছিল তার সংসার পরিচালনায় নিযুক্ত মানুষ জনের প্রতি, বিপন্ন মানুষকে আশ্রয় দেওয়া, সমস্যা জর্জরিত মানুষের আবেদন মন দিয়ে শুনে যথাসাধ্য তার সমাধানের কোনও উপায় বার করার চেষ্টা—এ সবই গৌরী করেছে অনায়াসে। কিন্তু অন্যায়-অবিচার মানবিকতার অসম্মান গৌরীর দৃষ্টি এড়ায়নি কখনও—সেখানে সে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে—তার শাণিত কলম প্রতিবাদ-পত্র লিখেছে দৃঢ় ভাষায়। অধ্যয়ন অধ্যাপনার সঙ্গে সমাজ-সেবার কাজে সে যুক্ত ছিল নানাভাবে। মধ্যমগ্রামে বাদু'র কাছে অনাথ শিশুদের আশ্রম "খেলাঘর"-এর প্রতিষ্ঠা-কাল থেকে মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে

গৌরী কাজ করে গেছে অক্লান্ত ভাবে। মৈত্রেয়ী দেবীর মৃত্যুর পরেও সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে ঐ কাজে নিযুক্ত রেখেছিল আর্থ্রাইটিস্-এর প্রচণ্ড যন্ত্রণাকে সহ্য করে।

গৌরীর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, যাঁরা তার সঙ্গে আরও নানা গঠনমূলক কাজে যুক্ত ছিলেন তাঁরা গৌরীর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গৌরীর সব মতামতই যে অভ্রান্ত ছিল তা ঠিক নয়। কিন্তু তাতে একসঙ্গে কাজ করতে বা বন্ধুত্ব বজায় রাখতে কোনও বাধা সৃষ্টি হয়নি।

সুন্দর পরিচ্ছন্ন হাতের লেখায় অজস্র চিঠি-পত্র লিখেছে গৌরী বন্ধু-আত্মীয়-পরিজনকে। সুন্দর বাংলায় লেখা সাহিত্যকর্ম হিসেবে গণ্য তার প্রকাশিত গল্প-সংকলন, নানা পত্র-পত্রিকায় সুচিন্তিত প্রবন্ধ আর পৌত্রী শ্রেয়াকে কেন্দ্র করে তাব একটি অনবদ্য রচনা "এই যে অহনা"। প্রচণ্ড অসুস্থতায় যখন তার লেখার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে গেল তখন তার পরম স্নেহভাজন ডাক্তার কামাল হোসেন "আমাদের দু জনেব কথা"-র কয়েকটি অধ্যায় অনুলেখক হিসেবে লিপিবদ্ধ করছিলেন কিন্তু তা অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

নিরীশ্বরবাদী গৌরী কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করেনি—মানবিকতাই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান। মরণোত্তর দেহ-দানে এই মহৎ সার্থক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

সৌজন্যে ঃ রবীন্দ্রভাবনা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

[শ্রীমতী অমিতা চক্রবর্তীর পেশা অধ্যাপনা, নেশা সমাজসেবা—গৌরী আইয়ুবেব সহকর্মী ছিলেন]

মধুর তোমার শেষ যে না পাই

অপূর্ব বিশ্বাস

আবু সয়ীদ আইয়ুবের লেখা পড়েছি সেই প্রান্ত কৈশোর থেকেই—আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, পান্থজনের সখা, পথের শেষ কোথায়। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সৃষ্টিকে এমন দার্শনিক গভীরতায়, এমন বহুস্তরীয় নান্দনিকতায় উল্টে পল্টে দেখা—একেবারে মুগ্ধ বিস্মিত অভিভূত হয়ে গেছি। আরও বড় হয়ে কখনো কখনো গৌরী আইয়ুবের লেখা প্রবন্ধ পড়েছি। চিন্তনের স্বচ্ছতা, ভাবনার পারম্পর্য, জীবন সম্পর্কে প্রত্যয়ী আশাবাদ তাঁর লেখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখেছি।

আইয়ুবের স্মৃতি বিজড়িত সেই বাড়িতে গৌরী আইয়ুবের কাছে যাবার একটা সুযোগ হঠাৎই এসে গেল সাতানব্বইএর শীতে। এর বেশ কিছুদিন আগে রবীন্দ্রগানের কিংবদন্তী শিল্পী নীলিমা সেন প্রয়াত হয়েছেন। শ্রীমতী অরুন্ধতী দেব নীলিমা সেনের জীবন ও গান নিয়ে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করছেন তখন। তাতে নীলিমা সেনকে লেখা আবু সয়ীদ আইয়ুবের একগুচ্ছ চিঠি প্রকাশিত হবে, গৌরী আইযুবকেও লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে। অথচ তখন তিনি আর্থাইটিসে পঙ্গুপ্রায়, হাতে কলম ধরার ক্ষমতা নেই। অনুলেখক হিসেবে আমাকেই পাঠানো হ'ল বেকবাগানের পার্ল রোডের সেই বাড়িতে।

শীতের বিকেল। রোদ্দুর মরে এসেছে। প্রায়ান্ধকার ঘরে জানলা দিয়ে গোধূলির আলো এসে পড়েছে। বিছানায় বসে আছেন গৌরী আইয়ুব। পুরু লেন্সের পিছনে তাঁর সেই সুখ্যাত সৌন্দর্য কিছুটা আড়াল। মুখে অমলিন একটুকরো হাসি। 'বোসো—তুমিই বললাম, তুমি তো অনেক ছোট।' আমি কথা বলতে পারি না। তার কণ্ঠস্বরে নম্র এক ঋজুতা ছড়িয়ে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের গানের কথা মনে পড়ে যায়। —'তুমি আমাকে কী বলবে, গৌরী মাসি?' আমি আমতা আমতা করি, 'বাচ্চুদি (নীলিমা সেন) কে তো দিদি বলতাম। —'তাহলে আমিও তোমার গৌরী দি।'' মুহূর্তের মধ্যে বড় আপন হয়ে যান গৌরী আইয়ুব। আমাকে বিস্মিত করে দিয়েই হঠাৎ বলে ওঠেন, 'তুমি তো অনেকক্ষণ আগে বেরিয়েছ কলেজ স্ট্রীট থেকে, নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়ে গেছে? আগে কিছু খেয়ে নাও, তারপর কাজ শুরু হবে।'

সেই সন্ধ্যায় কিন্তু আমরা এক কলমও লিখিনি। নিঃসঙ্গ পীড়িত মানুষটির চারপাশে কেমন আলোর মতন ছড়িয়ে থাকে আশ্চর্য প্রসন্নতা আর মাতৃময়তা। তিনি কথা বলেন নীলিমা সেনের গান নিয়ে, গায়কি নিয়ে, তার কণ্ঠের অতুলন বিষাদ নিয়ে, দুঃখের গানে তাব আত্মনিবেদন নিয়ে। গৌরী আইয়ুব রবীন্দ্রগানের সমালোচক নন, ব্যাখ্যাতা বা তাত্ত্বিকও নন, তবু তাঁর ভাবনায় তাঁর বলায় মিশে থাকে বোধ, মনন আর সংরক্ত অনুভব। প্রগলভতা আর পল্লব গ্রাহিতা নিয়ে আমি ও নীলিমা সেনের একটি গান নিয়ে কথা বলতে থাকি। গৌরী আইয়ুব মন দিয়ে শুনতে থাকেন, তারপর একসময় খুব ধীরে ধীরে গেয়ে ওঠেন, 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা'—কেবল এই টুকু মাত্র। তারপর বলতে থাকেন, তিন-চার দশক আগে গাওয়া নীলিমা সেনের একটি গান-'এসো শরতের অমল মহিমা' নিয়ে একদিন টানা দু-তিন ঘন্টা ধরে আইয়ুবের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল। আইয়ুব বলেছিলেন, তাঁর ইচ্ছে করে ওই গানের রেকর্ডের মধ্যে ঢুকে যেতে। গৌরী আইয়ুব এখনো যেন স্পষ্ট দেখতে পান সেই সব উদ্ভাসিত দিনগুলিকে। কিছুটা বিষণ্ণ দেখায় তাঁকে। খুব ধীরে ধীরে কথা বলেন তিনি, তবু তার মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরোতে চায় রবীন্দ্র অনুভবের সেই তাপ আর লাবণ্য, সেই আনন্দ-বিষাদ, সেই উজ্জীবন, যে উজ্জীবন বাঁচার অর্থ বদলে দেয়। আমার ক্রমশ কেমন ঘোর লেগে যায়। নীলিমা সেনের গায়ন, রবীন্দ্রগান আর গৌরী আইয়ুব যেন একাকার হয়ে যেতে থাকেন।

এর পর থেকে বেশ কয়েকবার গেছি তাঁর কাছে। বিকেলের বিষণ্ণ আলোয় তাঁকে কেমন অন্যরকম দেখায়। কাগজ কলম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসি। গৌরী আইয়ুব বলতে থাকেন। শুরু হয় তার আশ্রমিক জীবনের প্রথম দিনগুলির স্মৃতিকথা দিয়ে, যে স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, আশ্রমকন্যা নীলিমা গুপ্ত। গৌরী আইয়ুব বলেন, নীলিমা সেনের যাপনে, প্রাণনে ও মননে রবীন্দ্রনাথের পরিপ্লাবী প্রভাবের কথা। তাঁর লেখার বিষয় ছিল এইটিই। কত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ভাবনার কত অন্তর্বয়ন মিশে থাকে তাঁর অনায়াস বলার সঙ্গে। লিখতে লিখতে কখনো হোঁচট খাই, তাকে আর একবার বলতে অনুরোধ করি। এতটুকু বিরক্ত হ'ন না, আবারও বলেন। কখনো ঈষৎ ক্লান্ত দেখায় তাঁকে, বলেন, 'আজ এই পর্যন্ত থাক।' কখনো সলজ্জ সংকোচে বলেন, 'আমার বসতে বড় কষ্ট হচ্ছে, একটু শুয়ে শুয়ে বলি। কিছু মনে কোরো না।' আবারও বিস্মিত হই এই বিরল সৌজন্যে। কোনো কোনো দিন মাত্র একপাতাই লেখা হয়ে ওঠে না। কাগজ কলম সরিয়ে রাখি। তাঁকে কথায় পেত সে সব দিন। ফিরে ফিরে আসে শান্তিনিকেতনের স্মৃতি। ছাতিম তলা, আম্রকুঞ্জ, শালবীথি বকুলবীথি, নয়তো আশ্রম ছাড়িয়ে লাল বাঁধ, গোয়াল পাড়ার পথ-খোয়াই—কোপাই। তাঁকে বড় উদ্ভাসিত দেখায়, আনন্দিত দিনগুলোর স্মৃতিতে তিনি ডুব দেন। মনে মনে আমিও তাঁর কথা শুনতে শুনতে যেন উধাও পথের অভিমানে হারিয়ে যাই।

মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই বড় আপন হয়ে যান গৌরী আইয়ুব। এক বিকেলে তাঁর কাছে নিয়ে যাই আবৃত্তিকার বন্ধু অমিতাভ বাগচীকে। সেদিন আর লেখা হয় নি। অমিতাভর আবেগী কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দের কবিতা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। সেই সন্ধ্যাতেই গৌরী আইয়ুবের আর একটি পরিচয় পেয়ে আপ্লুত হই। একটি প্রতিবেশী অল্পবয়সী অভাবী মেয়ে, এর ওর বাড়ি ফাই-ফরমাশ খেটে যার দুমুঠো খাবার জোটে, তার হাত ভেঙেছে। চিকিৎসা বিভ্রাটে হাড় ভুলভাবে জোড়া লেগেছে, অসহ্য যন্ত্রণা, আবার অপারেশন করে ঠিকমতন জোড়া দিতে হবে। এদিকে এতটুকু সঙ্গতি নেই। ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন গৌরী আইয়ুব। ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, আমরা কি মেয়েটির জন্য কিছু করতে পারি? আমরা মেয়েটিকে এক চিকিৎসক বন্ধুর কাছে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিই। আবেগসম্মত কণ্ঠে গৌরী আইয়ুব বলেছিলেন, 'তোমরা ঈশ্বর প্রেরিত।'

আবার কোনো দিন হয়তো লেখা থামিয়ে দিয়ে বলতেন, অনাথ আশ্রম 'খেলাঘরে'র কথা। সেই সময় অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি কোনো কোনো রবিবার পৌঁছে যেতেন সুদূর মধ্যমগ্রামের উপকণ্ঠে 'খেলাঘরে'। কোনো কোনো দিন আলোচনার গণ্ডি ছড়িয়ে পড়ত ব্যক্তিমানুষ আর সামাজিক মানুষের দ্বান্দ্বিকতায়। সেই মুহূর্তে বেরিয়ে আসত এক যুক্তিবাদী বিশ্লেষণাত্মক মন। সাম্প্রদায়িক শক্তির ফ্যাসীবাদী উন্মত্ততায় তিনি ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত। এই বহমান সময় আর সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী প্রবল আগ্রহ তাঁর!

কখনো কখনো তাঁকে একেবারে ব্যক্তিগত অনুভবের কথা বলেছি, সংকটের কথাও। মন দিয়ে শুনেছেন তারপর নিজের ভাবনার কথা বলেছেন। কখনো বলেছেন সুদূর শৈশবের পাটনার দিনগুলির কথা, বাবা অধ্যাপক ধীরেন্দ্রমোহনের কথা। বাবার কথা বলতে গিয়ে কেমন আবেগী হয়ে উঠতে দেখেছি তাঁকে। বাবার সঙ্গে তাঁর বিরোধ আর দূরত্বের কথা বলতে বলতে হঠাৎ বলে উঠেছিলেন 'আমিও তো আমার বাবারই মেয়ে।' কেমন কোমল আভা ছড়িয়ে পড়তে দেখেছি প্রৌঢ় মানুষটির চোখে-মুখে। সেই বাবার মৃত্যুশয্যায় একবার গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। দুজনের চোখের জলে সেদিন ভিন্ন এক আবেগ নাট্যের পালা রচিত হয়েছিল।

তাঁর ভাবনায় তাঁর কথায় বারবার ফিরে ফিরে আসেন রবীন্দ্রনাথ। অনুভব করতাম সেই অসুস্থ মানুষটি কী প্রবলভাবে বেঁচে আছেন! যেন প্রতিদিন তিনি একটু একটু করে জীবনের যোগ্য হয়ে উঠতেন। দিন যায়। পার্ল রোডের দিকে কতদিন যাওয়া হয় না। হঠাৎ খবর আসে গৌরী আইয়ুব মৃত্যুশয্যায়। এক বিকেলে ছুটে যাই। স্বভাবতই সেদিন তাকে দেখবার তাঁর কাছে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। পাশের ঘরে বসে ছিলাম অনেকক্ষণ, কথা বলছিলাম তাঁর শান্তিনিকেতনের বন্ধু আরতিদির সঙ্গে। আর সমস্তক্ষণ জুড়ে মনে হয়েছে যেন তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছি, অনুভব করতে পারছি তাঁর স্নেহস্পর্শ।

এখনো খুব মনে পড়ে তাঁকে। হাতে তুলে নিই, তার নিজের হাতে লিখে দেওয়া স্নেহ উপহার—'এই যে অহনা।' তাঁর শেষ প্রকাশিত বই। আর মনে হয় যেন এই অবনষ্ট সময়ে, এই অপম্রিয়মাণ মূল্যবোধের অন্ধকারে, এই প্রচারসর্বস্ব কোলাহলে গৌরী আইয়ুব খুব সন্তর্পণে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তাঁর প্রাণের প্রদীপটি, যার শিখায় সৌজন্য, সততা আর মানবিকতা আলো ছড়ায়। যার উত্তাপটুকু নিয়ে এখনো জীবনকে ভালোবেসে বলতে পারি—"মধুর তোমার শেষ যে না পাই।"

[অপূর্ব বিশ্বাস সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, চলচ্চিত্র জগতে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং হিন্দু স্কুলের শিক্ষক]

গৌরী আইয়ুব : এক অনন্য ব্যক্তিত্ব

কামাল হোসেন

But the fountain sprang up and bird sang down
Redeem the time, redeem the dream
The token of the world unheard, unspoken

—T S Eliot

পৃথিবীর অনেক ঋতুর জল-বায়ু, রৌদ্র-ছায়া অতিক্রম করে একটি স্বনির্মিত পথ ধরে তিনি হেঁটে আসছিলেন। স্মরক স্তম্ভে কোনও অমর অক্ষর লেখা হল কিনা, সেদিকে তাকানোর মতো অবকাশ কখনও পাননি। ঘরসংসার, কর্মজীবন, সাহিত্যচর্চা কিংবা সমাজসেবা—সব কিছুর অজস্র ব্যস্ততার সান্নিধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত ছুটি নিয়ে চলে গেলেন আমাদের গৌরীদি—গৌরী আইয়ুব।

আমরা, যারা গৌরীদির কাছাকাছি আসার সৌভাগ্য লাভ করেছি, আমার ধারণা, আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করি, 'আমাকেই তিনি সব থেকে বেশি ভালবাসতেন।' আসলে তাঁর হৃদয়টি ছিল এত উদার, সকলের প্রতি সমানভাবে স্নেহ-ভালবাসা বিতরণে সেখানে কোনও কার্পণ্য ছিল না।

আমার সব সময় যেটা আশ্চর্য লেগেছে, যে-যেমন মানুষ, তার বুদ্ধিবৃত্তির সেই স্তরে দাঁড়িয়ে তিনি তার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলেছেন, মিশেছেন। ব্যক্তিত্বের এই ফ্লেকসিবিলিটি খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁর বন্ধু তালিকায় অম্লান দত্ত, গৌরকিশোর ঘোষ, শিবনারায়ণ রায়, আরতি সেনের মতো বুদ্ধিজীবীর দেখা যেমন আমরা পাই, তেমনই খুব সাধারণ গৃহবধূ কিংবা গৃহপরিচারিকা মনার মাও তাঁর কাছে মনের সব সুখ-দুঃখের গল্প শুনিয়ে তৃপ্তি পেতেন। সকলের সঙ্গেই কথা বলার সময় মুখে উপস্থিত সেই পরিচিতি মিষ্টি হাসি। আর তাঁর আতিথ্যের আন্তরিকতা থেকে দুই বাংলার কেউ কখনও বঞ্চিত হয়নি। একথা অবশ্যই বলা যায়।

গৌরীদির কথা স্মরণে এলেই তাঁর ব্যক্তিত্বের সেই সব বহু বর্ণের ছটা আমাকে সম্মোহিত করে রাখে। তিনি ছিলেন জনপ্রিয় অধ্যাপিকা, খ্যাতনামা সমাজসেবিকা। একসময় কলকাতার মুসলমান বস্তিগুলিতে মেয়েদের কাছে গিয়ে বুঝিয়েছেন জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকারিতা। 'জাতীয় সংহতি'র উপর ব্যাপক আলোচনার সূচনা করে একই মঞ্চে তিনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন বিতর্কিত শিখ বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে মার্কসবাদী শিক্ষাবিদকে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তরুণ ছেলেরা যাতে ঠিক মতো তৈরি হয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যোগ দিতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের ব্যাপারেও তিনি সরাসরি সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। জরুরি অবস্থার সময় যে-কজন ভারতীয় বুদ্ধিজীবী স্বাধীন মনন আর আত্মা নিয়ে বাহুবলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ভীত হননি, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদে এসপ্লানেড ইস্টে অসুস্থ হাঁটু নিয়ে লাঠি হাতে উপস্থিত থাকেন তিনি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার নির্বোধ, নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবাদে বিপন্ন মানবতার পাশে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে একত্রিত করতে সবার আগে তিনি এগিয়ে এসেছেন।

অথচ এত কিছু কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে কোথাও নেই আত্মপ্রচারের উৎকট উৎসাহ কিংবা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীসুলভ উন্নাসিকতা। বস্তুত মনীষী দার্শনিক আবু সয়ীদ আইয়ুবের বিদুষী স্ত্রী হিসাবে তাঁর যত না পরিচিতি, নিজস্ব চারিত্রিক ঋজুতায় একালের বাঙালি সমাজজীবনে

কিংবদন্তির মতো এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁকে আমরা চিনি।

জন্ম বিহারের পাটনা শহরে। ১৯৩১-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি। বাবা দর্শনশাস্ত্রের প্রখ্যাত অধ্যাপক ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত। মা নিরুপমা দেবী। গঙ্গার কাছাকাছি পাটনার বাড়ির গল্প অনেকবার তাঁর কাছে শুনেছি।

১৯৪৭-এ বাঁকিপুর গার্লস হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। ১৯৪৮-এ মগধ মহিলা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট। পরের বছর পাটনা কলেজে ফিলসফিতে অনার্স নিয়ে বি.এ.ক্লাসে ভর্তি হলেন। এসময় কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন 'স্টুডেন্ট ফেডারেশন'-এর প্রতি আকৃষ্ট হন। এই আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্য বাঁকিপুর সেন্ট্রাল জেলে দু'দিন কারাবরণও করেন।

গান্ধীবাদী বাবা তাঁর মেয়ের এই বামমার্গী আচরণ মোটেই মেনে নেন না। এই ঘটনার পরেই পাটনা কলেজে পড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। অনেক সাধ্যসাধনার পর দুটি সুযোগ তিনি দেন। হয়, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, নাহলে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। খুব দ্রুত মনস্থির করে গৌরীদি সেদিন ভেবেছিলেন, 'Apolitical হলেও শান্তিনিকেতনেই বরং নিঃশ্বাস ফেলা যাবে'

১৯৫০-এর জুন মাসে তিনি শান্তিনিকেতনে এসে ভর্তি হলেন দর্শন বিভাগে। সে সময় অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুবও শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রীর বয়সের ব্যবধান ছিল। তবু কোন অদৃশ্য রসায়নে দুজন মানব-মানবীর মন কাছাকাছি এসে যায়, তার সব রহস্যের সমাধান বোধকরি ঈশ্বরেরও জানা নেই। তাঁদের প্রেমের গভীরতা জীবিতকালেই মিথ-এর সৃষ্টি করেছিল।

এক বছরের মধ্যেই অসুস্থ আইয়ুব বিশ্বভারতী ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। ১৯৫২ সালে গৌরীদি বি.এ. পাশ করলেন। ১৯৫৩ সালে বিনয় ভবন থেকে বি.টি.। ইতিমধ্যে আইয়ুবের সঙ্গে কন্যার সম্পর্কের কথা পিতার কানে পৌঁচেছে। সেজন্য তিনি চাইছিলেন না মেয়ে কলকাতায় এম এ. পড়তে আসুক। পরিবর্তে মেয়েকে ইংল্যান্ড পাঠাতে চেয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার জন্য।

বিদেশে না গিয়ে ১৯৫৪ সালে আসানসোলের কাছে ঊষাগ্রামে, মেথডিস্ট মিশন স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিলেন। সেখান থেকে কলকাতায় আইয়ুবের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। প্রায় প্রতি শনিবার রাত ন'টা সাড়ে ন'টার ট্রেনে তিনি চাপতেন। ভোরবেলায় ট্রেন এসে পৌঁছত হাওড়া স্টেশনে। তারপর ট্রাম ধরে ৫ নম্বর পার্ল রোডে আইয়ুবের কাছে। সারাদিন কাটিয়ে বিকালে আবার হাওড়া স্টেশন।

ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এডুকেশন' বিষয়ে এম.এ. পড়বেন ঠিক করলেন। সাড়ে তিন মাসের মধ্যে ঊষাগ্রামের চাকরি ছেড়ে পিতার মতকে অগ্রাহ্য করে তিনি কলকাতায় চলে এলেন। এসময় ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আইয়ুব ছিলেন রকফেলার ফাউন্ডেশনের ফেলো। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল : Marxist Theory of Value।

বস্তুত সে সময় গৌরীদির ইউনিভার্সিটির মাইনে, হসটেলের খরচ এবং হাত খরচের মতো আর্থিক দায়িত্ব আইয়ুবই পালন করেছিলেন।

১৯৫৫ সালে এম.এ. পাশ করার পর সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুলে চাকরি। গৌরীদির ভাষায়, "এরপর বিবাহ সম্বন্ধে আইয়ুবের দ্বিধা অনেকটা কেটে গেল। আমি ততদিনে এম.এ., বি.টি. পাশ করা পঁচিশ বছরের একটি সাবালিকা। এবং চাকরি করে স্বনির্ভর হয়েছি। সুতরাং নাবালিকাকে ফুসলাবার অভিযোগ নিশ্চয়ই ধোপে টিকবে না, এই ছিল আইয়ুবের ভরসা। অতএব সেবার মার্চ মাসে বসন্তোৎসবে শান্তিনিকেতনে গিয়ে ঘনিষ্ঠ দু-চারজন বন্ধুকে জানিয়ে

এলাম যে এবার আমরা বিয়ে করছি।”

১৯৫৬ সালের জুন মাসে তাঁদের বিবাহ হয়েছিল ৫, পার্ল রোডের বাড়িতে। ভাসুর প্রখ্যাত সি পি আই নেতা ডা. এ. এম. ও. গনির বসার ঘরে বিবাহের আসর সাজানো হয়েছিল। বিবাহে সাক্ষী দিলেন ডা. গনি, ভাইঝি মীরা বালসুব্রহ্মণ্যম ও আত্মীয় খ্যাতনামা সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী (শ্রীনিরপেক্ষ)। উপস্থিত ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আরতি সেন।

সে বছরই আইয়ুবের রকফেলার ফাউন্ডেশনের ফেলোশিপের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। এই বৃত্তির সাহায্যে মার্কসবাদ বিষয়ে যে কাজ করছিলেন, তা আর শেষ করে উঠতে পারেননি। এ কাজটি এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে, তবে গৌরীদির মুখে শুনেছি, যেসব পণ্ডিতব্যক্তি এই লেখাগুলি পড়েছেন, তাঁদের মনে হয়েছে, অসমাপ্ত থাকলেও এগুলি প্রকাশ করা উচিত, কারণ এতে মৌলিক বক্তব্য যথেষ্টই রয়েছে।

১৯৫৭ সালে পুত্র পুষণের জন্ম হয়। ৫৮ সালে আইয়ুব ‘Quest’ নামে ত্রৈমাসিকের দায়িত্ব নেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন অম্লান দত্ত। ‘Congress for Cultural Freedom’-এর ভারতীয় শাখার মুখপত্র ছিল এই পত্রিকাটি। পত্রিকার motto ধার করে নিলেন তাঁর প্রিয় দার্শনিক Whitehead-এর কাছ থেকে। পত্রিকার প্রচ্ছদে শিরোনামের পাশে লেখা হল ‘An Adventure of Ideas.’

আইয়ুবের সম্পাদনায় ‘Quest’ বেরিয়েছিল ১৯৫৮ থেকে ৬৭ পর্যন্ত। মাঝে ১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতচর্চা বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে আইয়ুব গিয়েছিলেন। সঙ্গে গৌরীদি ও পুষণ। বিভাগ প্রতিষ্ঠার এক বছর পরই আবার অসুস্থতার জন্য চলে আসতে হয়। মেলবোর্নের গল্প করার সময় কয়েকটি সন্ধ্যার কথা গৌরীদির মুখে শুনেছি। বিকালবেলা একটি চ্যাপেলের পাশ দিয়ে পুত্রের হাত ধরে হেঁটে হেঁটে আসতেন। ধীরে ধীরে শান্তভাবে সন্ধ্যা নামত। ঘরে অসুস্থ স্বামী অপেক্ষায় শুয়ে আছেন। এক নিবিড় আবছায়া অন্ধকারে মাতা ও পুত্রের দ্রুত পথ হাঁটার মধ্যে ধ্বনিত হত প্রিয়জনের কাছে ফিরে আসার নিশ্চিন্ত আশ্বাস।

এমনই করে কাটছিল দিন। ইতিমধ্যে যোধপুর পার্ক গার্লস স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতার পর গৌরীদি ১৯৬৩ সালের ২২ জুলাই যোগ দিলেন শ্রীশিক্ষায়তন কলেজের ‘শিক্ষা’ বিভাগে। কর্মজীবনের শেষ দিকে ১৯৯১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি এখান থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

কর্মজীবনের পাশাপাশি বিশালভাবে ছড়ানো ছিল তাঁর সামাজিক জীবন। ১৯৬৪ সালে কলকাতায় দাঙ্গার সময় মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন। হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক, সম্প্রীতির সদিচ্ছা আনার জন্য তিনি সারাজীবন কাজ করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ যদি রাজনীতির মানুষদের ফাঁদে পা না দিয়ে খোলা মনে পরস্পরের কাছে আসে, পরস্পরের সুখ-দুঃখ সহজ ভাষায় পরস্পরের কাছে বলে, নিজেদের জন্মলব্ধ ধর্মীয় পরিচয়ের আবরণটি সরিয়ে ‘মানুষ’ হিসাবে পরস্পরকে চিহ্নিত করতে পারে, তাহলে কোনও রকম সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, বিদ্বেষ বা হানাহানি হতেই পারে না। এখানে উল্লেখযোগ্য, ‘কাউনসিল ফর প্রোমোশন অব কমিউনাল হারমোনি’র তিনি ছিলেন আমৃত্যু চেয়ারপারসন।

এদেশের সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের অস্তিত্বের সংকট ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে বহুবার আলোচনা হয়েছে। আমার ধারণা, এটা ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয়। পৃথিবীর সব দেশেই সংখ্যালঘুরা একটা আইডেনটিটি ক্রাইসিসে ভোগে। একটা হীনম্মন্যতার কৃষ্ণছায়া তাকে আজন্ম তাড়া করে ফেরে। তার জন্য অনেক সময় কিছু সংখ্যালঘু লেখক ও বুদ্ধিজীবীর মধ্যে একটা

প্রবণতা দেখা যায়, নিজের সম্প্রদায়কে সাংঘাতিকভাবে ঘৃণ্য, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিকৃষ্ট ও বর্বর ভাবে দেখতে পারলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কাছে স্বীকৃতি, পুরস্কার ও হাততালি খুব সহজেই পাওয়া সম্ভব। এখন যেহেতু সংখ্যাগুরু সমাজের কোনও ধারণাই নেই সংখ্যালঘুদের অন্দরমহল সম্পর্কে, তাঁরা সরল মনেই বিশ্বাস করেন, এই সব বর্বরদের মধ্যে তবু আলো দেখানোর জন্য একজন রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগর জন্ম নিয়েছে, এরকম 'সাহসী' লোককে প্রোটেকশন দেওয়া দরকার, প্রতিষ্ঠার স্বর্ণদুয়ারে পৌঁছে দেওয়া দবকার, তাহলে আরও কিছু রামমোহন-বিদ্যাসাগর সমাজটাতে জন্ম নেবে, উৎসাহিত হবে।

আসলে পৃথিবীর সর্বত্রই সংখ্যালঘু সমাজের কিছু উচ্চাভিলাষী মানুষ এই একই ফর্মুলায় 'লড়ে যায়,' গৌরীদি এইসব কাজ-কারবারের মধ্যে বৈপরীত্য নিয়ে খুব কৌতুক অনুভব কবতেন। তাঁব পরিচিত এক তথাকথিত আগুনছোটানো মুসলিম প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী একবার কনিষ্ঠ সহোদরের প্রেমজ বিয়ের সময়, পাত্রীটিকে রীতিমতো মৌলবি ডেকে ধর্মান্তরিত করে, নাম পবিবর্তন করে, মুসলমানী কায়দায় বিবাহের ব্যবস্থা করেন। গৌরীদির অনুতাপ ছিল, ঘটনাটি ঘটেছিল তাঁর ঘবেই, চোখের সামনেই, কারণ মেয়েটি বাপের বাড়ি ত্যাগ করার পর তাঁর কাছেই তাকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাত্রপক্ষের নাকি ভয় ছিল, মেয়ের পিতা যদি কোনও আইনি পদক্ষেপ নেন, তাহলে ধর্মান্তরিত মেয়েকে ঘরে ফেবাতে তাঁরা পারবেন না।

গৌরীদি হাসতে হাসতে এই সব তথাকথিত প্রগতিশীল মুসলিম বুদ্ধিজীবীর ঘরে ও বাইরে দুই রকম ব্যক্তিত্বের গল্প শোনাবার সময বলতেন, 'ভাবো তো, কী সাংঘাতিক পরিশ্রমের কাজকর্ম ওদের করতে হয়! সব সময় ক্যালকুলেশন করে যাও, কীভাবে নিজেব সম্প্রদায়কে কদর্যভাবে দেখাতে পারলে সংখ্যাগুরুর গুড বুকে থাকা যাবে। আসলে সমস্যা হচ্ছে, এরা ছেলেবেলা থেকে সংখ্যাগুরুর সঙ্গে খোলামেলা মেশে না বলেই, এরকম সহজ সমীকরণের হিসাবে অঙ্ক কষে মেলামেশা কবে। আপাতদৃষ্টিতে এরা যত সফলই হোক, একদিন এদের ফাঁকি সংখ্যাগুরুর চোখেও ধরা পড়ে যায়, আব নিজেব সম্প্রদায়ের কাছ থেকেও এরা যেহেতু অনেক দূরে সরে আসে, তাই শেষ পর্যন্ত একটা প্রচণ্ড একাকিত্বের মধ্যে এদের শেষ জীবনটা কাটতে বাধ্য।'

তিনি সব সময় চাইতেন, সংখ্যালঘুদের নিজেদের পরিশ্রম করে, প্রতিযোগিতায় নেমে প্রাপ্য সুবিধা আদায় কবতে হবে। সেটা অনেক সম্মানের। বলতেন, 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি' হও। নিজের যোগ্যতা দিয়ে মানুষের মন জয় কবো। একজন মকবুল ফিদা হুসেন, দিলীপকুমার, বড়ে গুলাম কিংবা আমজাদ আলি খানের ভক্তদের মনে কখনওই এ চিন্তা আসে না, এঁদের জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মপরিচয় কী!'

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজের নবীন প্রজন্মের চিন্তাভাবনায় মুক্তমনের সঞ্চার করেছিলেন গৌরীদি।

এই বিশাল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান নেত্রী তিনিই। স্বাধীনতার পরে যে নতুন প্রজন্ম জন্ম নিয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সেই সব তরুণদেব মা ছিলেন তিনি। কাজী আবদুল ওদুদের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ছিল তাঁর খুব প্রিয় বিষয়। 'Emancipation of the Intellect' বাক্যটি বার বার উচ্চারণ করতেন। তাঁর কাছে সকলেই ছুটে আসত। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, পুরুলিয়া থেকে সুন্দরবন কত জনের কত রকম প্রয়োজন। চেষ্টা করতেন সঠিক যোগাযোগের সূত্র ধরিয়ে দিয়ে তাদের উপকার করার। আর চেষ্টা করতেন একজন সমাজবিজ্ঞানী ও মনোসমীক্ষকের ভূমিকায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে তাদের মনে আত্মবিশ্বাস

ফিরিয়ে আনতে। কোনও রকম সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প যাতে তাদের আচ্ছন্ন না করতে পারে, সে ব্যাপারেও সহানুভূতির সঙ্গে তাদের ক্ষোভ, ব্যথা, যন্ত্রণার অংশীদার হবার চেষ্টা করেছেন। পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজের গভীরে তাঁর এই বিশাল বৈপ্লবিক ভূমিকা গত চল্লিশ বছরে যে নিবিড়ভাবে যথার্থ তৃণমূলে কাজ করে গেছে, তার প্রকৃত মূল্যায়ন একদিন কোনও সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণাপত্রে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে।

বিচারপতি মাসুদ একবার চেষ্টা করেছিলেন সংখ্যালঘু তরুণদের সঠিকমতো প্রশিক্ষণ ও গাইড দান করতে, যাতে তারা প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে। গৌরীদি এই কার্যক্রমে নিজেকে জড়িয়েছিলেন। অনেকদিন ধরে কিছু ছেলেমেয়ে তাঁর কাছে এসে বিশেষ করে ইংরাজি শিক্ষার পাঠ নিয়ে যেত।

শাহবানু মামলা নিয়ে মুসলিম গণমানসে সে সময়ে চলছে দারুণ বিতর্ক। মৈত্রেয়ীদি তখন জীবিত ছিলেন। প্রথমে গৌরীদির বসার ঘরেই কয়েকটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বেশ তর্ক-বিতর্ক হল। এই সব আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি সংখ্যালঘু—'সাইকি' বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। 'আইডেনটিটি ক্রাইসিসে'র কোন্ ঘূর্ণিপাকে তারা হাবুডুবু খাচ্ছে, খুব সহানুভূতির সঙ্গে সেই সব ব্যথা, অপমান ও যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। এরপর ভারতীয় ভাষা পরিষদে একটি বড় আকারে আলোচনা সভার আয়োজন করলেন। মুক্তবুদ্ধির মানুষদের উপস্থিতিতে সভাগৃহ উপচে পড়েছিল।

একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল সলমন রুশদির 'স্যাটানিক ভার্সেস' গ্রন্থটি নিয়ে যখন হইচই হচ্ছিল। বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল, অপ্রগতিশীল সকল বুদ্ধিজীবীরা রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন 'লেখকের স্বাধীনতা'র সপক্ষে। অবশ্যই এ ক্রোধ ন্যায্য কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল, বইটি কেউ নিজে পড়ে দেখেননি। পড়লেও সমস্যা ছিল, পাঠককে অবশ্যই-ইসলামিক মিথ ও ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে কিছুটা জানতে হবে, না হলে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বোঝা সম্ভব নয়, রুশদি খুব সুচতুরভাবে কোথায় মুসলিম বিশ্বাসকে আঘাত করেছিলেন, অপমান করেছিলেন। সে সময় আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক অভীক সরকার মূল গ্রন্থটি পড়তে দেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে। সিরাজ শুধু একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকই নন, ইসলামিক মিথ ও ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। এদেশে তিনিই একমাত্র লেখক, যিনি 'সাম্প্রদায়িক' শিরোপা পাবার ঝুঁকি নিয়েও রুশদির 'শয়তানী' কাজকর্ম নগ্নভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও সেসব লেখার সঙ্গে তাঁকে বার বার উল্লেখ করতে হত যে ব্যক্তিগতভাবে কোনও ধর্মে তাঁর বিশ্বাস নেই। গৌরীদি সে সময় এক শনিবার বিকালে সিরাজকে আমন্ত্রণ জানান তাঁর ঘরের ঘরোয়া বৈঠকে মূল বইটির আপত্তিকর অংশগুলি পাঠ করে ব্যাখ্যা করতে কেন তা মুসলিম মানসকে অপমানিত করছে। সেদিনও গৌরীদির ঘর উপচে পড়েছিল উৎসাহী শ্রোতার উপস্থিতিতে। গৌরীদি নিজেও এ বিষয়ে একটি যুক্তিসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছিলেন চতুরঙ্গে।

হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের অসম্পূর্ণ পরিচয়ের সূত্রে যেসব ভুল বোঝাবুঝি পরস্পরকে দূরে সরিয়ে রাখে, সে বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ 'কাবিননামহ্ থেকে বসুধারা' ১৯৮৪-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যা চতুরঙ্গ-এ প্রকাশিত হয়েছিল। কবি আল মাহমুদের কিছু অভিমানমাখা বক্তব্য-সূত্রেই খুব বিস্তৃতভাবে বিষয়টি আলোচনা করেছিলেন গৌরীদি। অন্তরের গভীর থেকে চাইতেন বঙ্গভাষাভাষী একই ভূখণ্ডের দুটি ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী মানুষ পরস্পরের কাছাকাছি এসে পরস্পরকে চিনুক, পরস্পরের মুখের ভাষায় পরিচিত হোক, পরস্পরকে ভালবাসুক, শ্রদ্ধা করুক, বিশ্বাস করুক। এতদিনের জমা হওয়া সমস্ত গ্লানি, অভিমান, ক্লেদ, ক্রোধ ধুয়ে মুছে যাক ভালবাসার

বৃষ্টির জলে।

১৯৮৮-তে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মশতবর্ষে কলকাতায় কোনও সাড়াশব্দ ছিল না। গৌরীদি প্রায় একক প্রচেষ্টায় তাঁর সহমর্মীদের সঙ্গী করে এলগিন রোডের বৈতানিক ভবনে এই শতবর্ষ অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করেছিলেন উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাভাষায় আজাদের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন। বইটি লেখেন অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রথম থেকেই তাঁর ছিল সক্রিয় ভূমিকা। কখনও মৈত্রেয়ীদির সঙ্গে ওপার থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সেবায় হাত বাড়িয়েছেন, কখনও বর্ডার পেরিয়ে চলে গেছেন যুদ্ধের ফ্রন্টে। মুক্তিযুদ্ধের বড় বড নেতাদের নিয়মিত আনাগোনা ছিল ৫, পার্ল রোডে আইয়ুবদের ফ্ল্যাটে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে যেসব ভারতীয় সাহায্য করেছিলেন তাঁদের সংবর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা করেছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন। অসুস্থ গৌরীদি ওই অনুষ্ঠানে যেতে পারেননি। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর পক্ষ থেকে সেখানে স্মরকফলক গ্রহণ করি আমি। এ ছিল আমার পরম সৌভাগ্যের মুহূর্ত।

বাংলাদেশ যুদ্ধের পর অনাথ শিশুদের জন্য মধ্যমগ্রামের বাদুর কাছে মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন 'খেলাঘব'। মৈত্রেয়ীদির মৃত্যুর পর এই প্রতিষ্ঠানের আমৃত্যু চেয়ারপারসন ছিলেন তিনি।

হাজার রকম দায়িত্ব পালনের নিয়মিত ব্যস্ততাব আড়ালে ঢাকা পড়ে যেত তাঁর লেখক-অস্তিত্ব। অনেকেরই মনে থাকে না, কী অসামান্য সাবলীল গদ্য প্রাণ পায় তাঁর কলমে। আসলে খুব কম লিখতেন তিনি। কিন্তু যখন লিখতেন, বিষয় আর উপস্থাপনার মৌলিকত্বে পাঠক হিসাবে রীতিমতো অবাক হয়ে যেতে হত।

প্রধানত আইয়ুবের উৎসাহে তাঁর মৌলিক রচনা শুরু। তাঁর বিভিন্ন গল্প বিভিন্ন সময়ে দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর, পূর্বাশা, চতুরঙ্গ, অনুক্ত, নবজাতক, সখীসংবাদ, সাপ্তাহিক বর্তমান প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৮৬-তে তাঁর পনেরোটি গল্প নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন দে'জ। তাঁব স্বভাবের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে গৌরীদি খুব বিনয়ের সঙ্গে তাঁর গল্প সংকলনের নাম দিয়েছিলেন 'তুচ্ছ কিছু সুখ-দুঃখ'। তুচ্ছ কিন্তু তুচ্ছ নয়। মানব সংসারের বিচিত্র গলিপথের গোলকধাঁধা থেকে যেসব টুকরো-টুকরো মণিমাণিক্য সংগ্রহ করে তিনি গল্প লিখেছেন, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের এই খরার মরশুমে সত্যি-সত্যিই সেগুলি এক একটি অসামান্য রচনা।

বস্তুত এই গল্পগুলি যেন বাঙালি জীবনের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার টানাপোড়েনেব ক্রস-সেকশন। বাঙালি মানে সামগ্রিক হিন্দু-মুসলমানের অস্তিত্বমাখা জনজীবন। বহুতল বাড়ির উচ্চবিত্ত থেকে বস্তির খুপরি পর্যন্ত। সমাজ আর সংসারের বাহির-মহল থেকে কোন রহস্যময় অন্দরমহল পর্যন্ত না তিনি ঘুরে এসেছেন!

আইয়ুবের 'গালিবের গজল থেকে' ও 'মীরের গজল থেকে' শীর্ষক অনুবাদ গ্রন্থদুটিতে গৌরীদির লেখা গালিবের ও মীরের যে জীবনীদুটি যুক্ত আছে, বাংলা ভাষায় গালিবের ও মীরের অত ভাল তথ্যনিষ্ঠ জীবনী আর আমার চোখে পড়েনি।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, স্যুভেনির, সংকলনে তাঁর অজস্র প্রবন্ধ, গল্প ছড়িয়ে আছে। সেগুলি

সংগ্রহ করে সংকলন প্রকাশ করা দরকার। গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রতিবেশী' উপন্যাসের একটি মূল্যবান ভূমিকা তিনি লিখেছেন।

অনুবাদ করেছেন মাৎসুও বাশোউ নামক জাপানি লেখকের 'দূর প্রদেশের সংকীর্ণ পথ'-এর কাহিনী, যে পথে বাশোউ ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন ১৬৮৯ সালে। জাপানি মহিলা ক্যোউকো নিওয়ার সঙ্গে যৌথভাবে মূল জাপানি থেকে এই অনুবাদ কর্মটি সম্পন্ন করেন। বাঙালি পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এক অসাধারণ গ্রন্থের।

শেষ বয়সে নাতনি শ্রেয়া অহনার সঙ্গে গল্প করতে করতে লিখেছিলেন আশ্চর্য শিশুসাহিত্য 'এই যে অহনা'। ইচ্ছে ছিল, এক গ্রীষ্মের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে নাতনিকে নিয়ে যাবেন, তার সঙ্গে আম পাড়বেন, দিনরাত আড্ডা দেবেন, আর লিখে ফেলবেন এই বইটির দ্বিতীয় খণ্ড। অসুস্থতার জন্য সে সাধ আর পূর্ণ হল না।

আমার আইয়ুব ও গৌরীদির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ১৯৭০ সালে। তখন আমি বহরমপুরে স্কুলের ছাত্র, নিছক একজন কিশোর। 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা'র অসাধারণ ভূমিকা পাঠ করে স্কুলের সেই ছাত্রটি আইয়ুবের গদ্যের সম্মোহনে তখন রীতিমতো মুগ্ধ। তারপর 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' পড়ালেন আমার প্রিয় শিক্ষক ড. অলোক সেন (পরবর্তীকালে আকাশবাণী কলকাতার কমার্সিয়াল ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের স্টেশন ডিরেক্টর)। সবটা বুঝি আর না বুঝি এক নতুন পৃথিবীর সামনে সেই অর্বাচীন পাঠককে দাঁড় করিয়ে দিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। সেই মুগ্ধতা ও খানিকটা ছেলেমানুষি মিশিয়ে প্রকাশকের ঠিকানায় চিঠি দিলাম তাঁকে। কী আশ্চর্য, কিছুদিন বাদেই পোস্টকার্ড পেলাম সুদৃশ্য হস্তাক্ষরে। গৌরী আইয়ুবের লেখা সেই চিঠিতে জানতে পারলাম আইয়ুব অসুস্থ, কলকাতায় কখনও এলে যেন দেখা করতে আসি ৫, পার্ল রোডের দোতলায়।

কিছুকাল বাদেই কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে আসার সুবাদে গৌরীদি এবং আইয়ুবের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হল। তারপর কবে কীভাবে স্নেহ-ভালবাসার কোন্ রসধারায় এতখানি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল, তা এখনও আমার কাছে এক গভীর বিস্ময়।

ছাত্রজীবন থেকেই মাদার টেরিজার সেবাকেন্দ্রে আমি নিয়মিত যেতাম শুনে খুব উৎসাহ দিতেন। পরে পাশ করার পর ওঁদের দুটি সেবাকেন্দ্রর চিকিৎসার ভার নেওয়াতে আনন্দ পেয়েছিলেন। এর মধ্যে যশোর রোডে 'নির্মলা কেনেডি সেন্টার' তাঁর খেলাঘর-এর যাওয়ার পথে পড়ে। তাই একবার খেলাঘর-এর কয়েকজনকে নিয়ে ওখানে ভিতরে গিয়েছিলেন। আর দেখেশুনে এসে বলেছিলেন, 'এসব অনাথ জড়বুদ্ধি মানসিক রোগী মেয়েদের এত সুন্দর চিকিৎসার ও সেবার ব্যবস্থা দেখলে মাদারের উপর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়।' মাদারকে কেউ অহেতুক সমালোচনা করলে খুব রেগে যেতেন। বলতেন, 'আগে নিঃস্বার্থভাবে একটা মানুষের সেবা করে তারপর সমালোচনা করো।'

আমাদের কবিতা পাঠের একটা প্রহর ছিল। বাংলা ইংরেজি সব ধরনের কবিতাই। ইংরেজি কবিতা পাঠের সময় ব্যাখ্যা করে অনুভূতির গভীরে নিয়ে যেতেন। অনেক ইংরেজি শব্দের সঠিক উচ্চারণ শুদ্ধ করে শিখিয়ে দিতেন। এখন ভাবলে মনে হয়, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে যেন হেঁটে এসেছি।

আমাদের খুব সুন্দর সময় ছিল গান শোনার। তাঁর ভাষায় 'মিউজিক্যাল সেশন'। টেপ রেকর্ডার ক্যাসেট বাজিয়ে। রবীন্দ্র সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিক্যাল—সুরের ঝরনাধারায় তো স্নান করার কোনও নিয়মকানুন নেই। এখনও আমার কানে ভাসছে বাখ্-এর ব্রানডেনবার্গ কনচের্টো নাম্বার ফাইভ প্রায় দশ মিনিট ধরে টানা আমরা শুনে যাচ্ছি, গৌরীদির

আধবোজা চোখ, চোখে মুখে স্বর্গীয় প্রশান্তি, এ-সব মুহূর্ত তো আমার মতো সামান্য মানুষের সারা জীবনের সম্পদ। অনেকেই জানেন না, আইয়ুবের প্রভাবে গৌরীদি পশ্চিমি ধ্রুপদী সঙ্গীতের একজন সত্যিকারের সমঝদার শ্রোতা ছিলেন।

আমার বেশিরভাগ লেখার প্রথম পাঠক ও সমালোচক ছিলেন গৌরীদি। একটি লেখা বার বার মাজা ঘষা করা, রি-রাইট করার অভ্যাস ওঁর প্রভাবেই আমার মধ্যে এসে গেছে সেটা বেশ বুঝতে পারি। বলতেন, 'তোমাকে নিজেকেই ঠিক করতে হবে, তুমি কোন পথে হাঁটবে। কিছু লেখক আছেন, যাঁরা খুব দ্রুত জনচিত্তজয়ী, দু-তিনশো বইয়ের লেখক, সকলেই তাঁদের নিয়ে মাতামাতি করে, অর্থ-সম্মান-যশ সব দিক দিয়েই তাঁরা খুব সফল মানুষ। এঁদের লোকে ধন্য ধন্য করে। একদিক দিয়ে এই জীবনেই নগদ বিদায় তাঁরা পেয়ে যান। আব এক ধারার লেখক আছেন, যাঁরা জনপ্রিয়তার ধাব ধারেন না। কিছু সিরিয়াস পাঠক, সমালোচক তাঁদের মূল্যায়ন করেন। অনেক সময় জীবিত অবস্থায় সঠিক স্বীকৃতিও জোটে না। এই সব লেখকরা মোহহীন। তাঁদের লেখায় থাকে জীবন সম্পর্ক একটা অনুসন্ধান, অন্বেষণ। লেখার ফর্ম নিয়েও তাঁরা দুঃসাহসী ভঙ্গিতে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, যা সাহিত্যকে করে বেগবান, ঋদ্ধ। এই লেখকদের পথ অনেক বন্ধুর, অনেক যন্ত্রণাব কাঁটা বেছানো। তবে কোয়ানটিটি নয়, কোয়ালিটিই শেষ পর্যন্ত কালের দরবারে বেঁচে থাকে, এ কথা নতুন করে বলার দরকার নেই। এ চিরকালের সত্য।' বিভিন্ন লেখায় তাঁর ছোটখাটো সাজেসান ব্যবহার করে শেষ পর্যন্ত দেখেছি লেখাটার মাত্রা অন্য জায়গায় পৌঁচে গেছে।

১৯৮৬ সালে যুগান্তর আয়োজিত বাংলার বাতায়ন ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভের পর তাঁর ঘরে প্রিয়জনদেব মাঝখানে আমাকে সংবর্ধনা দেন। ওই সমাবেশে সরোদ বাজিয়ে ছিলেন কাজী আফসার আলি। গৌবকিশোর ঘোষ, আবদুর রউফ, ডা. ওয়ালি, অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। আমি গল্পটি পাঠ করি। প্রচুর খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করেছিলেন সেই সন্ধ্যায়।

কিছু দিন আগে দেশের একজন বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক একটি হিন্দি কাহিনীচিত্র নির্মাণের জন্য আমার একটি গল্পের ফিল্মরাইট কিনে নেন। খবরটি শোনার পর থেকে গৌরীদি ছেলেমানুষের মতো প্রায় বলতেন, 'প্রিমিয়ার শো'য়ে আমরা সকলে দলবল বেঁধে যাব সিনেমাটা দেখতে।' গৌরীদিব আশা পূর্ণ হল না, সেই খেদ আমার সারাজীবন রয়ে যাবে।

সন্তান জন্মের পর থেকেই তিনি রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁর বাবারও এই রোগ ছিল। চিরকালই এই রোগে গৌরীদি কষ্ট পেয়েছেন। মাঝে মাঝে লাঠিরও ব্যবহার কবতেন। গত বছর থেকে সেই কষ্ট বেড়ে গিয়েছিল সাংঘাতিকভাবে।

১৯৮২ সালের ২১ ডিসেম্বর আইয়ুব চলে যাওয়ার পর বেশ একা হয়ে গিয়েছিলেন। স্বপ্ন ছিল আইয়ুবের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখবেন। এই উপমহাদেশেব রাজনৈতিক বিভাজনকে কেন্দ্র করে সব ধর্মের সাধারণ মানুষের জীবনে যে উথাল-পাথাল দেখা দিয়েছিল, এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে একটি উপন্যাস লেখারও ইচ্ছে ছিল। হাজার রকম সামাজিক দায়িত্ব ও জীবিকার তাগিদে নিজস্ব সময় খুব কমই পেতেন। অবসর নেওয়ার পর যখন সময় পেলেন তখন অসুস্থতা বেড়ে গেল।

জীবনের শেষ দিনগুলিতে অনুলেখক হিসাবে তাঁর ডিক্টেশনে লিখেছিলাম অসামান্য স্মৃতিকথা 'সৈয়দ মুজতবা আলী বন্ধু বরেষু'—চতুরঙ্গে ছাপা হয়েছিল।

তারপর শুরু করেছিলাম অনুলিখনে 'আমাদের দু'জনের কথা'। আমার জীবনের এক

মহামূল্যবান সম্পদ এই স্মৃতিকথাটি রচনা করার অভিজ্ঞতা। একটি ঘটনার পেছনে আরও কত ঘটনা, একই ব্যক্তিচরিত্রের আরও কত বিচিত্র রূপ, একটি স্মৃতি ছুঁয়ে কত নানা রঙের স্মৃতির পথে তিনি যেভাবে আমাকে হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন, সারা জীবনেও তা ভুলবার নয়। হয়ত কোনওদিন আমার এই অনুলেখক-পর্বের অভিজ্ঞতা দিয়েই রচনা করতে পারি এক বিস্ময়কর অনুভূতিমালার পুনর্নির্মাণের রূপকথাময় ইতিবৃত্ত।

তিনি মুখে বলে যেতেন, লংহ্যান্ডে আমি লিখে যেতাম। বার বার পড়ে শোনাতে বলতেন। সব সময় পরিমার্জনা চলত। চিরকাল নিজের লেখার ব্যাপারে যিনি ছিলেন প্রচণ্ড খুঁতখুঁতে এবং বার বার পরিমার্জনায় ও পুনর্লিখনে নিরন্তর পরিশ্রমী, এ ভাবে মুখে বলে নির্দেশ দিয়ে মনের মতো কাজটি ফুটিয়ে তুলতে তাঁর কতখানি মানসিক পরিশ্রম হত, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমি সাধারণত রাত্রে চেম্বার শেষ করে তাঁর কাছে যেতাম। তিনি অপেক্ষায় শুয়ে থাকতেন, কখন আমি যাব, কাজ শুরু হবে। সকলকে বলতেন, 'কামাল যতক্ষণ থাকে, আমি রোগের যন্ত্রণা সব তখন ভুলে যাই। কীভাবে যে এই দু-তিন ঘণ্টা সময় কেটে যায় বুঝতেই পারি না।' আসলে তাঁর যাপিত জীবনের মাধুর্য এতটাই বেশি ছিল যে সেই জীবনের স্মৃতিচারণেও তিনি অনাবিল আনন্দে ডুবে যেতেন। ফলে রোগযন্ত্রণার কথা তাঁর মনেই থাকত না।

মূল পাণ্ডুলিপির প্রথম দিকের সামান্য অংশ কপি করানো হয়েছে। বাকি অংশটুকু তাঁর মনের মতো পরিমার্জনা করে আমাকে প্রস্তুত করতে হবে। গৌরীদির আশীর্বাদে এই পরম দায়িত্ব নিশ্চয়ই যথাযোগ্যভাবে পালন করতে পারব।

কত সামান্য ব্যাপারেও তাঁর কী মমতাময় দৃষ্টি থাকত! পরিচারিকা মনার বিয়ে নিজের কন্যার মতো রীতিমতো ধুমধাম করে দিয়েছিলেন। যোধপুরে পার্কের একটি নারী সেবা সংঘের এক অনাথ মুসলিম মেয়ের পাত্রও তিনি জোগাড় করেছিলেন। তাদের বিয়েতেও যথেষ্ট হইচই খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল। এরকম অসহায় মানুষদের সাহায্য করার আরও কত যে ঘটনা আছে, বলেও শেষ করা যাবে না।

ঈশ্বর কিংবা কোনও প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের উপর তাঁর কোনও বিশ্বাস ছিল না। স্কুল-কলেজ জীবন থেকেই 'রিলিজিয়নে'র ঘরে কাটাকুটি চিহ্ন দিয়ে এসেছেন। তিনি ছিলেন চূড়ান্তভাবে মানবতাবাদী, নিজের 'মানব' পরিচয়ের উপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল। তাই মৃত্যুর পর তাঁর দেহ নিয়ে যাতে কোনও ধর্মীয় শেষকৃত্য অনুষ্ঠান না হয়, সেজন্য মেডিকেল শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিজের দেহদানের অঙ্গীকার পত্রে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন ১৯৮৮ সালের ৯ জানুয়ারি। একই সঙ্গে 'আই ব্যাঙ্কে'র জন্য চক্ষুদানের স্বীকৃতি। সুখের কথা, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগেই তাঁর মৃতদেহ সসম্মানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৮-এর ১৩ জুলাই ভোর ৪-৫৫ মিনিটে তিনি চলে গেলেন। মৃত্যুর আগে শেষ দু'টি ঘণ্টা তাঁর বিছানার পাশে বসে ছিলাম আমি আর তাঁর ছোট বোন মনীষাদি। মৃত্যু কত শান্ত, সুন্দর ও ধীর গতিতে মানুষের অস্তিত্বকে মহাশূন্যতার অন্ধকারে বিলীন করে দেয়, এ দুর্লভ ঘটনার সাক্ষী থাকাও এক বিরল অভিজ্ঞতা।

গৌরীদির প্রিয় একটি বাণী ছিল, পালি ভাষায়—'সে করোহি দীপম্ অওনো।' আনন্দকে বুদ্ধ বলেছেন, 'নিজেকে একটি দীপের মতো করো'।

সারাটা জীবন ধরে গৌরীদির ব্যক্তিত্বের আলো সেই একক সাধনার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

সৌজন্যে : চতুরঙ্গ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৫

[ডা. কামাল হোসেন বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, গল্প প্রবন্ধ লেখক ও সমাজসেবক]

শ্রদ্ধাঞ্জলি-গৌরী নানীর প্রতি

লুবনা মরিয়াম

আঠাশ বছরের আনাগোনা, শেষ হয়ে গেল। ১২ বছর আগে আবু সয়ীদ আইয়ুব চলে গেলেন। আর এখন এত শত মায়া-বন্ধন কাটিয়ে ১৩ই জুলাই ১৯৯৮ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন গৌরী আইয়ুব। কলকাতার পার্ক সার্কাসে তাঁদের ৫ নম্বর পার্ল রোডের বাড়িতে নানা আর নানী, দুজনাই আর নেই। খবর শুনে সব কাজ ফেলে, বিহ্বল প্রায়, ছুটেছিলাম। রাতের বাসে ঢাকা থেকে যশোহর হয়ে বেনাপোল, সেখান থেকে কলকাতায়। আমরা যাত্রীরা শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত বাসে, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছি আর বাইরে শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণ, বাসের হেড-লাইট, বৃষ্টির ঝাপটা, দোদুল্যমান গাছপালা—সবটা মিলে কেমন যেন একটা এলোমেলো surrealistic (পরাবাস্তব) ছবি তৈরী হয়েছিল। মাথায় ঘুরপাক খাওয়া আমার ভাবনাগুলোর মতন। বাসে তুলে দেবার আগে, সোহাগ পরিবহণের পরিপাটি বিশ্রামাগারে, আমার ২১ বছরের কন্যা আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলেছিল, 'আম্মু be calm। তুমিই তো ব'লেছিলে ওঁর এত শারীরিক যন্ত্রণা আর চোখে দেখা যায় না'। মেয়েকে তখন বোঝাতে পারিনি আমরা কি হারিয়েছি। আমার ভেতরকার হাহাকার ধ্বনিত হচ্ছিল বাইরের ঝোড়ো-বাতাসে। এ যেন চোখের সামনে একটা যুগ বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। এক এক ক'রে সে যুগের মানুষগুলো পরপারে চলে যাচ্ছে। কিন্তু যাবার আগে ওঁরা কি কিছু ব'লে গেলেন আমাদের?

আড়িচায় ফেরিতে ওঠার সময় খেয়াল করলাম ঘুমন্ত সহযাত্রীরা কেউ টেরও পেল না—বাস ঘাটে নামলো, ফেরিতে উঠলো। বিনীদ্র, অসাড়। কে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাচ্ছে; কে জানে? মনে পড়ল আমার সাথে নানার শেষ আলাপ। তখন Parkinsonism ওঁকে একেবারে শয্যাশায়ী করে ফেলেছে। খাট ঘেষে, চেয়ারে বসে, মুখের কাছে কান লাগিয়ে কথা শুনতে হচ্ছিল। Asian Games-এ আসা সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গিদের ফেলে ভোরবেলা, তখনও ছুটে গেছিলাম ওঁদের কাছে। 'পার্ক হোটেলের breakfast ছেড়ে এখানে এসেছ?', ধীরে, অনেক ধীরে ক্ষীণ কণ্ঠে স্মিত হেসে ব'লেছিলেন নানা। কথা জড়ানো, সবটা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আপন মনে বললেন, 'আজকাল এসব কথা ভীষণ মনে হয়। কোথায় থেকে এসেছি আমরা, কোথায় যাচ্ছি'। পরে তাঁর বই 'পান্থ জনের সখা'তে পড়েছি ঃ

> 'বর্তমান গ্রন্থের নামকরণে ঐ বিশেষণ-পদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথকেই বোঝাতে চেয়েছি, নিজেকে অন্যতম পান্থজন জ্ঞান ক'রে। যে-ধর্মসমাজ ও ধর্মবিশ্বাসের আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম তাতে একপ্রকার শান্তি, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ছিলো। সেই আরামের ভিটেবাড়ি ছেড়ে বনজঙ্গলের মাঝখান দিয়ে খানাখন্দ পার হ'য়ে পাহাড়-পর্বতের উপর দিয়ে, কখনো-বা উপত্যকার গুমোট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অজানা আকাটা পথে বেরিয়ে পড়ার ক্লেশ, ভয়, বিপদ, ক্ষীণায়মান আশা এবং ঘনায়মান নৈরাশ্যের কথা ভুক্তভোগীই জানেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মতন অতো নিবিড়ভাবে অমন সর্বান্তঃকরণ দিয়ে আর কেউ জেনেছেন ব'লে তো মনে হয় না'

কদিন পরই খবর এল তিনি আর নেই। মনে হয়েছিল কি নিষ্ঠুর ভাগ্য। তাঁর কাছে আরও অনেক কিছু জানা, আরও অনেক কিছু শোনা বাকি রয়ে গেল।

ফেরি চলতে আরম্ভ করল আর বৃষ্টির প্রতাপও যেন একটু কমলো। নদীর বুক বেয়ে বিরাট

কায় লৌহযান চল্‌ছে। বাস্‌-ট্রাক, মটরগাড়ি গায়ে-গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে আছে তার ওপর। গাড়িগুলোর আনাচে কানাচে সদা বিদ্যমান সেই নীল polythene sheet গায়ে জড়িয়ে বসে আছে কিছু মানুষ। ওই polythene sheet ওদের কত বড়ই না সম্বল। ভাবলাম, আশ্চর্য আমরাও অস্বস্তিকর অপরাধবোধ চাপা দিয়ে, দেখেও দেখি না। সত্যিই আশ্চর্য! এই যে আমাদের পৃথিবী, সেই পৃথিবীতে পাঁচ হাজার বছর ধরে কয়েক সহস্র কোটি মানব অস্তিত্ব, আর তার মধ্যে কয়টি মাত্র কণ্ঠে, তাও মাঝে মধ্যে, সোচ্চার হয়ে উঠেছে আর্থ-সামাজিক সমতা আর একতার বাণী। যাক গে! আজকাল বড় সেকেলে আর অপ্রিয় 'মার্ক্স, শ্রেণী সংগ্রাম' ইত্যাদি শ্রেয় নৈতিক ব্যাপার স্যাপারগুলো।

তবে হ্যাঁ, বিবেকবান ব্যক্তিত্ব ক্বচিৎ আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ান। তখন ক্ষণিকের জন্য শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হয়ে যায়। তারপর, কিন্তু, আবার সেই আত্মকেন্দ্রিকতা। ৫নং পার্ল রোডে আইয়ুবদের দুকক্ষ বিশিষ্ট বাড়ির ছবি ভেসে আস্‌লো মনে। নানা মারা যাবার কিছু দিন আগে অবশ্য আরও দুটো ঘর পাওয়া গেছিল। তবে, শেষ অবধি ওই দুটো ঘরেই যাবতীয় সাংসারিক কাজকর্ম চলত ওঁদের। সজ্ঞানে জীবন থেকে সব প্রকার বিলাস, আড়ম্বর বর্জন করেছিলেন তাঁরা। না, তাঁরা মার্ক্সবাদীতো ছিলেনই না ; প্রগাঢ় ভাবে humanist - তাঁরা ছিলেন সত্য ও সুন্দরের সন্ধানে উৎসর্গিত দুটি প্রাণ। আর ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত। সত্যি বলতে গিয়ে এ দুটোকে সত্য ও সুন্দরের সন্ধান আর রবীন্দ্রনাথকে—কি আলাদা ক'রে দেখা যায়?

আর সেই অন্তরতম সত্য, অন্তরতম মূল্যবোধ তাঁদের জীবন ছেয়ে রেখেছিল। নানারই লেখা—'সত্য শ্রেয় ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা মানুষের জীবনকে নিছক জৈবিকতার গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে।'

নানার বিরুদ্ধে ivory tower-এ বসবাস করার অভিযোগ শুনেছি কারু কারু মুখে। স্মৃতির পথ বেয়ে চলতে চল্‌তে সেদিন বারবার মনে হচ্ছিল নানাদের সেই simple living, high thinking-এর জীবনধারা, সেটুকুতেই বা আজকাল আমরা ক'জন বিশ্বাস করি ; আর বিশ্বাস করলেও ক'জন চর্চা করতে পারি। হোক ডাক্তার, হোক শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক—আমাদের সবারই চাই বাড়ি, চাই গাড়ি, চাই স্বল্প সময়, স্বল্প পরিশ্রমে অনেক নাম। মাঝে মাঝে কৌতূহল হয়, জানতে ইচ্ছে করে—আজকাল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা 'আদর্শ পুরুষ' রচনায় কার সম্বন্ধে লেখে?

কলকাতায় আমাদের যত সমস্যার যত পরামর্শর কথা, সবই কিন্তু গৌরী নানীর সাথে। তাঁর reference ধ'রে গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের সাথে আলাপ থেকে আরম্ভ ক'রে, শরীর-স্বাস্থ্যের কথা, আর্থিক সমস্যার আলোচনা সবই। আর নানার সাথে একটা সমীহের দূরত্ব। তিনি পণ্ডিত মানুষ, বাচালতা তাঁর পছন্দ নয়। তবে ভালোবাসতেন—এটুকু বুঝতাম।

টুকরো টুকরো স্মৃতি মনে পড়ছিল। বেশ কয়েকবার আমাদের সাজগোজ—এই যে আমাদের কানের দুল, গলায় মালা পরা—এই নিয়ে হেসে হেসে নানা আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য নারী স্বভাব সুন্দর, বাহ্যিক অলঙ্করণের প্রয়োজনই নেই। একবার গীতিবিতান সামনে রেখে চিঠি লিখছি, তখন আমারই বিশ কি একুশ বছর বয়স ; সন্ধ্যাবেলায় ঘর ভর্তি লোক, মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে প্রেমপত্র লেখা হচ্ছিল?' আমি তো অবাক! সলজ্জ মাথা হেঁট ক'রে মনে মনে ভাবলাম, 'পড়ুয়া মানুষ। দেখলেনই বা কখন, আর বুঝলেনই বা কি ক'রে?' তারও কিছুদিন বাদে, একবার কলকাতায় 'আশ্রমিক সঙ্ঘ'র জন্য চিত্রাঙ্গদা করবো, ব'লে ওঁদের ওইটুকু ঘরেই নাচ practice করছি। এভাবে কত অত্যাচারই না করেছি। পূষণ

আর গৌরী নানী দুজনই কলেজে। একজন পড়তে আর একজন পড়াতে। নানা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কি করছি ; শুনে কোন কথা না ব'লে মাপা গতিতে, আস্তে ক'রে বইয়ের শেল্‌ফ থেকে চটি বই একখান বের ক'রে বললেন, 'এটা পড়ো। এটা না পড়লে চিত্রাঙ্গদার মর্ম বুঝতে পারবে না'। সেদিন এক নিশ্বাসে, মুগ্ধ বিস্ময়ে প'ড়েছিলাম, 'চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্য। তার পরের দিন নানার নিজের লেখা রাজেন্দ্রনন্দিনী আর চণ্ডাল কন্যার প্রেম কাহিনীর উপর প্রবন্ধটা পড়তে দিলেন। সে সময়টা ছিল আমাদের জন্য, 'কাল তুমি আলেয়া', 'রাত ভরে বৃষ্টি', বিমল কর, jewel in the Crown এর সময়। সেই প্রথম পড়লাম রবীন্দ্র সাহিত্যের উপর আলোচনা। নানা তাঁর এক বই এ লিখেছেন,

> "আমি রবীন্দ্রনাথকে যতটুকু পেয়েছি আমার ভাবনায় ও বেদনায় তাতেই আমি ধন্য হয়েছি। সে ধন্যতা যদি আরো পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে পারি তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।"

এক এক ক'রে নানার সবগুলো বই পড়লাম। আবু সয়ীদ আইয়ুবের হাত ধ'রে সেই শুরু হলো রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে চেনা। জানি না আর কজনের সাথে সেই ধন্যতা ভাগ করতে পেরেছিলেন, তবে আমার জন্য সেদিন একটা দ্বার উন্মোচন হলো যেন।

বাইরের ভোরের আলোয় এক এক ক'রে বাসে সবার ঘুম ভাঙ্গছে। কেবল বর্ষার পরেই এমন ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল সূর্যোদয় সম্ভব। আমার জীবনে আরেক ভোরের কথা মনে পড়ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে কেবল আমাদের আবাল্য উদ্‌যাপিত বর্ষামঙ্গল নৃত্যনাট্য, বসন্ত উৎসবের নন সেই প্রথম সে কথা অনুভব করেছিলাম ; বুঝেছিলাম রবীন্দ্রনাথ মানে জীবনের একটা ধারা ; বুঝেছিলাম রবীন্দ্রনাথ মানব ধর্মের আরেকটা নাম।

নানা মারা যাবার পর গৌরী নানীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা নানা কেন কোনদিন creative writing লেখার কথা চিন্তা করেননি?' হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'বহু আগে একবার একটা limmerick লিখেছিলেন, সেই তাঁর প্রথম আর শেষ চেষ্টা'। আসলে গল্প, উপন্যাস, কবিতা লেখার জন্য এক ধরনের দুঃসাহসিকতা প্রয়োজন। নিজের লেখার মর্মকথা, যৌক্তিকতা, দায়িত্বের কথা ভাবতে গেলে আর লেখা হয় না। কেন ছবি আঁকছি? কেন কবিতা লিখছি?—স্বভাব শিল্পী ছাড়া আর কেউ এ সব কথা চিন্তা করলে, না-লেখাটাই শ্রেয় ব'লে মনে হয়।

আর গৌরী নানীর কথা চিন্তা ক'রতে ক'রতে ভাবলাম, কিছুটা স্বার্থপর না হ'লেও কিন্তু লেখালেখি হয় না।

বেনাপোলে পৌঁছে ভীষণ অস্থির লাগছিল। আর কতক্ষণ? Immigration এর লম্বা লাইন। তাই যখন চ্যাংড়া একটা ছেলে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপা বই সহ, না বই ছাড়া?' তাড়াতাড়ি বললাম, 'পাসপোর্ট আছে, কত লাগবে?' ৩৮০ টাকা শুনে রাজি হয়ে গেলাম। তাও কৌতূহলবশত জানতে চাইলাম, 'ভাই, পাসপোর্ট ছাড়া কত লাগে?' চট্‌পট্ উত্তর, '৩০০ টাকা।' 'কেন?' 'ওই যে tax-এর ঝামেলা।' বিচিত্র এই দেশ, বিচিত্র তার মানুষ।

ছেলেটার সাথে, লাইন কাটিয়ে, যেতে যেতে দেখলাম এক বৃদ্ধা, অসুস্থ নিশ্চয়ই, চিকিৎসার জন্য ভারতে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। কেন এত কষ্ট পেতে হয় মানুষকে? ভালো মন্দ নির্বিচারে এই কষ্ট। নেই যুক্তি, নেই উত্তর। তা না হ'লে গৌরী আইয়ুবের মত মানুষকেও এত কষ্ট পেতে হলো? সারাটা জীবন যে মানুষটা আড়াল থেকে ক্লান্তিহীন সেবা-সাহচর্যে স্বামীর মনস্বিতা সচল রেখেছিলেন ; পরহিতৈষিতা যার জীবনের অঙ্গ ছিল ; কেন সে মানুষটাকে

পক্ষাঘাতের অমানুষিক গ্লানি সহ্য করতে হলো? কেন?

'হে কৌন্তেয়, এ জীবনে সুখ-দুখ, শৈত্য-তাপ
সকলই অনিত্য, ইহা সহ্য করিতে শেখো'।।

ভগবদ্‌গীতা ২.১৪

সব শেষে কি এটাই মেনে নিতে হবে?

Gracious-শব্দের একাধিক বাংলা অনুশব্দ আছে—করুনাময়, শোভন, সদয়। সবটাকে একত্র করলেও বাদ পড়ে যায় গৌরী নানীর বৈদুষ্য, তাঁর মনুষ্যত্ববোধ। আর আমিত্বের এই যুগে তাঁর আত্ম-বিলোপ আমার কাছে অযৌক্তিক মনে হতো। সাহিত্যের জগতে আবু সয়ীদ আইয়ুবের জন্য তাঁর আত্ম-ত্যাগ আজ কিম্বদন্তীর পর্যায়ে চলে গেছে। সমাজসেবক হিসেবেও তাঁর পরিচিতি আছে। তবে সুলেখক হিসাবে তাঁকে খুব কম পাঠকই চেনেন। এতটা নিঃস্বার্থ হবার কি প্রয়োজন ছিল? স্বামী, সংসার, পরসেবা সেটা এতোই বড়, যে নিজের প্রতিভাব বিকাশটা আর হলোই না? ওঁকে দেখে প্রায়ই মনে হতো ওঁর জন্যই হয়তো লিখেছেন কবি—

"আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি পরানে তোমার পরমকান্তি—
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়পদ্মদলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।।"

বেনাপোল থেকে কলকাতা দুঘণ্টার যাত্রা। প্রথমটায় বাস ফাঁকা ছিল, তবে দমদমের কাছাকাছি যখন, তখন মানুষের ভীড়ে নডবার উপায় নাই। সবাই ছুট্‌ছে শহরের দিকে। কোথায় ছুট্‌ছি আমরা সবাই?

৫নং পার্ল রোডে পৌছুতে আবার মেঘ, আবার অঝোরে বৃষ্টি নামলো। সিঁড়ি বেয়ে ফাঁকা ঘরে ঢুকলাম। অনেক পরিচিত সেই ঘর, নেই শুধু ঘরের মানুষ দুটো। বড্ড ভালো দুটো মানুষ পৃথিবী থেকে চ'লে গেলেন। বুঝলাম তাঁদের জীবনেব মধ্যে যে বাণী থেকে গেল, সেটা আরেকবার অনুভব করার জন্যই ছুটে এসেছিলাম।

'আমাদের প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের পল্লবরাশি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়ে জগতের সমস্ত সুখ দুঃখ ভোগ করছে এবং সেই সুখ দুঃখের উত্তাপে শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে, কিন্তু আমাদের চিরজীবনকে সেই প্রতি মুহূর্তের দাহ স্পর্শ কবতে পারে না—অথচ তার তেজটুকু সে আপনার অন্তরে ক্রমাগতই অলক্ষিত অচেতন ভাবে সঞ্চয় করতে থাকে।..যে মানুষের প্রতি মুহূর্তের অনুভব শক্তি সুখদুঃখভোগ শক্তি সামান্য, তার দাহও অল্প, তার চিরপ্রাণের সঞ্চয়ও অতি অকিঞ্চিৎকর।..প্রতিদিনকে সজীবভাবে সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করলে চিরদিনকে নির্জীব করা হয়।'

ছিন্নপত্রাবলী (১৫৫)

[লুবণা মরিয়াম আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর ভাগ্নী-কন্যা, বাংলাদেশের প্রতিভাময়ী নৃত্যশিল্পী]

গৌরীর অসামান্য জীবনের পটভূমি

শ্যামশ্রী লাল

গৌরীর অসাধারণ জীবনের পটভূমি হিসাবে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত দুটি শহর ও একটি আশ্রমের কথা বারেবারে মনে আসে আমার। এই তিনটি জায়গার অন্তর্নিহিত চরিত্র যেন গৌরীর অসামান্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তার জন্মকাল থেকে ১৯৫০ অবধি তার ছাত্রজীবন, ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে যোগদান ও কারাবাস—এইসব ঘটনা পাটনা শহরের সঙ্গে জড়িত। ১৯৫৪ থেকে ১৯৯৮ অবধি তার দীর্ঘ, কর্মময় জীবন, আমাদের কলকাতার সকল প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্মের প্রয়াসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল। সকল কাজের মধ্যেই গৌরীর আন্তরিকতা, ঋজুতা ও স্নিগ্ধ-প্রখর ধীশক্তি প্রকাশ পেত—যা সর্বদাই সম্পূর্ণভাবে অকৃত্রিম বলে, আমাদের মতন সাধারণ মানুষ কযজন একেবারে মুগ্ধ হয়ে থাকতাম। ওর চলে যাবার সংবাদ শুনে যে সব কৃতী ও কর্মিষ্ঠ জনেরা বিষাদমাখা মুখে ওর ঘরে এসে দাঁড়ালেন—তাঁদের দেখে আরো বুঝলাম যে কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল, আমাদের গোষ্ঠীর, আমাদের কলকাতার, আমাদের দেশের—এই ছোট্ট মানুষটির দারুণ মৃত্যুতে। আমাদের ব্যক্তিগত শোক ও শূন্যতার কথা না হয় তোলা রইল।

গৌরীর পাটনার জীবন বিষয়ে আমি বিশেষ কিছু জানি না, বন্ধু এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ওদের ছাত্রীজীবনের কিছু চিত্তাকর্ষক গল্প শোনা ছাড়া। শান্তিনিকেতনে ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ অবধি বাস করেই কত বন্ধু ও ভক্ত যে গৌরীর সঙ্গে চিরকালের সম্পর্ক গড়ে নিয়েছিল তার হিসাব দেওযা সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্য আমার যে তার অনেক আগেই আমি ঐ আশ্রম ছেড়ে চলে এসেছি।

ডাঃ কামাল হোসেনের অনুলিখনে, গৌরীর শান্তিনিকেতনের স্মৃতিচারণার একটু অংশ পড়লেও, অনুভব করা যায় যে রবীন্দ্র-সাহিত্য, রবীন্দ্র-দর্শন ও রবীন্দ্রনাথের হাতে-গড়া আশ্রমটি, গৌরীর অন্তরে কী গভীর প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিল। এই আশ্রমজীবনের স্মৃতি তার চিরকালের অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল। গৌরী বলছে,—"শান্তিনিকেতন আমার জীবনে কী মহাসমারোহে প্রবেশ করেছিল, তার সবটুকু বলার সাধ্য আমার নেই। সেদিনই যেন আমার সবখানি সত্তা জুড়ে এক মহোৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল।" এখানেই অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুবের দর্শনশাস্ত্রের ক্লাসে ভর্তি হয়ে, গৌরীর তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়!

১৯৬০ সাল থেকে গৌরীর সঙ্গে আমার চেনাপরিচয় ঘটেছে। অধ্যাপক আইয়ুবের প্রাজ্ঞ সাহিত্য-মণ্ডলীর দরজা দিয়ে ভয়ে ভয়ে ঢুকেও গৌরীর উদার আতিথ্য ও আন্তরিক বন্ধুত্ব লাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, প্রায় চল্লিশ বছরের ক্রমপর্যায়ে। বিদগ্ধ স্বামীর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে জড়িত থেকেও, নানা সমাজসেবার ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব করেও, অধ্যাপক আইয়ুবের অসুস্থতার সময়ে তাঁর সযত্ন ও নিপুণ সেবাকর্ম সেরেও, নিজের অধ্যাপনার দায়িত্ব ও শেষের ভীষণ অসুস্থতা সহ্য করেও তার সংবেদনশীল হৃদয় ও মন কত যে সামান্য ও অসামান্য জনের চাহিদা মেটাতে সময় করে নিত, সাগ্রহে অন্য কারুর চাপা দুঃখের ভার, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অনায়াস সহৃদয়তার গুণে সে লাঘব করতে সর্বদা ব্যস্ত হয়ে পড়ত। এসব ঘটনা কত যে ঘটেছে, তার বিবরণ দেবার এখন দরকার নেই। শুধু এ কথা বলতেই হবে যে বুদ্ধি ও হৃদয়ের এমন শ্রেয়স্কর সংযোগ আমি আর কারুর মধ্যে এত অনুভব করিনি। সত্যি,

আমাদের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল।

মৈত্রেয়ীদেবী ও গৌরীর সঙ্গে এক আনন্দযজ্ঞে যুক্ত হবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে—'খেলাঘর' আশ্রমের গোড়াপত্তন থেকে। দুই মহীয়সীর পাশে দাঁড়িয়ে, অনাথ শিশুদের শিক্ষা ও আনন্দদানে সক্রিয় হওয়া কেমন করে যায়—ওঁদের সেই পদ্ধতি লক্ষ্য করে বারে বারে মুগ্ধ হয়েছি। এই সময়েই, ওঁদের দু'জনের সঙ্গে 'খেলাঘরে'র গাছের ছায়ায় বসে, মৈত্রেয়ীদির বিখ্যাত 'ন হন্যতে' উপন্যাসের ক্রম-জাগরণ উপভোগ কবা—আমাদের তিনজনের এক সংযুক্ত অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

এবারে পাটনার গৌরীর কথা আবার একটু বলতে চাই। পশ্চিমভারত-প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে একটা উদার অসাম্প্রদায়িকতা লক্ষ্য করা যায়—যা কেবল ধর্মীয় অর্থে নয়, প্রাদেশিকতার দিক দিয়েও বোঝা যায়। গৌরীর ঘরে ও বন্ধুমণ্ডলীতেও নানা জাতি, ধর্ম, ভাষা ও প্রদেশের মানুষ সহজে ও সানন্দে যোগদান করতেন, বিনা দ্বিধায়। তাছাড়া হিন্দী ও উর্দু ভাষা সে যে ভাবে আয়ত্ত করেছিল, তা আমাকে আশ্চর্য করত ও গভীর এক গর্ববোধ জাগাত। পাটনা-প্রবাসী বাঙালী গৌরীর এই আবেক চমৎকার ব্যক্তিত্ব।

সদ্য প্রয়াত জ্ঞানী অশীন দাশগুপ্ত মশাই তাঁর 'বিষয় স্বাধীনতা' বইয়ে যাকে 'স্থানীয় মানসিকতা' বলেছেন, তা আজকের ভারতবর্ষকে এক ভয়ংকর দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। সেদিক থেকে বেঁচে ফিরতে হলে, অশীনের মতে, ভারতের নিজস্ব এক সুস্থ, সভ্য মানসিকতার সাহায্য আমাদের নিতে হবে—'যা শান্ত, ভদ্র, নিরীহ অজস্র নরনারীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে'। এই মন 'অনেক শতাব্দীর মনীষার কাজ'। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও তাঁর সহধর্মীণী গৌরী, এই সভ্য পথের পথিক ছিলেন, তাই ভারতীয় সভ্যতা তাঁদের সহায়তার কথা কখনই ভুলতে পাবে না। চারিদিকের অমঙ্গল ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শান্তভাবে, অক্লান্তভাবে, এঁরা কাজ করেছেন-- মঙ্গলের জন্য, শ্রেয়-শক্তির জন্য। এঁরাই তো প্রকৃত 'ধার্মিক', যাঁরা নিজ বিশ্বাসকে শান্ত মনে ধরে রাখতেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মন্ত্র এখানে আমরা স্মরণ করি —'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য সাধনঞ্চ, তদুপাসনমেব'!—যে বিশ্বাসকে ভালবাসি, ও তারই প্রিয় কার্য সাধন করি—সেই তো উপাসনা।

সৌজন্য : রবীন্দ্রভাবনা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

[শ্রীমতী শ্যামশ্রী লাল স্বর্গত কালিদাস নাগের কন্যা ; পেশা : সমাজ ও সাহিত্যসেবা]

গৌরী আইয়ুব—এক স্বতন্ত্র বর্ণমালা

মন্দার মুখোপাধ্যায়

শিক্ষা জগতের এক জীবন্ত কিংবদন্তী গৌরী আইয়ুব। ছিলেন কথাটা লিখতে এখনও কলম সরছে না। শিক্ষাবিদ অনেকেই আছেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত মানুষজনের কথা ভাবতে বসলে প্রথমে গৌরীদির কথাই মনে আসে। মহাশ্বেতা দেবীর মত এই বাংলায়, এ যাবৎকালে আর যে নারী মেধা ও মননের চর্চ্চা করেছেন তিনি গৌরীদি। গৌরীদির কথা উঠলেই মনে পড়ে সর্বাঙ্গ সুন্দর এমন এক মানুষের কথা যাঁর কোনও ছোট মাপ হয়না।

বুদ্ধদেব বসুর একটি দীর্ঘ কবিতা ছাপা হয় অমৃত পত্রিকায় (২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৫)। পুনরুল্লেখ : প্রমা ১৪০২ চৈত্র সংখ্যা—গৌরীদিকে নিয়ে লেখা।

কনকমলেষু,

'প্রকৃতি তোমার প্রিয়, আসলে তা নিশ্চেতন জড় ;
নির্ভুল নিয়মে বাঁধা অনাদ্যন্ত কঠিন গণিতে।
জল নয় স্বেচ্ছাধীন ; বৈশাখে যা শূন্যে উড়ে যায়,
তাই ফেরে শ্রাবণ বর্ষণে ; গলিত তুষার নামে
অন্ধবেগে, গিরিগাত্রে প্রহত প্রখর ; ধায় নদী
অনিবার্য সমুদ্রের দিকে, সপ্ত সিন্ধু পরস্পরে
পরিপ্লুত হয়, তবু পৃথিবীতে প্লাবন আনে না,
শুধু দেয় সৈকতে তরঙ্গ শোভা..."।

এই কবিতারই চতুর্থ সর্গে—

"কল্যাণী ভার্যা ও মাতা, যদি ভাবো এ শুধু প্রলাপ
স্বাস্থ্যহীন বিকৃতের, তবু যেন তুমি যাকে বলো
সুন্দর তা নেই ব্যস্ত বহুরূপী পঞ্চভূতে..."

কবিতাটি পড়ে আবু সয়ীদ আইয়ুব আবার কবিকে একটি বড় চিঠি লিখেছেন। তাতে পুনশ্চ দিয়ে সংযোজন করেছেন—

"আপনাদের উপদেশমত গৌরী night club বা ballroom এ যাচ্ছেনা বটে, তবে দ্বিপ্রহরে বন্ধু বান্ধবী সমভিব্যাহারে সমুদ্র স্নান এবং সন্ধ্যার পর after dinner party-র শোভা বর্ধন করে আমার সামাজিক কর্তব্যের ত্রুটি মোচন করছে। আমি বাড়ী আগলাই এবং ফিরে এলে সুস্বাগত, সুপ্রত্যাগত ইত্যাদি অভিবাদন জানাই। দুজনেই জরদ্গব হলে তো আর চলে না, যদিও দুজনেই বাতে পঙ্গু।"

চিঠিটি গৌরীদি এখানেই শেষ করতে দেন নি। নিজস্ব ভঙ্গিতে কবিকে লিখেছেন—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু, আপনার চিঠি পেয়ে আমরা দুজনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। উপরের চিঠিটির হাতের লেখা আমার বাতে পঙ্গু আঙ্গুলের। দুষ্পাঠ্য হলে ক্ষমা করবেন। আইয়ুব আমার নৈশ ও দ্বিপ্রাহরিক অভিযানের কথা যতটা বাড়িয়ে বলেছেন তাতে আবার আপনারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না তো? ইতিমধ্যে আমাদের মোটা খবরগুলি প্রতিভাদিকে সবিস্তারে লিখেছি—পেয়েছেন নিশ্চয়ই।

প্রণতা
গৌরী

এ সব পড়তে পড়তে মনে হয় সে একটা সময় ছিল যখন প্রতিভা বসু, গৌরী আইয়ুব, রাজেশ্বরী দত্ত, এঁদের মতো গৃহিণীদের পেয়ে কবি, দার্শনিক, অধ্যাপকদের মনোজগতে প্রেম কত না স্বপ্ন বৈভবে মেতে বেড়াত।

১৯৮৩ সালে শ্রী শিক্ষায়তন কলেজে এসে আমি যে গৌরীদিকে পেয়েছি তিনি অনেকটাই অন্যরকম। তখন আইয়ুব চলে গেছেন। ছেলের বিয়ে হয়ে সে মুম্বই প্রবাসী। বেশিটাই কাটে ক্লাসরুম, বাড়ি আর 'খেলাঘরের' ভালো মন্দে মাথা ঘামিয়ে। তাই আমরা সকলেই জানতাম তিনি বিশিষ্ট। অনেক বড় একজন মানুষের স্ত্রী। নিজেও সম্মানিত। কিন্তু কত যে বড় তা কখনও খুঁটিয়ে বোঝবার চেষ্টা করিনি। গৌরীদির বাড়ির নানা অনুষ্ঠান, তাঁর রেসিপির কাবাব, তাঁর আনিয়ে দেওয়া বাংলাদেশি ঢাকাই, 'খেলাঘরের' ব্যাগ...এ সবের নিপুণ পরিচর্যায় তাঁকে অনায়াসে পেয়েছি। কোথাও কোনও কাজ আটকে গেছে—মুক্তোর মতো হাতের লেখায় ঝর ঝর করে দু 'কলম লিখে দিয়েছেন। কাজ হয়ে গেছে। আমাদের এই ছোট ছোট ব্যক্তিগত চাহিদার মধ্যে দিয়ে নিজেকে যখন ছড়িয়ে দিয়েছেন তখনও আমাদের ক্ষণেকের জন্যেও করুণা করেননি। কখনও খুব বড় মাপের হও বলে জ্ঞান দেবারও চেষ্টা করেন নি।

আবার নিজের যে বৃহৎমাপ, মূল্যবোধ, নৈতিকতার তীব্র আবেদন—তার প্রকাশেও তিনি ছিলেন অকুণ্ঠিত। এই কারণেই শ্রী শিক্ষায়তন কলেজকে সারস্বত সমাজ চিনতে শুরু করে গৌরীদির নামে। অথচ তিনি কখনও অধ্যক্ষ হন নি। হতে চাননি। এমন কি স্বল্পকাল দায় বহন করে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর পরবর্তী শিক্ষিকা শ্রীমতী উমা ঘোষকে। আবার এই গৌরীদিকেই দেখেছি কলেজ কর্তৃপক্ষের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। শিক্ষিকাদের মনোভাবে বা আচারে কোনও মালিন্য প্রকাশ পেলে, তাঁর প্রতিবাদ ছিল তীব্র, সোচ্চার এবং দ্বিধাহীন। আমরা তাঁকে গোলাপ দিয়ে হৃদ্যতা জানালে প্রকাশ্যে বলেছিলেন 'গোলাপের সঙ্গে কাঁটাগুলিও নিলাম'। একটি নির্দিষ্ট মূল্যবোধে, শিক্ষিত মননের মাপকাঠিতে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার অনেক চিন্তা ভাবনা তাঁর ছিল। আবার একই সঙ্গে ছিল এক অদ্ভুত উদাসীনতার অভিজাত্য যা তাঁকে কলেজের বাতাবরণের মধ্যেই স্বতন্ত্র করে রাখতো। কিছুতেই যেন নষ্ট হতনা তাঁর মগ্নতার বৈভব

কলেজের মধ্যে যেমন তাঁকে দেখেছি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায়, তাঁর নিজের পরিবার বা 'খেলাঘর'-কে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলতে দেখেছি তাঁর একেবারে অন্য রূপ। সেখানে মমতা আর সহ্যই যেন শেষ কথা। অকুণ্ঠচিত্তে যেমন তাঁর বাড়িতে আমাদের বার বার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তেমনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন 'খেলাঘরে' যাবার জন্য। কলেজে যখনই কোনও ভালো অনুষ্ঠান হয়েছে, চেয়েছেন সেটি খেলাঘরের ছেলে মেয়েদের দেখাতে। প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ছিলেন একথা বললে ভুল হবে। তিনি ছিলেন অগণতান্ত্রিকতার বিরোধী। কিন্তু 'সব হারাদের' জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যকে কখনও অনুপযোগী মনে করেন নি।

অবসর নেওয়ার পর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করে গৌরীদি হঠাৎই সুস্থ হয়ে গেলেন। একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে ওঁকে দেখলাম লাঠিছাড়া। হেঁটে এসে নিজেই চেয়ার টেনে বসলেন। চকিতে মনে হল, এ তো সেই দুর্দান্ত গৌরী দত্ত। পাটনা আর শান্তিনিকেতন দাপিয়ে বেড়ানো, পাঁই পাঁই করে সাইকেল চালানো, যুবক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতায় অভিনয় করতে উৎসাহে এগিয়ে আসা টইটম্বুর মেয়ে। এইই তো সেই—দু দশক এগিয়ে থাকা আইয়ুবকে স্বেচ্ছায় ভালোবেসে বিয়ে করবার মতো সাহসী গৌরী।

খুব অল্প সময়ের জন্যে হলেও সেই গৌরীদির কিছুটা ঝলক যেন আন্দাজ করেছিলাম।

আবার আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন রোগে। তবু গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, মানবেন্দ্র নাথ এবং আইয়ুবের পরিচর্যায় যে মানস তাঁর তৈরী হয়েছিল তা তো আক্রান্ত হবার নয়। সেই অক্ষয় ধন তাঁকে দিনে দিনে উজ্জ্বল করেছিল। তা না হলে শুধুমাত্র গুটিকয়েক বন্ধু আর পুত্রবৎ পরিচারক পুনদেওকে অবলম্বন করে কী করে তিনি বেঁচেছিলেন! এরই মধ্যে নিয়মিত লিখে গেছেন 'তুচ্ছ কিছু সুখ দুঃখ', 'এই যে অহনা', চতুরঙ্গ, দেশ, আনন্দবাজার এর পাতায় কিছু মনোজ্ঞ প্রবন্ধ আর প্রতিবাদপত্র। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কেতকী কুশারীকে তো তিনিই থামিয়েছিলেন। কারণ সেটা তিনিই পারতেন।

আইয়ুবের পর আর যে সম্পর্কজাত মানুষটি তাঁকে ক্রমে অধিকার করেছিল, সে তাঁর নাতনী শ্রেয়া। তাকে নিয়েই তাঁর সাম্প্রতিক বই 'এই যে অহনা'! অনেকদিন ধরেই যে এ বইটির প্রস্তুতি চলছিল তাব আভাস পাই একটি চিঠিতে। ৯ই অক্টোবর ১৯৯১, মুম্বই থেকে আমাকে লিখেছিলেন—

"অনেকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে এবং সেই সময়টা নাতনীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবো এটাই ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। ওর সাথে সারাদিন গল্প কবে, খেলা কবে, অভিনয় করে চমৎকার কাটছে। আপাতত রামায়ণ তাকে আবিষ্ট করে রাখে। পথে ঘাটে একখণ্ড পাথর পেলে তাতে চেপে দাঁড়ায়, এই আশায় যে সেও যদি কোনো অহল্যাকে বাঁচিয়ে বা জাগিয়ে তুলতে পারে রামের মতো। তবে তার নিজের মধ্যেই একটি অহল্যা জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। অসংখ্য প্রশ্ন করে, নানা রকম মজার মজার কথা বলে। অনুতাপ, অভিশাপ, আশীর্বাদ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে সাড়ে তিন বছরেই যে রকম বাক্য বিন্যাস করছে তাতে ঠাকুরমা তো মুগ্ধ। বালীকে অন্যায়ভাবে বধ করা জটায়ুকে হত্যা করা ইত্যাদি ব্যাপাবে তার মন এখনই বেশ বিচলিত। বার বার একই প্রশ্ন কবে নিজের ভাবনা-চিন্তাগুলিকে গুছিয়ে নিচ্ছে।

তবে **kindergarten** থেকে যখন ফেরে তখন বয়স কমে যায়। নেচে গেযে দেখাতে শুরু কবে তার অম্বিকা টীচার কি কি শিখিয়েছেন। ক্লাসের বন্ধুদের নাম শুনলে (অপেকষা=অপেক্ষা, মীমান্‌সা=মীমাংসা, প্রপঞ্চ নাতালিয়া, হালকিরণ=হরকিবণ .) দাঁত কপাটি লাগে। ও সবসময়ই আমাকে শুদ্ধ উচ্চারণ শেখাচ্ছে।"

সেদিন যখন কাঁচের গাড়িতে কবে গৌরীদি চলে যাচ্ছেন হাসপাতালের ছাত্রদের পড়বার কাজে লাগবেন বলে, আমার মনে পড়ছিল, কলেজে, ওঁর অবসব গ্রহণেব শেষ দিনটির কথা। তিনটে পনেরোর শেষ ক্লাসটি করে, বিকেল বেলা রেজিস্টারটি জায়গায় বেখে, সমবয়সী সহকর্মী অধ্যক্ষ লীনাদির ঘরের সামনে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে 'টা টা' করে চলে গেলেন। লীনাদিও ঘাড় নাড়লেন। পুনর্নিয়োগ, বিদায় সম্বর্দ্ধনা, মানপত্র, চোখের জল কোনও কিছুরই তোয়াক্কা না করে।

এ দিনও হয়তো কোনও একজনও বন্ধু বা আত্মীয় না হলে পরিচারক পুনদেওকেই টা টা করে চলে যেতেন। অক্লেশে। চূড়ান্ত আভিজাত্যে। অমলিন তেজে।

সৌজন্যে : শিক্ষায়তন পত্রিকা, ১৯৯৭-৯৯

[শ্রীমতী মন্দাব মুখোপাধ্যায়-এব পেশা অধ্যাপনা নেশা সাহিত্যসেবা]

গৌরীদি—

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্তা গৌরী আইয়ুব। আমাদের গৌরীদি। ওঁর প্রসঙ্গ উঠলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একখানি সদাপ্রসন্ন, পরিচ্ছন্ন হাসি মুখ। কিন্তু শরীরে এত কষ্ট থাকা সত্ত্বেও মুখের হাসিটি কি করে এমন অম্লান থাকে! কতখানি মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন—ভাবলে বিস্ময় হয়।

সে কতদিন আগের কথা যখন আমি এই কলেজে লাইব্রেরির দায়িত্ব নিয়ে এলাম। সেই প্রথম থেকে গৌরীদির সঙ্গে আমার যোগাযোগ, যা অটুট ছিল ওঁর কলেজ থেকে অবসর নেবার দিনটি পর্যন্ত। লাইব্রেরি নিয়ে যখনই আমার কোন সমস্যা হয়েছে বা নতুন কিছু করতে চেয়েছি—ছুটে গিয়েছি ওঁর কাছে। উনি মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন আমার প্রতিটি কথা এবং পরামর্শ দিয়েছেন। কিভাবে কাজটা আরো ভালো ভাবে করা যায়। তাতে অনেক সময় হয়ত আমার দায়িত্ব বেড়েই গেছে। কিন্তু কাজটা সুষ্ঠু ভাবে করতে পেরে একদিকে যেমন আনন্দ পেয়েছি অপরদিকে বেড়েছে আত্মবিশ্বাস। তিনি একজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য দিদি ছিলেন আমার।

এখন যে বিশাল ঘরটিতে স্টাফ রুম সেটিতে ছিল তখনকার লাইব্রেরি। আর এখনকার অফিস ঘরটি ছিল তখনকার স্টাফ রুম। ফলে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা খুবই সুবিধাজনক ছিল। লাইব্রেরি থেকে দু'পা এগোলেই ওঁকে পাওয়া যেত। উনিও নিয়মিত লাইব্রেরিতে আসতেন। ওঁর নিজস্ব বিষয়—এডুকেশন-এ কি বই আছে, কি নেই, কোথায় নতুন বই বেরোল বা কোন জার্নালে নতুন কোন প্রবন্ধ বের হল, এ সবই ছিল ওঁর নখদর্পণে। নতুন বই কেনায় যেমন ছিলেন উৎসাহী, তেমনি আগ্রহী ছিলেন বইএর সুলুক সন্ধানে। এডুকেশন বিষয়টিতে একটা মজার ব্যাপার এই যে বিশ্ববিদ্যালযের যেসব বইয়ের উল্লেখ থাকে পঠন-পাঠনের জন্য,—বেছে বেছে সেই বইগুলি কখনই দোকানে কিনতে পাওয়া যেতনা। হয় বাজারে নেই নয় ছাপা নেই। ফলে ছাত্রীরা ত বটেই শিক্ষিকারাও খুবই অসুবিধায় পড়তেন। এ ব্যাপারটি এখনও আছে, তবে আগের চাইতে অনেক বেশী বই এখন বাজারে পাওয়া যায়। অনেক বই নতুন করে ছাপা হয়েছে। বেরিয়েছে অনেক বইয়ের ভারতীয় সংস্করণ। তখন জেরক্স-এর সুবিধাও ছিল না। ফলে কোন শিক্ষিকার হয়ত নিজের ছাত্রাবস্থার বই আছে—তা থেকে সাইক্লোস্টাইল করিয়ে, তাকে বাঁধিয়ে নিয়ে, বইয়ের মত করে ছাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা হল কয়েক কপি। তারা লাইব্রেরীর মাধ্যমে সেটা নিত। এ প্রসঙ্গে উমাদি (শ্রীযুক্তা উমা ঘোষ)-র কথা খুব মনে পড়ছে। উমাদি আর গৌরীদি দুজনে মিলে এসব ব্যবস্থা করতেন। বিশেষত, বই কেনার ব্যাপারে এই দুজন প্রচুর সময় এবং শ্রম দিতেন।

কয়েকবছর পর যখন লাইব্রেরী বর্তমান অবস্থানে, সুইমিংপুল-এর ওপরে এল, গৌরীদির পক্ষে আর আসা সম্ভব হতনা এখানে। কিন্তু শারীরিক ভাবে লাইব্রেরিতে উপস্থিত না হয়েও কিভাবে নিয়মিত লাইব্রেরি ব্যবহার করা যায়, তার এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। কোন বই কিনতে পাওয়া যাচ্ছেনা তার খবর নেয়া, তাকে জেরক্স করানোর জন্য অধ্যক্ষের অনুমতি নেওয়া, লাইব্রেরী মারফৎ তাকে জেরক্স করে বাঁধিয়ে নিয়ে, মেয়েদের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি এত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতেন যা দেখে শিখেছি অনেক কিছু। এছাড়া প্রতিবছর লাইব্রেরির স্টক টেকিং-এর সময় আমাদের বলবার আগেই নিয়মিত

বই ফেরৎ দেওযা, অথবা রিনিউ করা—এমন সময়মত করতেন যে ভাবলে এখনও শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

গৌরীদির প্রসঙ্গে আরো একটি ব্যাপার আমাকে খুব নাড়া দিত। তা হল যখনই কিছু বলতেন আমাকে এত মার্জিত অথচ স্বচ্ছ ভাষায় বলতেন যে আজও মনে পড়ে। লাইব্রেরি সম্পর্কে কোন কিছু জানতে চান বা জানাতে চান, অথবা কোন বই দেখতে চান, তার জন্য বাংলায়, অত্যন্ত সুশ্রী হস্তাক্ষরে, এমন বিনীত একটি চিবকুট পাঠাতেন যা আমাকে অভিভূত করত।

শুনি আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মা অমর। মানুষ পূর্ণ থেকে এসে আবার পূর্ণতেই মেলে। তা যদি হয়, গৌবীদি আপনি যেখানেই থাকুন আমাব সশ্রদ্ধ প্ণাম গ্রহণ করবেন।

সৌজন্যে : শিক্ষায়তন পত্রিকা, ১৯৯৭-৯৯

[শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, শ্রী শিক্ষাযতন কলেজেব গ্রন্থাগাবিক]

সুরাহা সম্প্রীতির সভানেত্রী

ইন্দ্রাণী বসু

সকলের জন্য সব সময় ওঁর দরজা খোলা থাকতো। প্রায় এগারো বছর আগে যে দরজা দিয়ে আমিও প্রথম ঢুকেছিলাম গৌরী আইয়ুবের পার্ল রোডের বাড়ীতে। তাঁর আগে ওঁর লেখা-পত্রের সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিলো। আমার শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা ডঃ মীরাতুন নাহারের উৎসাহ ও বিস্ময় ব্যক্তি মানুষটির প্রতি আমাকে কৌতূহলী করে তোলে। তিনিই আমাকে প্রথম সেখানে নিয়ে যান।

তখন গৌরীদির ঘরে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মশতবর্ষ পালনের প্রস্তুতি চলছিলো। সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় জ্ঞানী-গুণী মানুষের ভিড়ে প্রথম দর্শন করেছিলাম সেই মুক্ত মনের মানুষটিকে। ছোটো-খাটো চেহারা গৌরবর্ণে উজ্জ্বল। চোখে-মুখে স্নিগ্ধ প্রশান্ত হাসি। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যেও লক্ষ্য করছিলেন, সবাই চা বা খাবার ঠিকমত পেয়েছেন কিনা, কে নোন্তা নেননি, কে মিষ্টি নেননি—সব কিছু। মীরাতুন দিদি ওর সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দেবার পর আমাকে নিজের পাশে বসালেন। সুন্দর ভাবে স্বচ্ছন্দে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। নিজের হাতে খাবারের প্লেট আমার সামনে তুলে ধরলেন। প্রথম আলাপে ওঁকে এতটুকু অপরিচিত বলে মনে হ'লোনা। আজাদের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। ছোট-বড়—সবাইকে যে উনি সমান গুরুত্ব দেন, সেদিনই বুঝেছিলাম।

এরপর মীরাতুন দিদির সঙ্গে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে আমরা গড়ে তুললাম আমাদের প্রিয় সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'সুরাহা-সম্প্রতি'। গৌরীদিকে সুরাহা ও সম্প্রীতি—উভয়েরই প্রতিমূর্তি বলে আমাদের মতো হ'তো। আমাদের একান্ত ইচ্ছায় তিনি 'সুরাহা-সম্প্রীতির' সভানেত্রীর পদটি অলঙ্কৃত করেন। আ-মৃত্যু তিনি সেই পদেই আসীন ছিলেন। তাঁর অমূল্য

অভিজ্ঞতা ও মূল্যবান মতামতের ওপরই গড়ে উঠলো আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভিত।

'সুরাহা সম্প্রীতি' প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে একটু বলি। ১৯৮৯ সালে জন্ম নেওয়ার পর থেকে এই সংস্থা বেগম রোকেয়ার আদর্শ মেনে কাজ শুরু করেছে। প্রথম থেকেই মীরাতুন নাহার সংস্থাটিতে সম্পাদিকার ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সহসভানেত্রী কিশওয়ার জাহানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন, সংস্থাটির কার্যকারিতায়। অর্থকষ্টে জর্জরিত অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মনে আশা জাগাতে আমরা রোকেয়া বৃত্তির ব্যবস্থা করেছি। প্রতিমাসে আমরা ন্যূনতম দশজন ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার ব্যয় বহন করি। প্রতিবছর রোকেয়ার জন্মতারিখটিকে কেন্দ্র করে আমরা নিবেদন করি বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৯৯০ সালে প্রথম বছর রোকেয়ার কর্মজীবন ও সাহিত্যকে বিষয় ক'রে রোকেয়া স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় বছর থেকে এই অনুষ্ঠানে অতীতের কোনো উপেক্ষিত ব্যক্তিত্বের অবদানকে স্মারক বক্তৃতার বিষয় হিসাবে নির্বাচন ক'রে আলোচনার ব্যবস্থা ক'রে চলেছে এই প্রতিষ্ঠান। অধুনা বিস্মৃত কাজী আবদুল ওদুদ, শৈলবালা ঘোষ জায়া, বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ, পরিমল রায়, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী ও ডঃ হিরন্ময় ঘোষালের পর আফসারুন্নেসার জীবন ও সাধনাকে আলোচ্য বিষয় করা হয়েছে। বিভিন্ন বছরে আলোচকরা ছিলেন যথাক্রমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল আলম, অধ্যাপক স্বরাজ সেনগুপ্ত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, মানসী দাশগুপ্ত, প্রখ্যাত সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক, মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়, রেজাউল হক, ডঃ ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী অনুসূয়া বসু রায়চৌধুরী, তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ মণ্ডল, ডঃ শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়, সলিল দাশগুপ্ত, মানসী দাশগুপ্ত, ডঃ সুমিতা চক্রবর্তী ও ডাঃ কামাল হোসেন। এ পর্যন্ত যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি সভাপতি বা প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেছেন, তাঁরা হলেন, প্রাক্তন বিচারপতি স্বর্গত সাদত আবুল মাসুদ, ডঃ অমলেন্দু দে, শিবনারায়ণ রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, ডঃ তপোব্রত ঘোষ, অম্লান দত্ত, লীনা সেনগুপ্ত, ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাতো, মহম্মদ আমীর হোসেন ও সাধন চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে রোকেয়া পুরস্কার দেওয়া হয় প্রতিকূলতা অতিক্রম করে জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়া কোনো নারীকে কিংবা বিশেষ কারণে সম্বর্ধনা ও মানপত্র প্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়। এ পর্যন্ত যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন, তাঁরা হ'লেন, বিজ্ঞানী ডঃ রুকসানা চৌধুরী, কোলাজ শিল্পী শাকিলা খাতুন, অন্ধ শিক্ষিকা অঞ্জলি রায়, পুলিশ অফিসার জাহানারা বেগম, সমাজ সেবিকা অলকা কাঁড়ার, অধ্যাপিকা মকসুদা খাতুন ও হিউম্যানিটি হস্‌পিটালের প্রতিষ্ঠাত্রী সুবাসিনী মিস্ত্রী, যাঁর পেশা সবজি বিক্রয়। সম্বর্ধনা ও মানপত্র প্রদান করা হয়েছে রোকেয়ার সাক্ষাৎ ছাত্রী ও সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা নুরুননেসা বেগমকে*। সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠানের শেষ আকর্ষণ থাকে রোকেয়া অথবা সেদিনের আলোচ্য ব্যক্তিত্ব-রচিত কাহিনীর নাট্যরূপ বা গীতি-আলেখ্য। গৌরীদি আমাদের আদেশ বা নির্দেশ দিয়ে শেখানো পছন্দ করতেন না। তাঁর বলার ভঙ্গী ছিলো অনেকটা এইরকম—'এটা করলে ভাল হয়'। কিংবা, ব্যাপারটা 'এইভাবে ভাবলে ভালো হত না?' অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গীতে তিনি আমাদের শেখানোর চেষ্টা করতেন। কখনো কোনো সরাসরি উপদেশের ভঙ্গীতে নয়।

উঁচু ধাপের মানুষ, অথচ বিনয়ী—এমন চরিত্র আজকের দিনে সত্যিই বিরল। এমনই একজন

*অতি সম্প্রতি ইনি প্রয়াতা হয়েছেন। আমরা শোকাহত।

ব্যক্তিত্বকে আমরা কাছে পেয়েছিলাম—এ শুধু আমাদের সৌভাগ্যই নয়, আমাদের গর্বও বটে। আমাকে লেখা ৮।১২।৯৫-এর একটি চিঠিতে উনি লিখেছিলেন, "প্রতি মাসে যথাসময়ে সুরাহার খবর পাচ্ছি, কিন্তু প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়না। সেজন্য ক্ষমা কোর।" আর এক জায়গায় মীরাতুন দিদির অসুস্থতা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—"নিজে আমি এত অপদার্থ যে কারুর জন্যেই সামান্য কিছুও করতে পারিনা।" তাঁর এই উক্তির মূলে ছিলো তাঁর নিজেরও অসুস্থতা বা শারীরিক অক্ষমতা। কিন্তু মনটি যে কত সুন্দর ও সক্রিয় ছিলো, তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না। তিনিই আমায় প্রথম শিখিয়েছিলেন যে, খ্রীষ্টান বা মুসলিম ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার নামের আগে 'শ্রী' বা 'শ্রীমতী' ব্যবহার করা একটি শোভন প্রথা। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে চিঠিতে এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য তিনি উপস্থাপন করেন।

নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দুপুর বেলা ওঁর বিশ্রামের সময়েও তাঁর কাছে যেতে বাধ্য হয়েছি। তখনও ওঁকে বিব্রত হতে বা অপ্রস্তুত হতে দেখিনি। মুখের হাসি এতটুকুও ম্লান মনে হয়নি। আমাকে যত্ন করে বসিয়েছেন, খাইয়েছেন। নিজে না খেয়ে আগে আমার কাজ ক'রে দিয়েছেন। আসার সময় আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখে হাসি মুখে বলেছেন, "আমার কোনো অসুবিধা বা কষ্ট হয়নি। কারুর জন্য সামান্য কিছু করতে পারলেও আমার ভাল লাগে।"

কতবার উনি আমাদের বলেছেন—"কেন তোমরা আমায় 'সুরাহা সম্প্রীতি'র সভানেত্রী হিসাবে এখনও রেখেছ? একজন পঙ্গু মানুষকে এভাবে ধরে রেখে লাভ কী?" আমি উত্তরে চিঠিতে একই কথা বারবার লিখতাম, 'আপনিই আমাদের অনুপ্রেরণা'।

বিছানার উপর বসে বসেই তিনি আমাদের কতরকম পরামর্শ দিতেন, ভাবাতেন, যা আজকেও আমাদের পরম পাথেয়। হিন্দু ও মুসলমান—উপমহাদেশের এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কত সুন্দরভাবে মিলন সেতু রচনা করা যায়, তা আমি ওঁর থেকে শিখেছি। আমার বিশ্বাস, যাঁরা ওঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরাও সবাই এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছেন, প্রভাবিত হয়েছেন।

আমাদের 'সুরাহা সম্প্রীতি'র সীমিত কর্মপরিসরে তাঁর আদর্শকে আমরা অন্তরের গভীরে অনুভব করি। তাঁর ঘরটি ছিলো আমাদের কাছে তীর্থক্ষেত্র। সে ঘর এখন ফাঁকা। কিন্তু সেই হাসিমাখা মুখ প্রতিনিয়তই যেন আমাদের শুভ কামনা জানাচ্ছেন। একবারও মনে হয় না যে তিনি আর নেই।

তাঁর মতো মানুষের সান্নিধ্য যে এ জীবনে পেয়েছি, একথা ভাবলেই এখন ভারী অবাক লাগে। আমাদের অন্তরে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি চিরকাল অনুভব করবো।

[শ্রীমতী ইন্দ্রাণী বসু-র পেশা শিক্ষকতা, নেশা সমাজসেবা, রোকেয়া স্মৃতি সহায়ক সংস্থা সুরাহা-সম্প্রীতির সহ-সম্পাদক]

'মিসেস আইয়ুব'

কিশওয়ার জাহান

'মিসেস আইয়ুব'—এইভাবেই সম্বোধন করতাম তাঁকে। আমার সাথে তাঁর পরিচয় খুব বেশি দিনের নয়। তাঁর চলে যাওয়ার বছর বারো আগে তিনিই তাঁর সেবক মারফত একটা চিঠি পাঠিয়ে সেই আলাপের সূত্রপাত করেছিলেন। সবাই জানেন তাঁর হস্তাক্ষরে তাঁর পরিচ্ছন্ন মন আর সুন্দর চেহারার প্রতিফলন ঘটত। সেই মুক্তাক্ষরে লেখা একটা চিঠিতে জানিয়েছিলেন, আমার সম্বন্ধে, আমার সমাজসেবামূলক কাজকর্ম সম্বন্ধে শুনেছেন। তাই আলাপ করতে আগ্রহী। একটা বিশেষ তারিখ ও সময়ের উল্লেখ করে লিখেছিলেন ওই সময় তাঁর বাড়ীতে আরো কয়েকজনকে ডেকেছেন, আমিও যদি যেতে পারি খুশী হবেন তিনি। নীচে পুনশ্চ দিয়ে জানিয়েছিলেন, ওই নির্দিষ্ট দিনটির আগে একটু সময় নিয়ে আগে থেকে ফোন ক'রে যদি একবার দেখা করি তবে আরো ভাল হয়। নিজের শারীরিক অসুবিধার কথাও জানাতে ভোলেন নি এবং সেই কারণেই আমাকে যেতে অনুরোধ করতে হচ্ছে বলে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।

গৌরী আইয়ুবকে তাঁর ঘরে একা পাওয়া সহজ ছিল না। অতিথি অভ্যাগতরা তাঁকে ঘিরে থাকতেন সব সময়। কিন্তু আমাদের পরিচয়ের প্রথম দিনটিতে একেবারে একা পেয়েছিলাম তাঁকে অনেকটা সময়ের জন্য। অনেক কথা হয়েছিল। গৌরী আইয়ুব খুব ধৈর্যশীল শ্রোতা ছিলেন। কিন্তু সেই প্রথম আলাপের দিনটিতে তিনিও অনেক কথা বলেছিলেন আমাকে। সব কথা ঠিক ঠিক ভাবে মনেও নেই। আর জানাবার এটা জায়গাও নয়। তবে একটা কথা তিনি আমাকে ব'লতে চেয়েছিলেন এবং সেটা জানিয়েও ছিলেন অকপটে। তিনি জানতেন আমি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছি। এই ধরণের কাজে আমার যে অভিজ্ঞতা তার দাবীদার যে আমার নিজের সমাজও এই কথাটাই বোধহয় তিনি আমায় মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মুসলমান সমাজের জন্য এই সমাজের মানুষের যে কিছু করার আছে, বিশেষ ক'রে শিক্ষিত সমাজ-সচেতন মানুষকে এই সমাজের কথা ভাবতে হবে, তাদের জন্য কিছু করতে হবে এই কথাটা খুব সাবলীলভাবে আমাকে বুঝিয়েছিলেন সেদিন। আমি নিজে ধর্ম মানি এবং তার পার্থিব দিকগুলো শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলি। সেদিক থেকে মিসেস আইয়ুবের সঙ্গে ছিল আমার দুস্তর ব্যবধান। কিন্তু ধর্মকে একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করে আমার সমাজসেবার কাজের সাথে তাকে মিলিয়ে ফেলিনি কখনও। আমার অভিজ্ঞতা আমাকে সমাজকে দু'ভাগে ভাগ করতে শিখিয়েছিল—ধনী এবং দরিদ্র আর তারই সাথে জড়িয়ে থাকা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণী। উনি বলতে চেয়েছিলেন কোন সমাজের সংকটকালে সেই সমাজের মানুষকেই সদিচ্ছা আর সাহস নিয়ে সংকট নিরসনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। হিন্দু সমাজেও তাই হয়েছে। পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজের জাগরণের জন্য শিক্ষিত উদার মনের মানুষদের তাই এগিয়ে আসা দরকার।

আমাদের সেদিনের আলোচনায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বারেবারেই ফিরে ফিরে আসছিলেন। আজকে পশ্চিমবঙ্গে রোকেয়া চর্চা যেটুকু হচ্ছে তার সূচনা কিন্তু ক'রেছিলেন মিসেস আইয়ুবই। বেগম রোকেয়ার একশ বৎসরের জন্মদিনে নির্বাসন থেকে টেনে এনে বাংলার বিদ্বৎ সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন গৌরী আইয়ুব তাঁর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিশেষ নিবন্ধে। বেগম রোকেয়ার মতোই গৌরী আইয়ুবও একটা মুক্ত, সুস্থ, শিক্ষিত নারী সমাজের ছবি আঁকতেন মনে মনে।

উদার মুক্তমনের কিছু হিন্দু মুসলমান মানুষকে নিয়ে সদ্যগঠিত একটা মঞ্চ 'সুরাহা-সম্প্রীতির' কথা তিনি আমায় জানিয়েছিলেন আমাদের আলাপের সেই প্রথম দিনটিতেই। শাহবানু মামলার পর বা যখন মুসলিম মহিলা বিল পাশ হলো কিংবা বলা যেতে পারে বিভিন্ন সংকটকালে একটা অরাজনৈতিক মঞ্চের অভাব অনুভব করতাম আমিও। সেদিন ঠিক ওই ধরনের একটা মঞ্চেব কথা জেনে খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম মনে মনে।

গৌরী আইয়ুবের বাড়ীর কফির কি একটা আলাদা স্বাদ ছিল? জানি না। তবে এই দিনটিতে সেই কফি পানের সূচনা হয়েছিল। এরপর বহুবার এই সুস্বাদু কফিপানের সুযোগ ঘটেছে এবং ওঁর সাথে পরিচয়ের কয়েক বছরের সুখস্মৃতির সাথে এই অপূর্ব কফির স্বাদও এখনও ভুলে যেতে পারি নি। প্রথমদিনেব আলাপচারিতার পরদিন সকালে একটা টেলিফোন পেয়েছিলাম। জানিয়েছিলেন, আমাব সাথে কথা বলে খুবই খুশী হয়েছেন। স্বল্পকাল গড়ে-ওঠা সুবাহা-সম্প্রীতিব তিনি ছিলেন সভানেত্রী। আমাকে তিনি সহ-সভানেত্রী হওয়ার অনুরোধ জানান। আমি সানন্দে সম্মতি দিই।

সুরাহা-সম্প্রীতি নিযে একটা ঘটনার কথা খুব মনে পড়ছে। এই ঘটনা দুজন সহজ, সরল, সমাজ সচেতন, মুক্তবুদ্ধির অহং-বোধহীন মানুষকে বুঝতে সাহায্য করবে। সুরাহা সম্প্রীতির প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানে সভাপতি ক'রে আনা হয়েছিল জাষ্টিস এস. এ. মাসুদ সাহেবকে। রোকেয়া স্মাবক বক্তৃতার আয়োজন কবা হয় প্রত্যেক বৎসরই। সেবারই তার শুরু। বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনা ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় যোগ দিতে এসেছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রোকেয়ার 'পদ্মরাগ' উপন্যাসকে শ্রুতি নাটক হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান সভাপতি মাসুদ সাহেব এতোই অভিভূত হয়েছিলেন যে তাঁর বক্তৃতায় তিনি জানিয়েছিলেন, জীবনে বহু সভায় তাঁব উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে কিন্তু এতোখানি জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়ে তিনি কোথা থেকে ফিরে যান নি। তিনি সুরাহা-সম্প্রীতিতে যোগদানের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন প্রকাশ্য সভায়। পরে এই ইচ্ছা নিয়ে তিনি মিসেস আইয়ুবের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। মাসুদ সাহেবের মতো বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞানী মানুষ যোগ দিলে তাঁকেই যে সুরাহা-সম্প্রীতির সভাপতি করা উচিত এ-কথা ভেবে গৌবী আইয়ুব পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন। মাসুদ সাহেব জানালেন বেগম রোকেয়াব রচনা এবং এখানে যেভাবে তার চর্চা শুরু হয়েছে সেসব সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের অপ্রতুলতার কারণে তিনি গৌরী আইয়ুবের স্থলাভিষিক্ত হতেই পারেন না। আমি তখন সুরাহা-সম্প্রীতির সহকারী সভানেত্রী। ওঁদেব দু'জনের এইসব কথাবার্তা শুনে ভারি প্রীতি অনুভব করতাম। চারিদিকে অহং-এব নির্লজ্জ প্রকাশ দেখতে অভ্যস্ত আমি এঁদের দু'জনেব এই বিনয়, নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান সম্বন্ধে উদাসীনতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তাবপরেই চারদিন হাসপাতালে কাটিয়ে হয়তো আরো কোন বৃহত্তর মঞ্চের সভাপতিত্বের আহ্বান পেয়ে মাসুদ সাহেব আমাদের ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে গেলেন। গৌরী আইয়ুব আমৃত্যু সুরাহা-সম্প্রীতির সভানেত্রী রয়ে গেলেন।

কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের পর লেখার কাজে মন দেবেন এই রকম ইচ্ছা পোষণ করতেন মনে মনে। মুম্বইতে ছেলের কাছে গিয়ে পায়ের অস্ত্রোপচারের পর সত্যি ভাল ছিলেন বেশ কিছুদিন। সেখান থেকে লেখা চিঠি পড়ে মনে হতো ওখানে নাতনীর বিশেষ আকর্ষণ সত্ত্বেও কলকাতার খবরের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন।

ক'লকাতায় ফিরে খেলাঘরেও যেতে শুরু করেছিলেন। সকালে নিয়ম ক'রে লিখতেও ব'সতেন। সন্ধ্যেবেলাটা তো বাড়িতে চাঁদের হাট। কিন্তু দূর্ভাগ্য আমাদের—এর কিছুদিন পর

থেকেই হাত দুটো আস্তে আস্তে তাদেব কর্ম-ক্ষমতা হারাতে শুরু ক'রল। যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁরা জানেন কি অসহ্য কষ্ট সহ্য করেছেন তিনি নিঃশব্দে।

ওই সময় আমি মাঝে মাঝেই ওঁকে দেখতে যেতাম। মাঝে মধ্যে টেলিফোনে খবর নিতাম। টেলিফোন করলে নিজেও কথা বলতেন। মৃত্যুব বোধহয় মাস-খানেক আগে আমি শেষবার তাঁকে দেখেছি। সন্ধ্যেবেলা টেলিফোনে খবর নিলাম। উনি দু'একটা কথা বললেন। আমার খুব ইচ্ছা একবাব দেখতে যাওয়ার বুঝতে পেরেই বললেন—তক্ষুনি যেন চলে যাই। তখন কারো সাথে সহজে দেখা করতে চাইতেন না বলে ঘব খালিও আছে—তাও জানালেন।

আমি মিনিট পনেবোর মধ্যে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা নিয়ে পৌঁছে গেলাম। ফুলটা মাথাব কাছে ফুলদানিতে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই সময় ওঁর চোখে আলো সহ্য হতো না। ঘরের আলো বন্ধই ছিল। পাশেব ঘব থেকে আলোব আভাস আসছিল কিছুটা। মনে পড়ছে চাঁদেব আলোও এসে পড়ছিল জানলা দিয়ে ঘরেব মেঝেতে। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর দুজনেব মুখেই কথা ছিল না। যন্ত্রণায় ক্রমাগত ছটফট করছিলেন। মুহূর্তেব জন্যও এক জায়গায় স্থির থাকতে পারছিলেন না। অথচ মুখে কোন শব্দ নেই। আমি পাশের সোফাটায় বসেছিলাম কফিব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এক সময় বললেন, আজকাল কাবো সাথে দেখা করি না, বলুন তো করা কি উচিৎ? বুঝলাম সহানুভূতি নিতে কুণ্ঠা বোধ কবেন। আমি উঠেই পড়ছিলাম, অনুরোধ কবলেন আর একটু বসতে। ঠিক এই সময় এক দম্পতি কোনরকম অনুমতি ছাড়াই ঘরে এসে ঢুকে পড়লেন। এই পাড়ায় এসেছেন কোন নিমন্ত্রণ বাখতে বহুদূব থেকে। প্রিয়জনটিকে একবার দেখে গেলেন। ভদ্রলোক কোন একটা বইয়ের খোঁজ কবছিলেন। 'পাশের ঘরে সব বই-ই তো আছে। যা প্রয়োজন নিয়ে যেতে পারেন'—জানালেন মিসেস আইয়ুব। বইটা সম্ভবত খুঁজে পেলেন না ভদ্রলোক। ঘরে এসে বসতেই গৌরী আইয়ুব তাঁদের মনে করিয়ে দিলেন রাত আটটা বেজে গেছে—তাঁদের ডিনারের বোধহয় দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওঁরা চলে গেলেন।

আমিও উঠব ভাবছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়ল আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ক্লান্ত দুটো চোখ। আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—খুব কষ্ট, না? এই প্রথম শুনলাম 'ভীষণ কষ্ট। কি করে যে সহ্য করছি! তবে করছি তো: আমার মনে হয় আমি সাবাদিন ধরে এতো কষ্ট সহ্য করি শুধুমাত্র রাত দশটায় কামাল আসবে সেই আশায়। বিশ্বাস করুন ও এলে আমার সব কষ্ট কোথায় উধাও হয়ে যায়।'

ওই সময় সুলেখক ডাক্তার কামাল হোসেন রোজ রাত দশটায় আসতেন সারাদিনের কাজ শেষ ক'রে। মিসেস আইয়ুব তাঁর স্মৃতিচারণ করতেন আর কামাল তা লিখে নিতেন। পরে কামাল আমায় জানিয়েছিলেন ঠিক ওই সময় তিনি আইয়ুব সাহেবের সাথে তাঁর সম্পর্কেব সূত্রপাত ও তার পরের ঘটনাগুলির স্মৃতিচারণ করছিলেন।

প্রেমের এমনই জাদু তার স্মৃতিচারণেও শরীরের ওই অসহ্য কষ্ট অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও তিনি ভুলে থাকতে পারতেন। পার্থিব প্রেমের এমন মহিমা আমার তো বিশেষ চোখে পড়ে নি। তবে গৌরী আইয়ুবের ভালবাসা যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা জানেন ভালবাসায় নেশাগ্রস্ত কবে রাখার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, সৌন্দর্য সব ছাড়িয়ে তাঁর মানুষকে ভালবাসার ক্ষমতা তাঁকে পরিচিতজনের কাছে প্রিয়তম করে রেখেছে।

[কিশওয়ার জাহান অলবেঙ্গল উওমেন অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম,
সুরাহা-সম্প্রীতির বর্তমান সভানেত্রী]

গৌরীদি—দুচার কথা

মনোজ দত্ত

সত্তরের দশকের প্রথম দিকে আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, তাঁর বিদূষী স্ত্রী গৌরী আইয়ুবের কথাও হিউম্যানিষ্ট মহলে শুনি। কিন্তু কখনও ৫নং পার্ল রোডে তাঁদের বাসায় যাবার কথা ভাবিনি। শেষে যাওয়া হলো তবে সাহিত্যের জন্য নয়, জরুরী অবস্থা জারী হবার পর সরকারের বিরুদ্ধে গোপন লেখা তৈরীর ব্যাপারে বাবলু (দেবব্রত রায় চৌধুরী) আমায় গৌরীদির বাসায় নিয়ে গেল। সেদিন সে-লেখা হয় নি, কিন্তু আজও মনে আছে ঐ বাড়ীর পরিশীলিত আবহাওয়ায় বেশ আস্তে কথা বলতে হচ্ছিল। আরও বিশেষ করে অসুস্থ আইয়ুব আমাদের সরকার বিরোধী কাজের কথা জানতে পারলে উদ্বিগ্ন হবেন – সেজন্যেও আমাদের সাবধান হতে হচ্ছিল।

এরপর গত তেইশ বছর ধরে ঐ বাড়ীতে অজস্রবার গিয়েছি, কখনও কোন সামাজিক বিষয়ে আলোচনার জন্য, কখনও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সভা বা পদযাত্রা করার জন্য, কখনও বা গৌরীদির স্নেহের টানে। আমার ভালোলাগার একটি কারণ ছিল এই যে তিনি কারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ থেকে বা নিজের কোন লাভের জন্য কোন আন্দোলনে যোগ দেন নি। ইন্দিরা-সরকারের বিরোধিতা করেছিলেন কেবল গণতন্ত্রের জন্য; কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বেষ থেকে নয়। আবার সি পি এম আমলে যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বিজন সেতুতে আনন্দমার্গীদের মারা হলো, পুলিশ এলো না, তখন সেই অমানবিকতার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ মিছিলের সোচ্চার সমর্থক ছিলেন তিনি। তাঁর কথা ছিল বামমার্গী অথবা দক্ষিণমার্গী সবারই প্রাণের দাম আছে, কাউকে পিটিয়ে মারা অমানুষিক।

চুরাশি সালে ইন্দিরা খুন হবার পর হাজার হাজার শিখকে মারা হল। দেশময় সেই বিদ্বেষের আবহাওয়া—শিখদের উৎসবের দিনে কলকাতার গুরুদ্বারগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে ভ্রাতৃত্বের কথা প্রচার করা হচ্ছিল। সেদিনও অশক্ত পা নিয়ে গৌরীদি ছিলেন তার পিছনে। কট্টর ধর্মান্ধতার ধাক্কায় শাহবানুর খোরপোষের দাবী বানচাল হলে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। আবার বি.জে পি-আর এস এস বাবরি মসজিদ ভাঙায় ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা যে বিরাট ঘা খেল, গৌরীদি তার চরম নিন্দা করেছেন। এই সব বিতর্কে আর কাজকর্মে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন কোন প্রত্যাশা থেকে নয়, কোন ধর্ম বা ইডিয়লজির জন্য নয়—কেবল মনুষ্যত্বের তাগিদে, মনুষ্যত্বের আদর্শকে কোনও ইডিয়লজির ঘেরাটোপে তিনি বাঁধেন নি—খোলামনেই সব কিছু বিচার করতেন। নানা মতাদর্শের প্রভাব তাঁর জীবনে পড়েছিল। প্রথম জীবনে তাঁর নম্র, অনাড়ম্বর গান্ধীবাদী বাবার প্রভাব পড়েছিল। গান্ধীজির রামরাজ্যের কথা বা আর নানা সংস্কার পরে না মানলেও তাঁর অপার মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর চিরকাল ছিল। কলেজে পড়ার সময় মার্কসবাদের মধ্যে শোষিত মানুষের যে বিদ্রোহের কথা বলা আছে, তার দিকে আকৃষ্ট হন। পরে ধীরে ধীরে লেনিন-স্টালিনের একনায়কত্ব যে ঠিক নয় একথা মেনে নেন। শান্তিনিকেতনে থাকার ফলে রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক মানবতাবাদের গভীর ছাপ তাঁর উপর পড়ে, কবির লেখা, তাঁর কবিতা আর গান গৌরীদিকে চিরকাল প্রেরণা দিয়েছে। শেষে তিনি আইয়ুবের সঙ্গে এম এন রায়ের ভাব-পরিমণ্ডলে আসেন এবং সে-প্রভাবও তাঁর উপর পড়ে। দর্শন-সমাজ-রাজনীতির বিচার থেকে মরদেহ হাসপাতালে দিয়ে যাওয়া—এসবই তিনি খাঁটি যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে

করেছেন। হয়ত বিভিন্ন মতাদর্শের সংস্পর্শে এসেছেন বলে তিনি বিভিন্ন গুণকে নিজের ব্যক্তিসত্তায় মেলাতে পেরেছেন—যা করা বেশ কঠিন। তিনি প্রবলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন—কিন্তু নম্রভাবে। চরম বিপদেও ভগবান বা কোন মিষ্টিক সত্তার কাছে মাথা নিচু করেন নি। আবার এই যুক্তিবাদী মানুষটি কিন্তু বাস্তব থেকে সরে আসেন নি। একবার আমাদের এক বামপন্থী বন্ধু ফরাসী টেলিভিশনের একজন সাংবাদিককে গৌরীদির ইনটারভিউর জন্যে নিয়ে এসেছিলেন। ফরাসী সাংবাদিক উদারীকরণের ফলে ভারতের ক্ষতি হতে পারে এরকম ইঙ্গিত করলেন। গৌরীদি কিন্তু সোজা বললেন যে, একদিন নেহরুবাদী অর্থনীতি সরকারকে সব ক্ষমতার চূড়ায় বসিয়েছিল—তাতে খুব ভালো হয়নি। এখন আমাদের দেখা উচিত শিল্পবাণিজ্যের স্বাধীনতা দিলে সাধারণ মানুষের ভালো হয় কিনা।

এত সব জ্ঞান-বিচারের সঙ্গে সঙ্গে গৌরীদির মধ্যে ছিল সকলের জন্য ভালোবাসা। তাই তাঁর বাসায় শিল্পপতি-বুদ্ধিজীবির সঙ্গে মনার মা বা দূর গাঁয়ের অর্ধশিক্ষিত মানুষ একইভাবে সমাদর পেতেন। কয়েকবছর আগে মাস চারেক পার্ল রোডে যাওয়া হয়নি। তারপর একদিন গিয়ে দেখি, পাশের ঘরে একজন অচেনা ছেলে শুয়ে আছে। গৌরীদি বললেন, দক্ষিণভারতীয় এই ছেলেটি কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে এসে বসন্তে ভুগছে—তাই তাকে গৌরীদি বাসায় রেখেছেন। তিনি অপরের জন্যে ভাবতেন, করতেন ; কিন্তু তাঁর জন্যে কিছু করতে গেলে আপত্তি জানাতেন, বা সাহায্যের হাত আর কারও দিকে বাড়াতে বলতেন। বিরানব্বই সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার পরে হাট-বাজার-সব বন্ধ থাকার সময় আমি জানতে চাইলাম যে অশক্ত শরীরে একা বাসায় অসুবিধা হচ্ছে কিনা ; উনি বললেন ওনার জন্য না ভেবে দক্ষিণ কলকাতায় আমাদের পরিচিত একজন সাংবাদিকের খবর নিতে। এমনি ছিল সকলের জন্য তাঁর মঙ্গল কামনা।

বহুকাল আগে গান্ধীজীকে একবার সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেন, যে তিনি কাকে বেশী বিপদজনক মনে করেন। গান্ধীজী জানান, হৃদয়হীন বুদ্ধিজীবীকে। আমাদের সৌভাগ্য গৌরীদি এরকম বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। তিনি তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে ভালোবাসাকে মেলাতে পেরেছিলেন। হয়ত এই মেলাতে পারাতেই তাঁর বৈশিষ্ট্য—তাঁর জীবনের সার্থকতা।

[শ্রী মনোজ দত্ত র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট এসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য, পেশা সমাজসেবা]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং গৌরীদি

আবু আতাহার

১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল দুই বাংলায়, এই বাংলার কোলকাতা ও বাটানগরে সেটা ব্যাপক হয়েছিল। খুন জখম তো ছিলই কিন্তু অন্যভাবেও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মানুষ। কোলকাতার এই দাঙ্গাটার অনেক খবরই জানতাম। এই প্রতিবেদনে সেটা আলোচ্য নয় তবে একটু ছুঁয়ে যাচ্ছি। যাকে কেন্দ্র করে এই দাঙ্গার এখানে সূত্রপাত সেই ভূদেব সেন আমার চেনা

কবি। দবগা রোডে তাঁব বাড়িতে আমরা কবি সম্মেলনও করেছিলাম, আর এই দাঙ্গার প্রস্তুতি যেখানে, যে নেতার বাড়িতে নেওয়া হয় তিনিও আমার খুব পরিচিত। নাম থাক। ইনটালি অঞ্চলে তাঁব বিশাল বাড়ি। ভয়াবহ এই দাঙ্গা আর কয়েকদিন এগোলে মহাসর্বনাশ হতো এবং দুঃখের বিষয় তৎকালীন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন এটা থামাতে পারেন নি। পুলিশ কমিশনার প্রণব সেনেরও পরোক্ষ মদতে ক্রমশঃ সংখ্যালঘুরা বিপর্যস্ত। দিল্লী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ ছুটে এলেন। বদরুদ্দোজা সাহেবের সঙ্গে বস্তিতেও গেলেন। দাঙ্গা বন্ধ হলো। লুটপাট, সর্বনাশ ততোদিনে অনেক।

১৯৬৪র এই দাঙ্গায় একটা ঘটনা দুই বাংলাতেই ঘটলো। পূর্ব পাকিস্থানে। পশ্চিমবাংলায়। কিছু মানুষ সচেতন হলেন। রুখে দাঁড়ালেন এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে। পূর্ব বাংলায় বাঙালি মুসলমান, ১/৪ জন প্রাণও দিলেন। পশ্চিম বাংলায় বাঙালি হিন্দু। যদিও তাদের মধ্যে কিছু মুসলমানও ছিলেন কিন্তু মূলতঃ হিন্দুদের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো একটা নজির সৃষ্টি করলো সেইসময়।

গড়ে উঠলো Council For Promotion of Communal Harmony— সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ। এই সংগঠনে নেতৃত্ব দিলেন মৈত্রেয়ী দেবী। পাম এভিনিউয়ে তাঁর বাড়িটিই হ'লো সমিতির গৃহ। আমি তখন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজমের ছাত্র। যোগ দিলাম এই সংগঠনে। আব এখানেই পেলাম গৌরীদিকে (শ্রীমতী গৌরী আইয়ুব)। আলাপ হলো শ্রদ্ধেয় আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে। ৫ পার্ল রোডে ওঁদের বাড়িতে যাওয়া আসা। ওঁদের ছেলে পূষণ তখন বালক। সংগঠনের কাজে গৌরীদি ছিলেন মৈত্রেয়ীদির ডান হাত। শান্ত ধীর অল্প কথা বলা গৌরীদির ভেতর একটা লড়াকু মনোভাব লক্ষ্য করতাম। মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মানসিকতা, সংসার ও অন্যকাজ সামলে সংগঠনের কাজে যোগ দেওয়া, বিভিন্ন বস্তিতে যাওয়া, তাদের বোঝানো, কখনো কাছে দূরে camp করে সম্প্রীতি নিয়ে সেমিনার। মৈত্রেয়ীদির সঙ্গে গৌরীদি ছায়ার মতো।

এইরকম একটা camp হয়েছিল কোলকাতার কাছে গঙ্গানগরে। দুদিন ধরে। গেছিলাম সেখানে, একটা অন্য পরিবেশ। কিছুটা পিকনিকেরও আনন্দ। সাহিত্যিক শিল্পী অনেক। বলা যায় বুদ্ধিজীবী সমাবেশ। গৌরীদি সেখানে সোৎসাহী পরিচালিকা। সবদিকে সুনজর। আমার মনে হ'তো মৈত্রেয়ীদি অনেকটাই ওঁর উপর নির্ভরশীল। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন ওঁরা চাইতেন এইসব সমাবেশ সেমিনারে মুসলিমরা বেশি করে আসুন। কিন্তু আসতেন তুলনায় অনেক কম। এ ব্যাপারে গৌরীদির একটা আক্ষেপ ছিল।

তখন দু'বাড়িতেই আমার সমান যাতায়াত। পাম এভিনিউয়ে। পার্ল রোডে। মৈত্রেয়ীদির স্বামী ডঃ সেন ও আইয়ুব সাহেবের খুব কাছাকাছি এসেছিলাম। পয়গাম পত্রিকায় আমার কাজ শুরু। ছোটদের আসর। এই আসরের মধ্যে দিয়ে একটা সম্প্রীতির বাতাবরণ গড়ে তোলা। ওরা জানতেন, উৎসাহ দিতেন। সাধারণত ছুটির দিন সকালে যেতাম। গৌরীদি কাজে ব্যস্ত। আইয়ুব সাহেবের সঙ্গে আমার নানান কথা। উনিই বলেছিলেন, 'তোমার নামের উচ্চারণ বা বানান আবু আতাহার নয়। আবু আত্‌হার।' উর্দু ভাষাতে পণ্ডিত আইয়ুব সাহেব আরবীও ভালো জানতেন। অনেক প্রেরণা পেয়েছিলাম ওঁর কাছে। এখন মনে পড়লে ভালো লাগে।

গৌরীদির কিছু গল্প তখন বড় পত্রিকায়, দৈনিকে প্রকাশিত হতো। নবজাতক বলে একটা পত্রিকা বের হলো। সম্পাদনায় মৈত্রেয়ী দেবী। তাতেও গৌরীদির সাহিত্য সাংবাদিকতা। মৈত্রেয়ীদি তো লেখিকা হিসেবে খ্যাতিমান। কিন্তু তখন এইসবের চেয়ে সংগঠনের কাজ বড়

হ'য়ে উঠেছিল। একটা ভালো কাজ করার আগ্রহ উদ্দীপনা আমাদের পেয়ে বসেছিল। অনেক খ্যাতিমান মানুষ এটা সুনজরে দেখেছিলেন এমনকি এগিয়ে এসেছিলেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আগ্রহ প্রকাশ-উৎসাহ দান।

দিল্লী থেকে লেখা শ্রীমতী গান্ধীর চিঠি পড়ে শোনালেন মৈত্রেয়ীদি। নতুন উৎসাহ। কিভাবে এগোন যায়। পাম এভিনিউয়ে ওঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে আলোচনা সভা। গৌরীদিকে দেখে তখন আমার মনে হতো উনি প্রচার বিমুখ এবং নেপথ্যে থেকেই কাজ করতে ভালোবাসেন। কখনো ওর কাছাকাছি এলে উনি বোঝাতে চেষ্টা করতেন এটা কতো প্রয়োজন—উভয় ধর্মের ভেতর এই সম্প্রীতি রক্ষা।

এতো আমারো উপলব্ধি প্রায় শৈশব থেকে। উভয় সম্প্রদায়ের ভেতর একটা দ্বন্দ্ব তো তখন থেকেই দেখতাম। স্কুলে অনেক হিন্দু বন্ধু থাকলেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলেও কোথায় যেন একটা বিচ্ছিন্নতা। মূল উৎপাটনের চেষ্টা বড় সংগঠন না হ'লে সম্ভব নয়। কিভাবে সেটা করা যায় এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা হতো।

আমরা তথা আমাদের পক্ষ থেকে একটা প্রস্তাব রেখেছিলেন মৈত্রেয়ীদি—একজন বিখ্যাত চিত্রপরিচালকের কাছে—হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির উপর ছবি করুন। পরিচালক বলেছিলেন, হিন্দু গুণ্ডারা তাহলে আমার ঘর জ্বালিয়ে দেবে। ঘটনাটা সত্য এবং এই ধরনের মন্তব্য আমাদের হতাশ করতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মৈত্রেয়ীদি যেদিন মারা গেলেন—৪ ফেব্রুয়ারী ওখানে আমি, পাশে মৃণাল সেন। এই কথাটা উল্লেখ করে বললাম 'আপনি কিছু করুন।' 'হ্যাঁ বিষয়টা নিয়ে ভাবছি।' উনি বলেছিলেন। কিছু হয়নি এবং এই বাংলার সাহিত্যেও গৌরকিশোর ঘোষ কিছু কাজ করেছিলেন কিন্তু অধিকাংশ নীরব। অথচ সে সময় গৌরীদিসহ বহুজনেরই এ বক্তব্য ছিল—সাহিত্য সংস্কৃতি তথা চলচ্চিত্র নাটকের মাধ্যমে এ কাজ অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। হিন্দু মুসলিম বিয়ের কথাও হতো। নানাবিধ প্রগতির পদক্ষেপে আমরা যখন পা মিলিয়ে হাঁটতে শুরু করেছি তখন কোথা থেকে কিছু ধান্দাবাজরা মুখোশ পরে ঢুকে পড়লো সংগঠনে। কিছু ভালো কথার পরেই চেষ্টা এই সুন্দর সম্প্রীতিকে নষ্ট করা। আমাদের ভালো লাগেনি ওদের।

আসলে মৈত্রেয়ীদি গৌরীদির এই সংগঠনকে সহযোগিতা করতে যাঁরা এলেন তাঁদের চেয়ে নষ্ট করতে এলেন বেশি মানুষ। আর একধরণের মিথ্যে প্রচারে বিভ্রান্ত হ'লো সদস্যরা। ওঁরাও কিছুটা মুষড়ে পড়লেন, দুজনেই মূলতঃ ভাবপ্রবণ, সাহিত্য জগতের মানুষ। সুন্দরের পূজারী। রাজনীতির ক্রুরতার মোকাবিলা করা তাই সম্ভব হলো না।

অতএব প্রশংসার সেই পুষ্পডালিতে পোকামাকড়ের উৎপাত শুরু হলো। হয়তো বেশ কিছু মানুষ একে ভালো বললেন।

কিন্তু সমালোচনাও শুনতে হয়েছিল অনেক। উভয় ধর্মের মৌলবাদীরা এটাকে ভালো চোখে দেখতেন না। এই সময় আমার উপলব্ধি অনেকেই এই সম্প্রীতি মেনে নিতে পারতেন না।

সকাল নটা দশটায় নির্জনপথ পাম এভিনিউ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় শান্তিনিকেতনে আদলে-গড়া একটা সুন্দর বাড়িতে পৌঁছতাম। সাদর অভ্যর্থনা, এসো আবু। মৈত্রেয়ীদির আহ্বান। এখনো আমার সামনে ছবি। অতঃপর কথাবার্তা, ওঁর কণ্ঠে হতাশা, কিছু হবে না। এই হতাশা ছিল গৌরীদির কণ্ঠেও কিন্তু তারি মধ্যে তিনি আশাবাদী। যাইহোক ধীরে ধীরে এই সংগঠনের জনপ্রিয়তা কমে এলো। এবং ওঁরা এই বয়স্কদের সংগঠন ছেড়ে বা এড়িয়ে গিয়ে শিশুদের সংগঠনের দিকে ঝুকলেন। তৈরি হলো খেলাঘর, তারপর থেকে আমিও বিচ্ছিন্ন।

এখনো স্মৃতিচারণে আমার সামনে চলচ্চিত্র। একজন শান্ত প্রকৃতির সুশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা যাঁর পশ্চাৎপটে আভিজাত্য (এবং মৈত্রেয়ীদি) তিনি কিভাবে বস্তিতে সাধারণ মানুষদের মধ্যে কাজ করতেন। গৌরীদি মূলতঃ শিক্ষিকা তাই মানুষকে কোনকিছু বোঝাতে তাঁর বেগ পেতে হতো না। কাজটা অনেককেই আকর্ষণ করেছিল। সরকারের সমর্থনও ছিল। সম্ভবতঃ মৌলবাদীদের সমর্থন ছিল না। হিন্দু মুসলমানের ভেতর সম্প্রীতি তথা প্রকৃত ধর্মকথা। নবীসাহেবের নির্দেশ মানুষে মানুষে ভালোবাসা এ তাঁরা চাইতেন না। তাঁদেব প্রেমের বাণী হিন্দুতে হিন্দুতে মেলামেশা, ভালোবাসা ; মুসলমান মুসলমানে সম্প্রীতি।

অনেক সময় নষ্ট করে আদর্শে বিশ্বাস রেখে গৌরী আইয়ুব নেমেছিলেন এ কাজে, এতো একরকম লড়াই। ষাটের দশকেব মাঝামাঝি সময় এ লড়াইটা আমি দেখেছি, নেপথ্যে আইয়ুব সাহেবের সমর্থন, অসুস্থ স্বামীর পবিচর্যা, কলেজে অধ্যাপনা, সংসার এ সবের মধ্যে সময় করে স ামতো তার সেই সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার লড়াই আমি দেখেছি বারবার।

পরে অনেকবছর পর যখন তাঁর বাড়িতে যাই তখন অসুস্থ তিনি। পুরোন কথা আর তুলিনি। সেই সংগ্রামের ছবিটা মনে করেছি। বারবার মনের মধ্যে ছবি হয়েছে।

[আবু আনোয়ার পেশায় ছিলেন চাকুরীজীবী, নেশা ছিল সাংবাদিকতা। কিছুদিন আগে তাঁর অকাল-প্রয়াণ ঘটেছে। এ সংবাদ মর্মান্তিক]

ডায়েরির পাতা থেকে—

শাওনী শবনম

১৩ জুলাই, ১৯৯৮

আজ ভোরবেলা কলেজ যাওয়ার সময় মাম্মা আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে দুঃসংবাদটি দিলো। অশ্রুভেজা কণ্ঠস্বরে বললো—"গৌরীমাসি চলে গেছেন।" আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। না পারার অবশ্য কোনো কারণ নেই। গৌরীমাসি বেশ কিছুদিন থেকেই অসুস্থ ছিলেন। মাসখানেক আগে ওঁকে দেখে এসেছিলাম—অসহায় অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছেন। কষ্ট দেখে চোখে পানি আসে। তবু তারই মধ্যে মাম্মা যখন বললো, "গৌরীদি, মিন্না এসেছে" তখন উনি বললেন, "Thank you মিন্না।" কণ্ঠস্বর ক্ষীণ কিন্তু উচ্চারণ স্পষ্ট। মাত্র দু-তিনদিন আগে মাম্মা বলছিলো, "তোমার পরীক্ষার (মাধ্যমিক) রেজাল্ট গৌরীদিকে জানিয়ে আসবো আমরা দু'জনে।" কিন্তু সে সুযোগ আর হলো না। উনি চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন। একান্ত আপনজনকে হারানোর ব্যথায় মনটা বিকল। কোন কাজে মন দিতে পারিনি আজ।

গৌরীমাসি ছিলেন যেন আমার কত কাছের মানুষ! কত বড় মাপের মানুষ তিনি —সাধারণ মানুষের থেকে কত স্বতন্ত্র! অথচ, তিনি নিজে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। যথার্থ উদারচেতা মানুষ যেমন হন তিনি তেমনটি ছিলেন। চারপাশের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য তিনি ভাবতেন আন্তরিকভাবে। নিজের সর্বশক্তি দিয়ে মানুষের উপকার করতেন। গরীব-দুঃখী-অসহায় সবার পাশে তিনি দাঁড়াতেন। তাছাড়া যে কোনো মানুষের জন্য তাঁর বাড়ির দরজা ছিল

উন্মুক্ত। সাবাদিন একভাবে তাঁর নিজস্ব খাটটিতে বসে এই অসাধারণ মানুষটি মানুষদের কথা শুনতেন। অপরের কথা শোনার জন্য কোনো মানুষের এত ধৈর্য্য আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি কোনোদিন।

আমার মা বা আমার জীবনে গৌবীমাসি ছিলেন আপনজনেব থেকেও অনেক অনেক বেশি। কতদিন যে আমরা তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েছি! যখন ডাকতেন তখন যেভাবে অনুরোধ করতেন মনে হতো আমরাই বোধহয় তাঁকে ধন্য করছি। বলতেন—"তোমরা যদি একটু আসতে পারো!" বিনয় ও নম্রতা ঝরে পডতো তাঁব কণ্ঠস্বরে। তাঁব দেওয়া সব জিনিসগুলি আমার কাছে অমূল্য ধন। সেগুলি দেখলেই মনে পড়ে তাঁব সদা হাস্যময় সুন্দর মুখখানি। আমার জীবনে তাঁর দেওয়া সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু অবশ্যই "এই যে অহনা"। দেওয়াব সময় তিনি বলেছিলেন—"মিন্না, আমার তো গাছেব ফল নেই। তাই তোমাকে হাতের ফল দিলাম।" মাঝে মাঝে আমার বাবাব সখেব বাগানের ফলমূল দিয়ে আসতাম আমবা তাঁকে। তাই এই উক্তি। এতটাই বিনয়ী ছিলেন গৌরীমাসি।

সাধারণতঃ বিখ্যাত মানুষদের কাছে যেতে বা কথা বলতে সমীহ হয়। গৌরীমাসি ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি যেন আমাদেবই একজন হয়ে ছিলেন। চিবকাল তিনি অন্যের জন্য প্রাণ দিয়ে করেছেন। অথচ তার বদলে পেয়েছেন অর্ধেক জীবন দুঃসহ শারীরিক কষ্ট আর কিছু মানুষেব স্বার্থহীন ভালবাসা। আজ তাঁব চলে যাওয়াব সংবাদ পেয়ে মনে হচ্ছিল—শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারটি কি গৌবীমাসির মতো নীরব মানব সেবক মানুষদেব জন্য নয়?

[শাওনী শবনম (মিন্না) মীনাক্ষুন নাহাবেব কন্যা, লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজেব ছাত্রী]

"Gauri Ayyub—An Integrated Human Being"

Joe Winter

When I first met Gauri Ayyub she was still travelling to Khelaghar once or twice a week. She invited me to do some teaching there and for a time I accompanied her on Sundays. I remember her at a Khelaghar staff meeting . one or two voices were raised and tempers lost but not hers , she sat up, certainly subject to physical pain that she ignored, and calmly and with true authority managed the situation I knew as I sat there, silent, not understanding the words but seeing something of the interplay, that here was an authority of the rarest kind, that operates out of complete respect for the other human beings involved. If in my teaching life I could have served under such a headmistress I would have looked for no other post.

Later, when she was confined to bed and could not even brush away an ant from her pillow, I used to come and read to her. We made good inroads into Thomas Mann's 'The Magic Mountain'. At the time I was translating Rabindranath's 'Gitanjali' into English. It makes me weep now to percieve Gauri-di's burden of দুঃখ সুখ if I may put it so. She would help

me with my translations in the following way. I would tell her the first line in Bengali of the piece I was working on and then read her my translation entire (She could not hold the page to read it herself.) She would say, perhaps, "Read your second verse again." I would do so, she would think and go through the Bengali (Which on every occasion she knew, and would extract the relevant phrases or lines), and lying there she would compare the original with my version. This was all with sight unseen In our many conversations her mental gifts were similarly stunning, when she allowed them to peep out from behind the personal gift. Gauri-di was at home in the intellectual traditions of East and West and I have no doubt at all could have made her mark as a scholar But that would have been a lessening of who she was.

I have never met someone so gifted—in humour, in the immediate apprehension of things great and small, in concern that was always active for whoever needed it. She had a world-view and a home-view in which neither was to the fore, she was an integrated human being as only a woman can be, the pain and love she bore I can see only as someone light years away, but still what I see defines for me humanity in its deepest sense Though I knew her very little, I will be privileged the rest of my life to keep a memory of her in my heart

[ডো উইন্টার শান্তিনিকেতনে অতিথি অধ্যাপক হয়ে আসেন পেশা শিক্ষকতা. নেশা ভ্রমণ. ভাষাশিক্ষা, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি]

ত্যাগ ও সেবাই ছিল তাঁর ধর্ম

মীরাতুন নাহার

১৩ জুলাই ১৯৯৮-এর ভোরে ফোনের আওয়াজ কানে বড় বেসুরো ঠেক্‌লো। ওদিক থেকে ডাঃ কামালের ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল—'মীরাদি...' সম্বোধনটুকু শোনামাত্র পরবর্তী শব্দগুলি অনুমান করে নিতে বিন্দুমাত্র সময় নিইনি। বললাম—'বুঝেছি কখন কি হবে বল। আমি আসছি।' কথা সেরে অবলম্বনহীন প্রায় বসে পড়লাম। বুকের মধ্যেটা এত ফাঁকা কখনও অনুভব করিনি! আর শুনতে পাবো না সেই স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর! সেই নিরুপম মুখের হাসি আর দেখতে পাবো না! দরজা অবারিত রেখে আর কেউ বলবে না 'এসো এসো। এখানটায় বসো। না, না ওখানে নয়। পুনদেও, দিদি চা খায় না। সরবৎ করে দাও দিদির জন্য।' অন্তর হাহাকারে ভরে উঠল। দু'চোখ ছাপিয়ে ধারা নামলো। নিজেকে কেমন অসহায় মনে হল—বিশাল পৃথিবীতে নিজেকে যেন স্বজনহীন একা মনে হল অকস্মাৎ। তিনি আমার 'আপন' কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন এমন একজন যার তুলনা ছিলেন কেবল তিনি নিজে। ভারতবর্ষের যে সনাতন আদর্শ সেই আদর্শের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক—সে আদর্শ ত্যাগ ও সেবার আদর্শ।

প্রখর যুক্তিবাদী অথচ স্নেহ মায়া মমতা ভরা মানুষটি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার জন ছিলেন। আমার ১৫/১৬ বছরের কিশোরী বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর নিবিড়

সান্নিধ্যসুখ পেয়েছি। আমার মত আরও অসংখ্যজন তাঁকে কাছের মানুষ হিসেবে পেয়েছে। আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার অসামান্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। স্বার্থ নামক সর্বনাশা বস্তুটিকে তিনি তাঁর কাছে ঘেষতে দেননি কখনও। 'পরার্থপর' শব্দটি যেন তাঁর জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল। মনে ব্যথা। শরীরে কষ্ট। আশ্রয় নেই। শিক্ষক নেই। বন্ধু নেই। আরও কত এমন 'নেই' আছে। যে কোন 'নেই' কে 'আছে' করার জন্য তিনি ছিলেন সদা-তৎপর। পবিত্র-সুন্দর হাসিখানি মুখে ধরে রেখে সকল অভাব তিনি ভাবে রূপান্তরিত করে দিতেন পরম নিষ্ঠাসহকারে।

মন্দকে বাদ দিয়ে কেবল ভালোটুকু গ্রহণ করার বিরল আর্ট তিনি রপ্ত করেছিলেন। এই তো সেদিনের কথা। শারীরিক অক্ষমতা তাঁকে বহুকাল পরাস্ত করার চেষ্টাতে ব্যর্থ থেকেছে। তারপর সুদীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ ব্যাধি তাঁর অপরিমিত মানসিক শক্তিকে পরাভূত করতে না পারলেও দেহকে একটু একটু করে শয্যাগ্রস্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। শুনলাম, দীর্ঘদিন ধরে স্টেরয়েড সেবনের ফলে তার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য হয়ে উঠছে। সেকথা তাঁর কাছে উল্লেখ করতে তিনি অসহ্যকষ্ট সহ্য করার অবস্থাতেই উচ্চারণ করলেন- 'স্টেরয়েড তো আমাকে আঠারো বছর সচলও রেখেছিল।' চমকে উঠলাম। কি অসম্ভব স্পষ্ট এবং সত্য স্বীকারোক্তি। ক্ষতির হিসাব বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে কেবল লাভটুকুর এমন অকপট প্রাপ্তিস্বীকার করতে ক'জন পারে। কিছুদিন আগে নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে অসুখের কষ্ট দূর হওয়ার পর যখন জানলাম স্টেরয়েড দিয়েছেন ডাক্তার আমাকে— মেনে নিতে পারিনি খুশিমনে। ডাক্তারকে দোষারোপ করেছি এবং এখনও করি। একবারও ভাবিনি এই বস্তুটি আমার কষ্ট দূর করেছিল। ভয়ানক কষ্ট। তাঁর কাছে সেদিন শিখেছিলাম—কেমন করে অসত্য বর্জন করে সত্যকে গ্রহণ করতে হয়।

পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার কয়েকমাস আগে থেকে তিনি কোনও দর্শনপ্রার্থীকে আর তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমোদন দিচ্ছিলেন না। যতদিন সক্ষম ছিলেন সবরকম প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করতে চেষ্টা করেছেন মুক্তমনে। যেদিন থেকে নিজের শক্তি হারানোর অবস্থাকে উপলব্ধি করলেন সেদিন থেকে নিজেকে সকলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। তিনি যে নিতে নয়, দিতেই এসেছিলেন পৃথিবীর মানুষকে। দেওয়ার কর্ম শেষ হলে নেওয়ার জন্য হাত পাততে তাঁর হৃদয় বিমুখ। তাই তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন সকলের দিক থেকে চলে যাওয়া পথের দিকে। মায়া-দ্বারা গঠিত শরীর-মন মায়ার বন্ধন কাটাবে। তাই এই ছিন্ন করার কাঠিন্য। দূর থেকে দেখে চলে আসছি। বুক ফেটে যায় অসহায় কান্নায়! এও কী অসম্ভব। সম্ভব। তিনি যে নিতে আসেননি। দিতেই এসেছিলেন। কেবলি দিতে। দেওয়া-নেওয়ার রীতি তাঁর জানা ছিল না। তিনি শুধু দিতেই জানতেন।

ক্ষীণস্বাস্থ্য, অসুস্থ প্রৌঢ় স্বামীকে কেবল সেবা আর ভালবাসা দিয়ে খুব কম সময় নয়-ছাব্বিশ বছর বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রতিমার মতো মানুষটি বসে আছেন ঘরে। চারিদিকে মানুষ! তাদের সুবিধা অসুবিধের কথা তখনও দেখতে ভোলেননি। আমাকে একসময় বললেন—'বাড়ি যাও মীরা। শিশুকন্যাকে রেখে এসেছো ঘরে (শুদ্ধ বাংলা ব্যবহার ছিল তাঁর স্বভাবের একটি অনুপম সুমিষ্ট উপভোগ্য দিক)। তাঁর বৃদ্ধ মা এলেন ঘরে। তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন—'ছাব্বিশ বছর বাঁচিয়ে রেখেছিলি।' নিটোল সত্যি কথা। দুরারোগ্য যক্ষ্মা ব্যাধির কবলমুক্ত করে স্বামীকে তাঁর অসামান্য প্রতিভা প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন এই অসামান্যা মানুষটি। সেবা ও ভালবাসার এমন দৃষ্টান্ত আর তো কোথাও শুনিনি দেখিনি।

ছোট-বড় ভেদ কাকে বলে তিনি জানতেন না। অজ পাড়াগাঁয়ের কত তরুণ-তরুণী তাঁর

কাছে আশা ভরসা পেয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ধরার কোন মালিন্য তাঁকে যেন স্পর্শ করত না। শুচিস্নিগ্ধ মানুষটি দু'হাত ভরে দিয়েই গেছেন সকল প্রার্থীকে। দেওয়ার ক্ষমতা ফুরিয়ে এলে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে নিলেন। হ্যাঁ, ইচ্ছামৃত্যু। খাওয়া ছেড়েছিলেন প্রায়। সন্তানতুল্য কামালকে স্মৃতিকথা শোনাতে শোনাতে দিনের শেষে দিন শেষ করে আনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় ধ্যানস্থ হতেন। সে ধ্যান শেষ হল ১৩ জুলাই ৯৮-এর নিশি ভোর হলে।

আজ তিনি নেই। না, না ভুল! দেহত্যাগ করে সেটিকেও তিনি দেশবাসীর সেবার জন্য দান করেছেন। ত্যাগ ও সেবার কোন ক্ষয় নেই। তিনি আছেন --সকলের অন্তরে। তিনি গৌরী আইয়ুব। ত্যাগ ও সেবার মূর্ত প্রতীক।

সৌজন্যে : প্রতিদিন, ১৪ জুলাই, ১৯৯৯

(মীরাতুন নাহার এর পেশা অধ্যাপনা, নেশা সাহিত্য ও সমাজসেবা-- বেগম রোকেয়া স্মৃতিসহায়ক সংস্থা সুবাহা সম্প্রীতির সম্পাদক।)

কবিতায় স্মরণ

আলোর উৎসের দিকে

স্বরাজ সেনগুপ্ত

এক

স্বপ্নে-পাওয়া এক আলোর প্রতিমা সবাইকে চমকে দিয়ে
ছুড়ে দিয়েছিল নীল আলোর মশাল আকাশের দিকে
চমকটা কেটে যেতে সকলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল
মশালটা চলে যাচ্ছে দিগন্ত পর্যন্ত
আলোর ফুল ঝরাতে ঝরাতে।

কেউ কেউ ভাবল বুঝি ভোর হয়ে গেছে।
তারা বেরিয়ে পড়ল ঘর-বাড়ি ছেড়ে- পথে,
উজ্জ্বল ভোরের অপেক্ষায় যেখানে অনেক কাক পহর গুণছে।

কেউ কেউ আবার প্রথমে আলোটালো দেখে
উৎসাহে ছুটে গিয়েছিল—পরে সাত পাচ ভেবে—
'না : তেমন কিছু নয়' এরকম একটা ভাব করে
ফিরে গেল যার যার ঘরে।

আর কিছু তৃষিত মানুষ চিনতে পেরেছিল আলোটাকে,
তারা আর কোনোদিকে না তাকিয়ে শুরু করল
হাঁটা—আলোটার কাছে পৌঁছে যাবার আকাঙ্ক্ষায়—
দূর আকাশের গায়ে তটরেখা ছুঁয়ে যে নক্ষত্র জেগে থাকে
মাঝিদের যেমন স্থির লক্ষ্য তার দিকে—
যেমন নৌকোর মুখ সেদিকেই ঘোরে।
আশ্চর্য! সেই মশালটা আজও জ্বলছে,
উত্তরের হাওয়ায় হাওয়ায় কাঁপছে তার
নীলাভ শিখা দিগন্তের কাছে।

আর সেই মানুষগুলোও হাঁটছে
আলোর খেলাঘরে পৌঁছবার জন্যে, হাঁটছে অবিরাম।

দুই

ঘোর অন্ধকারে তিনি বলেছিলেন
'সূর্য অস্ত গেছে, চাঁদ নেই দূরাকাশে
তারারাও কোথায় ডুবে আছে গভীর আঁধারে।
মোমবাতিগুলো জ্বালাতেই হবে আমাদের
না হলে পথ চলতে
পথ দেখব কি করে'

কথাটা শুনেই ভেবেছি, তিনিই তো আলো
অথবা আলোর সঙ্গিনী
দিনরাত্রি তৈরি করেন আলোর বৈভব
আমাদের সব অন্ধকার ভেসে যায় আলোকের স্রোতে।

সারারাত্রি ঘুম হয়নি কারও
বলেছি, বলুন শুনি, বলুন আরও কিছু কথা,
আরও যা যা আছে।
তিনি হেসে
আলোর অনন্ত ঝুমকা ঝুলিয়ে দিলেন গাছে গাছে।

রাত্রি হয় নীল
ঘন অন্ধকার এসে গ্রাস করে সমগ্র নিখিল।
আমাদের ঘরে ঘরে
তাঁর কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে থরে ও বিথরে
'তোমরা জেগে ওঠো
মরা গাছে, শুকনো ডালে ফুল হয়ে ফোটো।'

শুকনো ডালে ফুল ফোটে?
ফোটে।
তা না হলে গন্ধ কেন,
আমাদের প্রাণে প্রাণে কেন এত মধুগন্ধ ছোটে!

[শ্রী স্বরাজ সেনগুপ্ত বিশিষ্ট লেখক ও চিন্তাবিদ্। পেশায় ছিলেন অধ্যাপক, নেশা সমাজসেবা]

A Tribute to Gauri Ayyub

Joe Winter

Down the dead weeks a body floats Survival
is its weak point : its breath goes on and on,
but all the play of the forest-life is gone
Exhaustedness, a sense of near-arrival .
and bits of darkness now In the lee of the wall
it drifts relentlessly abandoning all
Medicine pays a phantom call Revival—
that murderous path—is not embarked upon
The forest play was beautiful If nature
gave all its love and quickness to one creature.
to gift to all—would it not light the future
a day that danced with Nature's festival "
But pain has chosen too A body lying
in Beckbagan, for all A woman dying

গৌরী আইয়ুব স্মরণে

আনোয়ার হুসেন

সংসারের এই আবর্ত পেরিয়ে
আর এক আবর্তে ঘন গাঢ় অন্ধকারে
ঘুমিয়ে পড়েছো তুমি
সৃষ্টির লঘু সংগীতের এক অতল স্পর্শ সুখে।

জীবন এক্ষণ মুহূর্ত যেন বৈবস্বতঃ মৃত্যুর প্রস্তুতি
বিনিদ্র চেতনায় কখন আংশিক আকাশ দেখা
ক্ষয়ে ক্ষয়ে বেঁচে থাকা
কখন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখার মত এই পৃথিবীর দেশে।

এক ভয়ঙ্কর অদ্ভুত আলোর রেখায়
এক বজ্র কঠিন শব্দে
হৃদপিণ্ড ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছো
আর এক আলোময় আত্মার মাঙ্গলিক আস্বাদের খোঁজে
হায়! আর কখনই ফিরবে না কি

জীবনানন্দের এই রূপসী বাংলাদেশে

মানুষের চারপাশে এখন তোমার হলুদ হলুদ স্মৃতি
হিম, নিঃস্পন্দ গন্ধময় ফুল
হ্রদের কিনারা ঘেঁষে
পূর্ণিমা চাঁদের মত উঠেছিল যেন
বনের পাখির মত ডানা মেলে উড়ে গেলে আবার
কোন সেই শাশ্বত অমাবস্যা প্রতিপদের দেশে?

(আনোয়ার হুসেন এর পেশা শিক্ষকতা, নেশা কবিতা রচনা)

গৌরী আইয়ুবের সাহিত্যচর্চার মূল্যায়ন

গৌরী আইয়ুব-এর লেখা কয়েকটি গল্প

দেবেশ রায়

আচার্য গোপাল হালদার তাঁর কোনো একটি লেখায় লিখেছিলেন, তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন হল, সাধারণের ভিতব অসাধারণকে দেখতে পাওয়া, বারবার। ঠিক মনে নেই, কোথায় লিখেছিলেন গোপালদা কথা কটি। স্মৃতি খুব সৃষ্টিশীল। নিজের মত করে সাজিয়ে নেয় কথা বা ঘটনা। তেমন বিচ্যুতির ভয় সত্ত্বেও মনে হচ্ছে, গোপালদা যেন সেই জায়গাটিতে এমন একটা কথা বলছিলেন—তিনি অসাধারণ সব মানুষের ছোট হয়ে যাওয়াও দেখেছেন। আর, সেই কথার জের টেনেই বলেছিলেন ঐ কথাটি—সাধারণ মানুষের অসাধারণতার কথা।

কথাটা যে মনে গেঁথে গেছে, তার কারণ গোপালদার মত এত স্পষ্ট করে বুঝতে না পারলেও জলপাইগুড়ির কৃষক ও সেখানকার চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবনের বাহিরটুকুর সঙ্গে যে একটু সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, আমার চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স থেকে প্রায় চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাতেই বারবার দেখেছি—আমার প্রত্যাশাকে কেমন উতরে যাচ্ছেন নামহীন সব মানুষ, জীবনের যা সবচেয়ে স্বার্থপর বিষয় সেই বেঁচে থাকাটাকেই কেমন অনায়াসে অবহেলায় তুচ্ছ করে দিচ্ছেন পরিচয়হীন সব মানুষ, মানুষ কতটাই আত্মবিশ্বাসী হতে উঠতে পারে। এই নিজেকে ছাড়িয়ে বেঁচে থাকার নানা ঘটনার মধ্যে কোনো নাটকীয়তা ছিল না। আমি দলীয় রাজনীতির সঙ্গেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিলাম। দল-পাকানোর যা-ক্লেদ আর গ্লানি আর মালিন্য আমার দু-হাতে ও মাথায় লেগেছিল। এই মানুষজন তাঁদের মহত্ত্ব দিয়ে সে-সব ধুয়ে দিতেন। সে এক এমনই পুণ্য নিত্য ব্রত যে তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানানোও তাঁদের ছোট করা, যেন মা জন্মের পর আমাকে বুকের দুধ দিয়েছিলেন বলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছি। এই এমন উল্লেখও তাঁদের মহত্ত্বকে খাটো করে। আর, আমার এটুকু আত্মসচেতনতা আছে যে এমন উল্লেখের পেছনে আমার কোনো র‍্যাশনালাইজেশন কাজ করছে না। এ এক অনুভবের কথা। সে-কথা না-বললেও কারো ক্ষতি ছিল না। তবু কোনো কোনো সময় কোনো কোনো ঋণ স্বীকার করতে ইচ্ছে হয়।

এখন, এমন ইচ্ছে হল, গৌরী আইয়ুব-এর গল্পের বই 'তুচ্ছ কিছু সুখ-দুঃখ' নিয়ে ছোট্ট এই লেখাটি তৈরি করে তুলতে গিয়ে। গৌরী আইয়ুব আমাদের সময়েরই একজন মানুষ। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হতে পারত। কিন্তু হয় নি। তিনি শুধু তাঁর নিজের জীবনের ব্রতরক্ষায় যে তিতিক্ষা, সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, নানাজনের স্মৃতিচর্চায়, বিশেষত তাঁর ছাত্রীদের তা আমাদের এই সময়ের এক উজ্জ্বল অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে। এমনই উজ্জ্বল সেই অভিজ্ঞান যে পারিবারিক কোনো পুরুষানুক্রমিক চিহ্নের মত তা আমাদের সন্ততিদের হাতে দিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। হয়তো তাদের হাতে সে-চিহ্ন পৌঁছেও গেছে। অন্তত তাই মনে হল তাঁর ছাত্রীদের কিছু লেখা পড়ে। গৌরী আইয়ুব-এর একটা জীবনী লিখে তাঁকে গড়ে তোলা যায় না। এই যাকে

পারিবারিক অভিজ্ঞান বলছি তা হয়তো গড়ে ওঠে এখন সব স্মৃতিকথা থেকেই।

গৌরী আইয়ুব লেখক ছিলেন না। অথচ তাঁর কিছু কিছু লেখা 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় পড়ে যে কোনো পাঠকের মনে হবে, তাঁর জীবনের যে-কাজেই তিনি হাত দিয়েছেন তাতেই লেগে যেত যেমন এক সহজের মুদ্রা, তেমনি তাঁর এই লেখাগুলোতেও লেগে আছে এক এমন লেখকের ছোঁয়া যিনি অনায়াসে বাংলা ভাষায় একজন লেখক হয়ে উঠতে পারতেন, যদি তিনি চাইতেন তিনি শুধু লেখকই হবেন। তাঁর 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি' বই হয়ে বেরবে কী না, জানি না। এই লেখাটিতে তখনকার শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির ভিতরে প্রতিষ্ঠানের একটা ছক, সেই প্রকৃতি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষজন, তাদের ভিতরকার সম্পর্কের টানা পোড়েন, শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠানগুলি, সেখানকার পরিবেশে মেয়েদের স্বাধীনতা, এগুলো যেমন দেখা যায়, জানা যায়---এমন আর কোনো লেখাতে পড়েছি বলে তো মনেই পড়ে না।

এই লেখাটিতেই গৌরী আইয়ুব তাঁর সঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর প্রণয় সম্পর্ক তৈরি হয়ে ওঠার ঘটনা লিখেছেন। লিখেছেন তো অনেক পরে, তখন তো তাঁর বয়সও হয়ে গেছে। তখন কী করে তাঁর মনে হল না যে সে-বয়সের ছেলেমানুষির কথা লেখা যায় না? কী করে তিনি রক্ষা করতে পারলেন তাঁর মনের সেই সজীবতা যেন তিনি সেই বয়সেই ফিরে ফিরে যাচ্ছেন? কিন্তু একবারের জন্যেও তিনি তাঁর কৈশোর-যৌবনের এই নরনারীর ভিতরে ভালবাসা তৈরি হয়ে ওঠার কথা বলতে গিয়ে আড়ষ্ট হলেন না, আবার ছলকেও উঠলেন না। স্মৃতিকথায় বা স্মৃতিকথাতুর উপন্যাসে যেমন এক নীতিবোধ বা ত্যাগবোধ মিশে যায় তা মিশতে দিলেন না তাঁর অনাবিল সম্পর্কের এই কাহিনীতে। যাকে 'প্রেমপত্র' বলে তাও যে তিনি লিখেছেন ও আইয়ুবও লিখেছেন---তাও কত ফূর্তিতেই তিনি জানিয়েছেন অথচ কখনোই তা হয়ে ওঠে না জীবনের কোনো অস্পষ্ট ক্ষতিপূরণ, শুধু রচনাগুণের দিক থেকে, শুধু লেখা হিশেবে এই শ্রী ও ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারেন তিনিই যিনি লেখার গভীর চর্চাকে নিয়ে যেতে পারেন ব্যক্তিত্বের গভীরে। তাঁকে দেখি নি বলে, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় নি বলে, আমি ভাবতে চাই—তিনি হয়তো এমন কোনো চর্চায় নিজেকে সম্পূর্ণতর করে তুলতে চান নি যে চর্চা মানুষের স্বয়ং সম্পূর্ণতা থেকে তাঁকে একটু সরিয়ে নিতে পারে। যাঁরা সাহিত্যের শিল্পের বিজ্ঞানের স্রষ্টা, তাঁদের চর্চার একটা খতিয়ান তো আছেই।

গৌরী আইয়ুব-এর গল্প লেখার ক্ষমতা যে-ছিল, তার প্রমাণ, এই ছোট বইটি 'তুচ্ছ কিছু সুখ-দুঃখ'। এতে পনেরটি গল্প আছে—এগুলি ছোট গল্প হিসেবেই লেখা। কাহিনীকারের স্বভাববশতঃই এখানে বাঙালি হিন্দু যৌথ পরিবারের মানুষজনের ভিতরকার সম্পর্কের নানা প্রকাশ্যতা ও গোপনতা যেমন আভাসে জানা ও জানানো হয়েছে, তেমনি গ্রামের মুসলমান গরিব পরিবারের সম্পর্কের নানা স্পষ্টতা প্রকাশ্য করে দেয়া হয়েছে। আবার কলকাতার নাগরিক জীবনে একটু আরোপিত বিলিতিপনার পাশে আমাদের জীবনযাপনের অসঙ্গতি নিয়ে ঠাট্টাও করা হয়েছে। আবার বিদেশিনী মেয়ের পৃথক এক বিচার-বিবেচনার কথা তোলা হয়েছে। একজন কাহিনীকার যে এত রকম চরিত্র, ঘটনা ও পরিবেশ নিয়ে লিখতে চান ও এই সব চরিত্রের, ঘটনার, পরিবেশের সত্য তাঁর কাছে যে-বস্তুপ্রমাণে গ্রাহ্য—তাতেই বোঝা যায় গৌরী আইয়ুব এক পরিণত গল্পলেখক, যদিও গল্পের একটা ছাঁচ রক্ষার জন্যে তাঁকে ঘটনা ও সম্পর্কগুলিকে হয়তো সেই ছাঁচে ঢালতে হয়। সেই ছাঁচটা তাঁর গল্পের আসল কথা নয়, তাঁর গল্পের আসল কথা—তাঁর বিধবা কাকিমা একেবারেই বিধবা কাকিমা, তাঁর মুসলমান ঝি ষোলআনাই মুসলমান ঝি, তার

মেমসাহেব আপাদমস্তক মেমসাহেব।

এই গল্পগুলি পড়তে পড়তে আমাকে যেটা বিশেষ করে টানল তা হল দৈনন্দিনের তথ্য সম্পর্কে নির্ভুল এক বোধ। এই তথ্যনিশ্চয়তা ছাড়া কাহিনী সত্য হতে পারে না, কোনো সময়ই পারে না। বাংলা গল্পে এই নিশ্চয়তাবোধ আজকাল একটু কমে আসছে মনে হয়, সে হয়তো এই কারণেই যে দৈনন্দিন আর ততটা আলাদা নেই, অনেকটা গড হয়ে যাচ্ছে। গৌরী আইয়ুব এখানে কোনো গল্পে জানিয়েছেন, শাদা কলাইয়ের ডালে মৌরি ফুটে উঠে কী রকম মিলিয়ে যায় (১০পৃ), পাথরের খোরায় তেল মাখালে কেমন বদলে যায় (১১ পৃ), চৈত্রের গরম হাওয়া নিসুন্দে গাছের মাথা কেমন মুড়িয়ে দেয় (৩০ পৃ), বোতামঘর সেলাই করতে কোন ফোঁড় লাগে (৩৫ পৃ), উঠোনে অড়হরের চারা কেমন শুকিয়ে যায় (৫৯ পৃ), জানলার খাঁজে চেপটে যাওয়া টিকটিকির কঙ্কাল (৯১ পৃ), ছোট নাতিকে কোলের উপর উপুড় করে কীভাবে তেল মাখানো হয় (১৫৫ পৃ), কোমর ভেঙে পরিবেশনের মজা কী আর কষ্ট কী (১৫৭ পৃ)।

এই গল্পগুলি তখনকাব দিনের নাম-করা ও বিশিষ্ট সব কাগজেই বেরিয়েছিল। পাঠকদেব যে ভালও লেগেছিল—এতেই তা বোঝা যায়। একটা বইয়ের মধ্যে এতদিন পরে এই গল্পগুলো পাওয়া গেল আর সেটা এখনো পাঠকদের ভাল লাগবে। একজন গল্পলেখকের পক্ষে এটাই তো অনেক পাওয়া।

গৌরী আইয়ুব সম্পর্কে এই 'পাওয়া' শব্দটি ব্যবহার করতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। তিনি অনেক কিছুই নিশ্চয়ই 'পেতে' চেয়েছেন তখন প্রতিটি 'পাওয়া'র জন্যেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতেন। এই গল্পগুলি পড়ে পাঠকের ভাল লাগবে—এটার চাইতেও বেশি আমাকে যা মুগ্ধ করেছে তা, একজন গল্পলেখক হিসেবে নিজেকে কী করে প্রস্তুত করেছিলেন।

তার চাইতেও গভীর মুগ্ধ করল এই ঘটনাটি, এতটা প্রস্তুত হয়েও তিনি গল্পলেখক না হতে পেরেছেন।

গল্পলেখায় তাঁর এই দক্ষতাতেও তিনি জানিয়ে দিলেন, প্রস্তুতিটাই সব, প্রস্তুতিই সব।

[শ্রীদেবেশ রায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী]

গৌরী আইয়ুব-এর ছোটোগল্প

সুমিতা চক্রবর্তী

মানুষটি সামান্য ছিলেন না। তবে সাহিত্যিক হিসেবে তাঁকে খুব অসামান্য বলা যায় না। কোনো কোনো মানুষ থাকেন যাঁদের অস্তিত্ব, ব্যক্তিত্ব এবং জীবনযাপনই এক মর্মছেঁড়া, রক্তফোটানো শতদল। সেই জীবনটিকে গড়ে তুলতে গিয়েই তাঁরা ব্যয়িত করেন তাঁদের শ্বাসপ্রশ্বাসের অণুকণাগুলিও। তারপর আবার কোনো শিল্প সৃষ্টির জন্য বাড়তি সময় প্রায়ই থাকে না তাঁদের হাতে। গৌরী আইয়ুব তেমনই একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর জীবন আলেখ্য রচয়িতা কামাল হোসেন-এর সুন্দর ও যথার্থ অভিব্যক্তিতে এই সত্যই উঠে আসে—

"পৃথিবীর অনেক ঋতুর জল-বায়ু, রৌদ্র ছায়া অতিক্রম করে একটি স্বনির্মিত পথ ধরে তিনি হেঁটে আসছিলেন। স্মারক স্তম্ভে কোনও অমর অক্ষর লেখা হল কিনা, সেদিকে তাকানোর মতো অবকাশ কখনও পাননি।"

(গৌরী আইয়ুব : এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, কামাল হোসেন, চতুরঙ্গ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৫)

তাঁর জীবনচর্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বজায় রাখবার অনমনীয় জেদ থেকেই তাঁর প্রধান পরিচয়টি উঠে আসে। পূর্ব বাংলার অতি সুশিক্ষিত, সংস্কৃতিমান এবং ঐতিহ্যে সমর্পিত-নিষ্ঠা এক পরিবারের কন্যা গৌরী স্বেচ্ছায় বিবাহ করলেন বয়সে পঁচিশ বছরের বড়ো, ভিন্ন-ধর্মের এমন একজন মানুষকে যিনি রোগ মুমূর্ষু। এই বিবাহের জন্য কখনও অনুতাপ করেননি তিনি, যদিও এর জন্য তাঁর মা, বাবা এবং পরিবার-সংস্পর্শ তাঁকে ছেড়ে আসতে হয়েছিল। নিজের সংসারটিকে নিপুণ হাতে গড়েছিলেন তিনি। সেবায় ও সঙ্গদানে স্বামী আবু সয়ীদ আইয়ুবের স্বাস্থ্যকেও ফিরিয়ে এনেছিলেন কর্মপ্রাণতায়। তিনি ছিলেন সফল অধ্যাপিকা, নিবেদিত সমাজসেবিকা, কলকাতার অন্যতম বুদ্ধিজীবী। নারীর সমস্যা, দারিদ্র্য লাঞ্ছিত এবং যুদ্ধে গৃহহীন শিশুদের জন্য তিনি ছিলেন নিয়ত সক্রিয় এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার জড় উপড়ে ফেলবার চেষ্টায় নিত্য-সচেতন।

সেই সঙ্গেই গৌরী আইয়ুব লেখকও ছিলেন। লিখেছেন প্রবন্ধ, গালিব এবং মীর-এর দুটি সংক্ষিপ্ত জীবনী, অনুবাদ করেছেন জাপানি ভাষা থেকে। লিখেছেন মিতপরিসর কিন্তু আলো ছড়ানো একটি স্মৃতিরঞ্জিত শিশু কথা—'এই যে অহনা'। সেই সঙ্গে লিখেছেন বেশ কিছু ছোটোগল্প।

তাঁর সেই ছোটোগল্পগুলি নিয়েই এই আলোচনা আমাদের। 'তুচ্ছ কিছু সুখ-দুঃখ'-নামের বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৬ সালে (দে-জ পাবলিশিং)। কিন্তু গল্পগুলি লেখা হয়েছিল ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী তেরো বছরে বিভিন্ন পত্রিকায়। বোঝাই যায় যে, খুব নিয়মিত গল্প লেখক গৌরী আইয়ুব নন। গল্প লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙক্ষা, জেদ এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে তিনি কখনোই ছিলেন না। গল্প লেখা তাঁর কাছে জীবনযাপনের ঐ শতদল পদ্মের একটি পাপড়ি যেন। যেমন গান শোনা কিংবা স্বগৃহে সানন্দ আলাপ আলোচনার আসব বসানো অথবা নিবিড় কবিতা পঠন।

'তুচ্ছ কিছু সুখ দুঃখ'-এর অন্তর্ভুক্ত পনেরোটি গল্পের চোদ্দটি গল্পই নারীকে , নারীকে ঘিরে থাকা সামাজিক প্রত্যাশা ও অনুশাসনকে এবং নারী-মনের ঘাত-প্রতিঘাতকে নিয়ে লেখা। কেবল পঞ্চদশ গল্পটি এক পুরুষের অন্তর্ভাষণ। সেই গল্পটির কথাই বলা যাক আগে। 'আত্মগত' গল্পের নায়ক রথীন্দ্র। তিপ্পান্ন বছর বয়সী মানুষটির সংসার সুখের। স্ত্রী সুরমা সুন্দরী, কর্মকুশলা, প্রেমময়ী। পুত্র কনক সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। রথীন্দ্র করোনারি থ্রম্বসিস-এর প্রথম আক্রমণটি ঠেকিয়ে উঠেছেন।—"তাইতে হঠাৎ দুদিক দিয়ে ঘেরা ঘরের অন্য দিকটিও চোখে পড়ে গেছে যেন।" গল্পটির শুরু এখান থেকেই। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত রথীন্দ্র একটি কাচের কারখানার মালিক হয়েছিলেন নিজের কর্মক্ষমতায়। পুত্র কনক এখন দেখাশোনা করে সেটি। ছেলে, মেয়ে, পুত্রবধূ সকলের কাছেই রথীন্দ্র প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় একজন মানুষ। সেই রথীন্দ্র মৃত্যুর স্পর্শে একবার কেঁপে উঠেছেন। তারপর সুস্থ হয়ে চিকিৎসালয় থেকে বাড়িও ফিরেছেন। কাজ থেকে অবসর নিয়ে বাড়িতে শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছেন। স্ত্রী ও পরিবার পরিজনের একান্ত চেষ্টা যাতে রথীন্দ্র মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত না থাকেন। যাতে তাঁর মন থেকে মৃত্যুভাবনার রেশ মুছে দেওয়া যায়। রথীন্দ্রও

তা-ই চান হয়তো। অন্তত মৃত্যুভয়ে গুটিয়ে থাকা জীবন মোটেই যাপন করেন না তিনি। সহজ মানুষের মতো খাওয়া-দাওয়া করেন ; স্ত্রীর সঙ্গে প্রীতি সম্পর্কে ছেদ টানেন না। ছেলেকে কারখানার কাজের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন। তবু তাঁর মনের মধ্যে মৃত্যুর স্পর্শ লেগেছে—তাও মুছে যাবার নয়। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সে জানান দেয়। জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় মৃত্যুসচেতন, জীবনতৃষ্ণ মানুষ ভেবেছে—"পথে-পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর পরে" ; সেই মৃদু চোখ হল মৃত্যুর। সেই দৃষ্টিপাত থেকে মুক্তি নেই কোনো মানুষের। সেই চোখের মালিকের করস্পর্শ একবার অনুভব করলে তার শীতবলয় ছেড়ে আর বেরিয়ে আসতে পারে না সে কখনও। রথীন্দ্রেরও তাই হয়েছে।

রথীন্দ্রের পারিবারিক জীবনের সূক্ষ্ম কাটাকুটির খেলা নিবিড়ভাবে ফুটিয়েছেন গৌরী আইয়ুব। রথীন্দ্র সহজ মানুষের মতোই সব কিছু করেন। তার মধ্যেই বলেন—ভিনটেজ গাড়ির অ্যালবামটা দিয়ে যাবেন পৌত্রকে, কিংবা বলেন—"বিলিতি perfumeগুলি সব বৌমাকে দিয়ে দিযো, সব উপে শেষ হয়ে যাচ্ছে।" —তাঁর এই সব স্বাভাবিক উক্তির মধ্যে মৃত্যুবোধের ছায়া অনুভব করেন তাঁব স্ত্রী সুবমা। রথীন্দ্র খুব সহজ ভঙ্গি ধরে রাখেন মুখে। কিন্তু মনে মনে তিনিও জানেন—এসবই মৃত্যুলগ্নের কথাটি ভেবেই বলা। থ্রম্বসিস-এর আক্রমণের আগে মনে হয়নি এসব কিছুই। লেখক সুরমাব মনেব উপরও আলো ফেলেছেন। তাঁর ভয় ছিল, নিরাময়-ভবন থেকে বাড়ি ফিরেই রথীন্দ্র আবার গ্লাস-ফ্যাক্টরি-র কাজে মেতে উঠবেন। কিন্তু রথীন্দ্র আর ফ্যাক্টরি-তে যাবার কথা তোলেন না। তাতেও খুশি হতে পারেন না সুরমা। কাঁটা বিঁধেই থাকে। ছেলে কনক ফ্যাক্টরি-র ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে খুব আগ্রহ নিয়েই তা দেন বথীন্দ্র ; নানাবিধ আলোচনাও করেন। কিন্তু, সুরমা লক্ষ্য করেছেন, বথীন্দ্র কখনোই বলেন না—"আমি ফিরে যাই তারপর দেখব কী করা যায়।" সুরমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। গল্পের কেন্দ্রে আছে রথীন্দ্রের ভিতর-মনের চলচ্চিত্র। অলস সকালে, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, ঘুম ভেঙে যাওয়া মধ্যরাতে, বৃষ্টির ধারাপতন-শব্দে বারবার রথীন্দ্রের মনে ফিরে ফিরে আসে মৃত্যুর বার্তা—'জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়'। গল্পটিতে দীর্ঘ সময় ধরে লেখকের বিবৃতি রথীন্দ্রের একক মনের ভাবনাকে তুলে ধরে। কোনো ঘটনা নেই সেখানে। কেবলই মনের পরত উন্মোচন, কেবলই চেতনা-অবচেতনার সূক্ষ্মরেখায় মনের রহস্যের নকশা এঁকে তোলা। কাজটি গৌরী আইয়ুব করেছেন খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। চেতনা-প্রবাহরীতি তুলে ধরবার প্রয়াস নেই, নেই কোনোরকম চমক দেবার চেষ্টা। অথচ রথীন্দ্রের মনের ঐ মৃত্যুতরঙ্গ (ডেথ ওয়েভ)-উপলব্ধির শরিক হয়ে যাই আমরা খুব সহজেই।—

"যেদিন সে মরে যাবে তারপর দিনও সুরমা নিশ্চয়ই ঐ বালিশটাতেই ওখানেই শোবে—নাকি সুরমা শোবে এই দিকটায় আর তাকে জড়িয়ে ধরে ঐ দিকটায় এসে শুয়ে থাকবে কনক কিংবা রুনু অথবা অন্য কেউ? ...আচ্ছা, রথীন্দ্রকে নিয়ে চলে যাবার পরই একবার চাদর ওয়াড় পালটে দেওয়া হবে নিশ্চয়ই, চোখ মুছতে মুছতে সন্ধ্যার মা-ই সব পাল্টাবে বোধহয়, নাকি সব বিছানাপত্রই ফেলে দেওয়া হবে?...ওর নিত্যব্যবহার্য কাপড়চোপড় বিছানাপত্র সম্ভবত লোক ডেকে, এই ধাঙড় কি জমাদার ডেকে দিয়ে দেওয়া হবে বোধহয়।...তারপর হঠাৎ একদিন বাথরুমে তার ফেলে দিতে ভুলে যাওয়া পুরনো টুথব্রাশ দেখে সুরমা কেঁদে উঠবে।" —এমনই সব ভাবনা রথীন্দ্রেব। কারো সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায় না এই ভাবনা। এরও আছে অদ্ভুত এক স্বাদ! মন থেকে সরাতে চাইলেও তা মন জুড়ে বসে—'নিষিদ্ধ প্রেমের মতো'।

এই গল্পের মূল শক্তি এই আত্মগত মৃত্যু উপলব্ধির রূপায়ণে। গল্পের শেষে অবশ্য একটি

সমাপ্তি ঘটনা আছে। রথীন্দ্র একদিন পুরোনো চিঠিপত্র দেখতে বসেন। বাবা ও মা, একদা বিপ্লবী বন্ধু-র চিঠিপত্রের ভাঁজ থেকে বেরিয়ে আসে কুড়ি বছর বয়সে অল্পদিনের চেনা আর মৃদু মধুরতার আবেশ রচনা করা বিদেশিনী কিশোরী জিনা-র একটি চিঠি। তাঁর মনে পড়ে জিনা-র একটা ছবিও ছিল। বার করেন পুরোনো অ্যালবাম। প্রথম পাতা থেকে পুরোনো ছবিগুলি দেখতে থাকেন। মনের ধুকপুক শরীরে অস্বস্তি ছড়ায়। বুকে একটা ব্যথা। সুরমাকে ডাকতে হবে। ওঠবার চেষ্টা করে পড়ে গেলেন রথীন্দ্র।—"...জিনার ছবি পর্যন্ত সে পৌঁছল না। তবু থার্ড অ্যাটাক তার আর হবে না এ নিশ্চিত বলা যায়।" গল্পের শেষে আর কোনো বাগ্‌বিস্তার নেই। রথীন্দ্রের জীবন মৃত্যুর এই গল্পটি পাঠক সহজে ভুলতে পারেন না।

এইখান থেকে আমরা চলে আসি অন্য গল্পগুলিতে। গৌরী আইয়ুবের রচনাশৈলী এবং গল্প-ভাবনা কিন্তু এই গল্পটিতেই আমরা পেয়ে গেছি। মনস্তত্ত্বই তাঁর রচনার সম্পাত। মানুষের মন সমাজ নিরপেক্ষ হয় না। সেই অর্থে সমাজ-সংলগ্নতা কখনোই অস্বীকার করে না তাঁর গল্প। সমাজসেবিকা রূপে দীর্ঘদিন কাজ করবার অভিজ্ঞতা তাঁকে সমাজের প্রবল অভিঘাত বিষয়েও গভীর মনস্ক করেছিল। এতৎ সত্ত্বেও তাঁর গল্পে সমাজের দ্বারা বা ব্যক্তির দ্বারা সরাসরি চাপগ্রস্ত মানুষের বা মানব-সমাজের সংকটের উদঘাটনের পরিবর্তে ব্যক্তির মনের দ্বিধা, স্ববিরোধ, প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার রূপরেখাই বেশি দেখা যায়। এই সংকলনের অন্য গল্পগুলিও ব্যতিক্রম নয়।

একসঙ্গে নেওয়া যাক 'দায়', 'অতুলনীয়া', 'অসমান্তর', 'তর্কাতীত' আর 'বিচিত্র'—এই পাঁচটি গল্পকে। নারীর মনের গল্প। একক নারীর অনুভব। অনুভবের রহস্যরেখা, অজানিত স্তরান্তর। 'দায়' গল্পের রানী বিধবা—বয়স ঊনচল্লিশ। তার বড় জা মারা গেছেন সম্প্রতি। সংসারে দুর্বলস্বাস্থ্য ভাসুর আর বত্রিশ বছর বয়সের অধ্যাপক ভাসুর-পো সুবিমল। রানী যখন নতুন-বৌ তখন থেকেই কিশোর সুবিমলের সঙ্গে তার স্থাপিত হয়েছিল এক মনের সংযোগ। ভালোবাসার সমাজ-বিধির সীমা লঙ্ঘন তারা করেনি। এমনকি এ-বিষয়ে কখনো মন খুলে কোনো কথাও হয়নি তাদের মধ্যে। তবু এই নৈকট্য অনুভব করে তারা। যদিও সংসার ও বৈধব্যপালনের নিষ্ঠা থেকে একচুলও সরে আসার কথা ভাবতে পারে না রানী। তবু সুবিমলের উপস্থিতি, তার সঙ্গে দিনান্তে দু'চারটি কথা, স্মৃতিচারণ রানীর মনকে ভরে রাখে। বিবাহে সুবিমলের অনিচ্ছা তাকে প্রীত করে। এরই মধ্যে একদিন বিবাহিতা বোনের সক্রিয়তায় সুবিমল মত দেয় বিয়েতে। রানীর মন অশ্রুতে ভরে যায়। গল্পটি যদি এখানেই শেষ হত, বলা যেত সুলিখিত হলেও গতানুগতিক। কিন্তু গল্পে আছে একটি মোচড়। আগের রাত্রে একা যখন বারান্দায় এসে সে দাঁড়িয়েছিল রাত্রে, তখন সুবিমল এসে দাঁড়িয়েছিল পাশে। বৈধ কিন্তু নিবিড় সহমর্মিতায় তার হাত ধরেছিল, হাত রেখেছিল পিঠে। রানী কেঁপে উঠেছিল, ভরে উঠেছিল সেই সান্নিধ্যে। এতদিন রানী ভেবেছিল যে বৌ এলেও সুবি-র উদাসীনতার বর্ম ভেদ করতে পারবে না। কিন্তু কাল রাত্রের পর তা আর ভাবতে পারছে না সে। সে অনুভব করেছে সুবি-রও আছে 'উত্তপ্ত' ও 'উদ্দাম' হৃদয়। যদিও অনুত্তীর্ণ চল্লিশ বিধবার সর্বদা কালো পাড়ের সাদা শাড়ি, নিরামিষ খাওয়া আর একাদশী পালন ইত্যাদি আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে একটু সেকেলে মনে হবে তবু গল্পের মূল উপলব্ধিটি নারী মনের এক একান্ত চাওয়া-র—যে-চাওয়ার মুখে সমাজের এক নিষেধ—পাথর আছে চাপানো।

'অতুলনীয়া' গল্পটির কথক-নারী এক বিবাহিতা যুবতী। সে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে দেখেছে আর এক নারীকে—"সম্পর্কে ও আমার ভাগ্নী, বয়সে প্রায় সমান, রূপে গুণে আমার

সঙ্গে অতুলনীয়া, ওর খ্যাতি-অখ্যাতিও আমার পক্ষে বিস্ময়ের বস্তু।" এই অতুলনীয়া মেয়ের নাম সুতপা। সুন্দরী, মেধাবী, সপ্রতিভ, শিল্পকুশলা। সবচেয়ে বড় কথা সে নিজের ইচ্ছেয়, নিজের আবেগে সর্বদা চলতে চায়। কিন্তু তার আবেগ সর্বদাই ক্ষণ-কল্লোলিত। সিদ্ধান্তের তট সে প্রায়ই স্পর্শ করে না। আক্ষরিক অর্থেই সে ঝলমল করে ভেসে বেড়ায়। প্রথম প্রেম এক অসবর্ণ ছেলের সঙ্গে। কুলীন ব্রাহ্মণ পিতা মেয়েকে জোর করে পাঠিয়ে দিলেন দিল্লি। প্রথম প্রেম শুকিয়ে গেল। দ্বিতীয় প্রেম এক গুজরাতি যুবকের সঙ্গে। কিন্তু বাবা-মার পছন্দ করা সুপাত্র সুনীলকেই বিয়ে করল শেষপর্যন্ত। সুখীও হল, কিন্তু স্বামীর কর্মস্থলেই ভালোবেসে ফেলল জার্মান যুবক ক্লাউস কে। সুনীলকে আর তখন ভালো লাগে না তার। সেই ক্লাউস-কে নিয়ে মামার সংসারে এসে কয়েকদিন থেকে আবার ক্লাউস-কে নিয়ে ফিরে গেল সে। গল্পটা কিন্তু 'অতুলনীয়া' সুতপার নয়, ঐ মামিমার। সাধারণ মেয়ে। সুতপাকে ভালোবাসেন কিন্তু তার ঐ আত্মবৃত্ত উচ্ছ্বাসকে একটু সমালোচনাও করেন। পরিবারের বাকিরা কিন্তু সুতপার এই যা-খুশি করবার অধিকার যেন মেনে নিয়েছে। তার কোনো দোষই দেখে না তারা। মামিমা একটু বিরুদ্ধ কথা বললে স্বামীর কাছ থেকে ব্যঙ্গ শুনতে হয়—"অসাধারণকে সাধারণরা বুঝতে পারে কবে?" গল্পটা এখানেও নয়। গল্পটা মামিমার আত্মবিশ্লেষণের একটি মুহূর্তে নিহিত—"কী যে মনে করেন এঁরা এদের এই ভাগ্নীটিকে!" সুতপা যা করছে তা তিনি করলে নিন্দের বন্যা বয়ে যেত তাতে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু একা নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুতপার প্রায় সমান বয়সী মামিমা মনের গহনে অনুভব করেন—"হই না আমি ওর সমবয়সী, ওর মতন সমস্যায় পড়বার সম্ভাবনা আমার আর নেই।... কোনোকালে কি ছিল?" সুতপার আসল শক্তিটা তার সমাজ-বিধিকে সরলভাবে অবহেলা করবার শক্তিতে, নিজের আবেগকে স্বীকার করে নেবার অকুণ্ঠ ভাণহীনতায়।

'অসমান্তর' গল্পের নায়িকা কল্যাণী সর্ব অর্থেই এক সাধারণ মেয়ে। চিত্রশিল্পী অশোকের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব ওঠায় অশোক সংসার বন্ধন গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। কিন্তু অশোকের ছোট ভাই অসিতের সঙ্গে বিয়ে হয় কল্যাণীর। নিরুদ্বেগেই সংসার চলে। কল্যাণীর দুটি সন্তান ও স্বামী নিয়ে দিন যায়। ভাসুরকেও যথাবিধি দেখাশোনা করে সে। কিন্তু দিনের পর দিন অশোককে ছবি আঁকার সাধনায় মগ্ন থাকতে দেখার ফলে অশোকের জন্য একটি বিচিত্র জায়গা তৈরি হয় কল্যাণীর মনে। অশোক ছবি আঁকে, বারান্দাটিতে বসে সেলাই করে বা শিশুকন্যাকে ঘুম পাড়ায় কল্যাণী। কখনো কখনো কল্যাণী-র বসবার ভঙ্গি, চোখের টান, নাকের রেখা থেকে শিল্পীর মনে তরঙ্গ জাগে। ক্বচিৎ সেই দৃষ্টি অনুভব করে কল্যাণীও। একটুও ভুল বোঝে না। আনমনা অশোক একদিন প্রশ্ন করে—"কল্যাণী তুমি কি খুব সুখী?" কল্যাণীর হৃদয়ে সেই বাক্যটি বিদ্ধ হয়। তাকে আরো একটু এগিয়ে দেয় অশোকের দিকে। একদিন কুণ্ঠার সঙ্গেই সে একটু আঁকা শিখতে চাইল অশোকের কাছে। মুহূর্তে চিত্রশিল্পীর সচেতনতা জেগে ওঠে। সে এড়িয়ে যায় অনুরোধ? ছবি কি সকলের হয়? এতদিন পরে কল্যাণীর মনে হয় সে প্রত্যাখ্যাত, অপমানিত। তখনই কড়া নাড়ে অসিত—"স্বর্গ-প্রত্যাখ্যাতা কল্যাণীর সুনিশ্চিত মর্ত্য"। কোনো চড়া ঘটনা ব্যতিরেকে কেবলই ভাষার নৈপুণ্যে কল্যাণীর মনের গতিপথকে ধরেছেন লেখিকা। সর্ব অর্থে স্বাভাবিক এক নারী-মনের গল্প।

'তর্কাতীত' কাহিনীটি এক পত্নীর। তার স্বামী সঙ্গীত সাধনা করে। তার প্রতিভা নেই। বহু চেষ্টাতেও সঙ্গীতের ব্যাকরণ আয়ত্ত করেও তার স্বামী যথার্থ গায়ক হয়ে উঠতে পারে না। স্ত্রী স্বামীর সুযোগের জন্য একে তাকে বলে। চেষ্টা করে। তেমন কাজ হয় না। একদিন সে রাগ করে বলে- সে আর কিছু করতে পারবে না। স্বামী মেনে নেয় তিরস্কার। স্ত্রী নিষ্ঠুরতর হয়ে

বলে—"ছেড়ে দাও এসব গানটান, অন্য কিছু কর,..." স্বামী মেনে নেয় এই নির্দেশও। স্ত্রীর মনের ভূমিকা তখন বদলে যায়। সে উল্টো যুক্তি দেখায় আবার। প্রস্তাব দেয় গুরু বদল করবার। স্বামীর সামনে তুলে ধরে এক স্বপ্নের জগৎ। স্বামী নিরুদ্বিগ্ন হয়। সায় দেয়। চলে যায় সঙ্গীত সাধনায়। আর স্ত্রী-র মনের ভাব? গল্পের মোচড়টা সেখানেই—"এবারও সেই খাটের বাতার ওপরেই মুখ রেখে দুপুর থেকে জমিয়ে রাখা কান্নাটা ছড়িয়ে দিলাম। আমার বুকে ততক্ষণে গুমরে উঠেছিল তোড়ীর কান্না, কিংবা আছড়ে পড়েছিল সেই বিরহিণী ভামিনীর বীণার গান যে গান শুনে বনের হরিণ ছুটে আসত।

ওর সঙ্গে আমার বিরহ কোন কালে ঘুচবে কী? ..ও তো না বলতে জানে না।" 'বিচিত্র' গল্পেরও কথক এক নারী। তার সঙ্গে ট্রেনের কামরায় দেখা হয়ে গেল আর এক মেয়ে সলিলাব। একট পুরুষকে কেন্দ্র করেই তাবা পরস্পরকে জেনেছিল। সেই পুরুষ সঞ্জীব সলিলাকে ভালোবাসে জেনেই অন্য রমণী নিজের অনুভূতিকে সংযত বেখেছিল বন্ধুত্বের সীমায়। কিন্তু সেই ট্রেনের কামরায় একা সলিলাকে দেখে, সে শিক্ষয়িত্রী শুনে সেই অন্য নারীর মনে প্রশ্ন জাগে—কেন সঞ্জীবের সঙ্গে মিলন হয়নি তার। প্রশ্ন করা যায় না। কিন্তু সঞ্জীব যে চলে গেছে দূবে—এই সত্য ব্যথিত করে তাকে।

—"চেঁচিয়ে ওকে বলতে ইচ্ছে করলো, 'ওর সঙ্গে রাজনীতি আর সাহিত্যেব চর্চা-ই আমি করেছি। হৃদয়েব চর্চায় তোমার অবিসংবাদিত অধিকার জেনে বহুযত্নে তা পরিহার করেছিলাম। ...তাই ব্যর্থতা তোমারই।" এর পরেও কিন্তু মনে মনে যেন নিজেরই পরাজয় মেনে নেয়।

গৌরী আইয়ুবেব গল্পগুলির প্রায় প্রতিটিতেই নারীমানসের বিশ্লেষণ, নারী মনস্তত্ত্বের কূটাভাসগুলি উঠে এসেছে। উপরি-উক্ত পাঁচটি গল্পে তার প্রতিনিধি স্থানীয় সফল নিদর্শন দেখতে পাই।

আরো কয়েকটি গল্প আছে—কিছুটা গতানুগতিক। লেখার কলমের কুশলতা আছে একই রকম তবে পরিকল্পনার দিক থেকেও পূর্বোক্ত গল্প-পঞ্চক যেমন কিছুটা অভিনবত্বের দাবি করতে পারে—অনেকগুলি গল্পকেই তেমন বিশিষ্ট বলা যায় না।

'অঘটন' গল্পেব শৈলীটি কিছুটা আকর্ষক তবে গল্পটি সাধারণ। লেখক যেন এখানে বিশেষ একজনকে সম্বোধন করে গল্পটি বলেছেন। সেই সম্বোধিত পুরুষ (গল্প-অনুসারে পুরুষ-ই, নারী নয়) এ গল্পের নায়ক। কোনো এক কালে, কিশোর বয়সে, মাসির ননদ পদ্মামাসির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল সেই মানুষটি। সেই পরিচয়ের স্মৃতিতে এখনও মিশে আছে রোমান্টিক কিশোর-মনের উচ্ছ্বাস। তার পর সেই পুরুষটি বিত্তবান হয়েছে, বিদেশ থেকে উপার্জন করেছে অনেক টাকা, বেড়াতে এসেছে স্বদেশে। পদ্মামাসির বিয়ে হয়েছে পাড়া গাঁ-য। তার স্বামী বিশেষ কিছু করে না। গরিবের সংসারে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে তার বসবাস। এসব জেনে, দামি উপহাব নিয়ে সেই নায়ক চলে গেছে পদ্মামাসির গ্রামে। কিন্তু সেখানে পদ্মামাসির অসহনীয় দারিদ্র্য, অসহায়তা আর অভাব গোপন করবার নিষ্ফল প্রয়াস দেখে মর্মাহত হয়ে সে ফেরার পথ ধরে। গল্পটিব কথনশৈলী প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটিকে মনে করায়।

আর একটি গল্প 'আমি চিনি গো চিনি'। যখন এক মেয়ে মজলিশে এক বিদেশিনী বধূ নিন্দিত হচ্ছিল কারণ সে বাঙালি যুবকটিকে 'ভুলিয়েছে' তখন গল্প-বক্তার মনে পড়েছে ইজাবেল নামের এক অসামান্যা বিদেশিনীর কথা। শচীন বসু ছিলেন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাবান কিন্তু স্ত্রী ও ভালোবাসা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অ-স্বাভাবিক। নিজেকে তিনি শরীর সম্পর্কবিহীন 'নিরঞ্জন' প্রেমের অধিকারী বলে মনে করতেন। স্ত্রীকেও পেতে চেয়েছিলেন সেভাবেই। ইজাবেল

স্বাভাবিক সংসার চেয়েছিলেন কিন্তু স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে নিজের শরীর-তৃষ্ণাকে রেখেছিলেন সদা-সংযত। কিন্তু সেই স্বামীই ইজাবেল-কে 'ফ্রিজিড' বলে মনে করতেন তা এক অসতর্ক মুহূর্তে উচ্চারণ করলেন তিনি নিজেই। ইজাবেল নীরবেই সহ্য করলেন সে অভিযোগ। কিন্তু কখনো তিনি নিজের দাবি নিয়ে দেখা দিলেন না। এমনি করেই হয়তো চাপা দিয়ে রাখলেন অনুচ্চারিত প্রশ্ন—শচীন বসু হয়তো ছিলেন শরীর মিলনে অসমর্থ। দীর্ঘকাল ধরে, স্বামীর মৃত্যুর পর সারাজীবন স্বামীর প্রতি ভালোবাসা অন্তরে ধারণ করেছেন ইজাবেল। এই বিদেশিনীর একান্ত আত্মদানের কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন গল্পের বক্তা। এই গল্পটি খুব জমেনি। আদর্শের বাণী ছাপিয়ে গল্প হয়ে ওঠেনি ঠিকমতো। তুলনায় 'প্রত্যর্পিত' গল্পটির প্লট সাধারণ হলেও গল্প হিসেবে রচনাটি উত্তীর্ণ। সেই উত্তরণের মূলে আছে প্রথাসিদ্ধ গল্পাংশকে নতুন দৃষ্টি কোণ থেকে দেখবার স্বাতন্ত্র্য। স্বামীহীনা শোভা ছেলে কমলকে মানুষ করেছিলেন নিজের হৃদয় উজাড় করে দিয়ে। কমলও মাকে দিয়েছিল তার পরিপূর্ণ ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা। কিন্তু তার পর কেতকীর সঙ্গে যখন বিয়ে হল কমলের তখন শোভা অনুভব করলেন সরে গেছে তাঁর আসন। কমলের সব কিছু করে দেবার, তার সর্বসময়ের সহচরী হবার অধিকার অন্য এক নারীর। শোভা কোনো অনুযোগ করেননি, এমন হওয়াই স্বাভাবিক জেনে সরে থেকেছেন আত্মমর্যাদা নিয়ে। এ পর্যন্ত গল্পটি খুবই প্রথানির্ভর। কিন্তু তার পর কমল হঠাৎ একদিন মারা যায় পথ-দুর্ঘটনায়। দুই শোকার্ত নারীর কাছে ছুটে আসে আত্মীয়-পরিচিতরা। সেখানেও দেখা যায় তরুণী বধূকে ঘিরেই সমবেদনার মূল স্রোতটি আবর্তিত হয়ে চলেছে—"ঐ কচি বৌটাকেই কমল ভাসিয়ে দিয়ে গেছে সারা জন্মের মতো, মার তো জীবন শেষই হয়ে এল।" শোভার নিজের অনুভূতি ছিল আরও বিচিত্র—"কেতকীর যন্ত্রণার অস্থিরতা এবং কেতকীকে ঘিরে সবার প্রবল শোকোচ্ছ্বাস দেখে বুঝতে পারছিলেন, কমলের জন্য শোকেও সাড়ে পনেরো আনা অধিকার কেতকীরই।" শোভার মনে হয়েছিল—"সান্ত্বনার স্বতঃই অধিকার কেতকীর, শোভা ভিক্ষুকের মতন উদ্‌বৃত্ত কৃপাটুকু লাভ করেছেন সবার। কেতকী তাঁর ছেলেকে এমন কি ছেলের না থাকাকেও সম্পূর্ণই গ্রাস করেছিল..."। শোভা প্রগাঢ় সংযমে পুত্রের মৃত্যুর শোক সহ্য করেন। উপলব্ধির সূক্ষ্মতার স্তরবেখা পরিস্ফুট হলেও এখনও গল্পটি কোথাও নতুন লাগে না। কিন্তু এর পর এক বছর অতিক্রান্ত হতেই কেতকী পুনর্বিবাহ করে। সেই সূত্র ধরে এক আত্মীয়া মাতা-পুত্রের সম্পর্কের অচ্ছেদ্যতার কথা তুলে শোভাকে সান্ত্বনা দিতে এলে অতি সাধারণ কথাতেই অঝোর কান্নায় লুটিয়ে পড়েন চিরসংযত শোভা। গল্পটির নতুনত্ব শোভার শেষ উপলব্ধিতে—"আজ অন্তত কেতকী শোকের সম্পূর্ণ স্বত্ব শোভাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কেতকীর উপর রাগই বা আর করেন কি করে? সুখে দুঃখে কমলের স্মৃতিতেও যে এবার নিরঙ্কুশ অধিকার ফিরে পেয়েছেন শোভা।" গল্পের 'প্রত্যর্পিত' অভিধা তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

'নীচ' গল্পের নায়িকা এক সুন্দরী, পটিয়সী মহিলা যিনি নিপুণ ও নির্লজ্জভাবে পরিচিত মেয়েদের গয়না চুরি করতে পারেন। গল্পটিতে অন্য কোনো ব্যঞ্জনা নেই। কিন্তু চোর মীনু মাসির চরিত্রটি চমৎকার ফুটেছে। 'বিলম্বিত লয়' গল্পে স্বামীর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ঘর করবার নানা স্মৃতির স্পর্শে স্ত্রী-র দুঃখানুভবকে তুলে ধরেছেন লেখিকা।

গৌরী আইয়ুবের অল্প কয়েকটি গল্পের মধ্যেই বারবার মৃত্যু রোগ এবং নারীর বৈধব্য-জীবনের নিঃসঙ্গতার অনুভব বিম্বিত হতে থাকে।

'বেজোড়' গল্পটি বেশ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। সংসারে আছেন মা আর দুই ছেলে। আছে বড় ছেলের বৌ—তার সঙ্গে মা-র ঠিকমতো মনের মিল হয়নি। সন্তান-সম্ভবা পুত্রবধূ গেছে

বাপের বাড়ি আসানসোলে। সেখানে সংসারে আছেন বিপত্নীক পিতা। পুত্রবধূ যখন শ্বশুরবাড়িতে ফিরল, সঙ্গে নিয়ে এল বাবাকে—নাহলে কে তাঁকে দেখবে। প্রথমে বিব্রত ও বিরক্ত হলেও বেয়াই রমেশের নিঃসঙ্গতা ও নির্ভরতার মধ্যে সতী ক্রমেই এক ভালোলাগার স্বাদ খুঁজে পেলেন। কিন্তু পুত্রবধূ পিতা ও শাশুড়ির এই বন্ধুত্বটুকুকে বাঁকা চোখে দেখল প্রথম থেকেই। নবজাত পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে সে আবার পিতৃগৃহে গেল বাবাকে সঙ্গে নিয়েই। বিদায়ের পূর্ব সন্ধ্যায় দুটি প্রৌঢ় হৃদয় একে অপরকে অনুভব করল নিবিড়ভাবে। নতুন কথা না থাকলেও গল্পটি স্বাভাবিক ও সু-পাঠ্য।

'বর' গল্পটিকে বলা যেতে পারে গৌরী আইয়ুবের লেখা একটি প্রত্যক্ষ ও একমাত্রিক সমাজ-মনস্ক গল্প। বাড়ির বড় মেয়ে বিয়ে করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু অব্রাহ্মণ পাত্র-কে। তাতে তার পরিবারের মাথা হেঁট হয়েছে বলে মনে করে সবাই। ছোটো মেয়ের বিবাহ-উৎসবকে ঘিরে গল্পটি রচিত। সেই মেয়ের বিয়ে জাতগোত্র দেখেই ঠিক করা হয়েছে যদিও পণ তারা দাবি করেছে প্রচুর। বিবাহ-ক্ষণে ছোটো মেয়ে নীলা ভাবে—কার বর যোগ্যতর। সমাজ কিভাবে মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের চেয়েও জাতি-বর্ণকে বড় করে তুলছে তার তিক্ততার উপলব্ধিতে পূর্ণ হয়ে যায় তার মন।

আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে এতটা আর সত্য নয়। অন্তত, অর্থকরী প্রতিষ্ঠা থাকলে জাতকে আর খুব বড় করে দেখা হচ্ছে না। কিন্তু এই গল্পটি বেশ কিছুকাল আগে লেখা। আর, যদি মনে রাখি পিতার অমতে বিবাহ করেছিলেন বলে গৌরী দত্তর-র পিতা সারাজীবনের মতোই ত্যাগ করেছিলেন কন্যাকে তাহলে লেখিকার অনুভবের তীব্রতাও আমরা যথার্থ প্রেক্ষিতে বুঝে নিতে পারি।

গৌরী আইয়ুব বিবাহসূত্রে এবং তার পর সমাজসেবার পথে দরিদ্রবর্গের মানুষকে দেখেছিলেন কাছে থেকে। তাদের মধ্যে আছে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেরই নারী-পুরুষ। গৌরী আইয়ুব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত মুসলমান সমাজের মানুষ নিয়ে কোনো গল্প লিখেছেন কি না জানি না। কিন্তু বিত্তহীন বর্গের মুসলমান সমাজ নিয়ে, বিশেষ করে সেই সমাজের মেয়েদের নিয়ে লেখা দুটি গল্প স্থান পেয়েছে এই সংকলনে। গল্পগুলিতে দরিদ্রের প্রতি যে নিয়ম তান্ত্রিক সামাজিক অবিচারের পদ্ধতি চলে তার উল্লেখও আছে কিন্তু এই দুটি গল্পেও নারী-মনস্তত্ত্বই কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে গরিব মুসলিম সমাজের জীবন প্রণালীও চিত্রিত হয়েছে পূর্ণ স্বাভাবিকতার সঙ্গে।

'ত্রিযামা' গল্পটি শুরু হয়েছে রমজান মাসের তৃষ্ণার বিবরণে। কেবল বর্ণনাতেও লেখিকা কতটা পারদর্শী ছিলেন তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে প্রথম অনুচ্ছেদে। —"কাকটা বহুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর শেষকালে নেমেই এল। টিউবওয়েলের নীচে ঠিক যেখানটায় বালতি ঘড়া রেখে রেখে ক্ষয়ে গেছে সেখানে শান-বাঁধানো ইঁটের ফাটলে চঞ্চুটি সে কাত করে ব্যাকুলভাবে ঢুকিয়ে দেয়।" এরকমই বাহুল্যবিহীন জোরালো রেখার আঁকা ছবি। গল্পটিতে বিভিন্ন শাখা আছে। যেন একটি মোড়কে তিনটি গল্প। প্রথম অংশে তফুরন-এর বাবা ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে মেয়ের কারণ তার ভাগের পৈত্রিক জমি আত্মসাৎ করতে চায় সে। ভাইপো তথা জামাইকে খেতের কাজে খাটায় সে, নিত্য উৎপীড়ন করে জমি লিখে দেবার জন্য। কথা শোনায় দিনরাত কারণ জামাই-এর নিজস্ব উপার্জন নেই। অসুখ হলে সেবাও পায় না তফুরন-এর স্বামী। তফুরন-ও বাবা ও মা-র প্রভাবে স্বামীর দিক দেখে না। ভুলু একদিন বাড়ি থেকে চলে গেল। গল্পের দ্বিতীয় স্তরে ভুলু গেছে কলকাতায় বোন মরিয়ম-এর কাছে। তার যক্ষ্মা

হয়েছে। কিন্তু গরিবের মবিয়ম ইচ্ছে থাকলেও স্বামীর অমতে ভাইকে ঘরে রাখবার ভরসা পায় না। মা-কে খবর পাঠায় ভুলুকে নিয়ে যাবার জন্য। গল্পের তৃতীয় অংশটিই জটিল। ভুলু ও মরিয়ম-এর মা বিবি এক বাড়িতে পরিচারিকাব কাজ কবে। তাব বান্ধবী এবং ভুলুরও পরিচিতা আসিয়া ভুলুর অসুখের খবর দেয় বিবিকে। আসিযাকে সঙ্গে নিয়েই বিবি যায় ভুলুকে দেখতে। কিন্তু বিবি-র জীবনকে তখন রঙ্গিলা কবে তুলেছে এক পুরুষের সাহচর্য। আসিয়াকে মাঝপথে ছেড়ে দিযে বিবি চলে যায় প্রেমিকেব কাছে, এক বাত্রি তাব সঙ্গে কাটাবে বলে। মরণাপন্ন পুত্রকেও মনে পড়ে না তাব। গৌরী আইয়ুব এমন একটি মাতৃ-চবিত্র ফুটিয়ে তুলতে দ্বিধা করেন নি। আসিয়া একাই ভুলুকে সঙ্গে নিয়ে আসে ও বিবিব বসবাসেব গ্যাবাজ-ঘরটিতে তার ঠাঁই করে দেয়। রোগ-আক্রান্ত সন্তানকে সামনে বেখে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে বিবি।

'চিরন্তনী' গল্পটিও গরিব মুসলিম পরিবারের বিবাহ সংক্রান্ত গল্প। এই গল্পটি বিবৃতি প্রধান। তেমন কোনো ঘটনা নেই। রহিমা তার ছেলের শাদি দিতে চায বোন শাকিলা-ব মেয়ে হুসনাব সঙ্গে। বড দিদিকে সঙ্গে নিযে কলকাতায় শাকিলা-র বাড়িতে যায সে। শাকিলা-ব সংসাবে তার দুই ননদ হল মুরুব্বি। দর-দস্তুর চলে বিয়ে নিয়ে। শাকিলা আব বহিমা— দুই বোন এখন দু'পক্ষে। এখানে পণ দিতে হয় ছেলের পক্ষকে। মেয়ে-পক্ষ দাবি করে শাড়ি-গযনা-প্রসাধন ছাড়া দু মন চাল, এক মন আলু, আধ মন মিঠাই ও সেই অনুপাতে তেল, পেঁযাজ, রসুন, গোশ্‌ত্। রহিমাব দিদি একমণ চাল, আধমণ আলু, দশ সের মিঠাই দেবার কথা বলে চলে যায়। এখন মেযেব পক্ষ বুঝে দেখুক। কিশোরী হুসনা আড়াল থেকে শোনে সব। ছোটোপিসির আপত্তিতে মনে মনে রাগ করে। বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বড়ই ইচ্ছে তার। শেষ পর্যন্ত হুসনা-র বড় ভাই মাণিক এসে সব শুনে ছেলেব পক্ষের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। বলে—"যা দিনকাল পড়েছে এখন মোসলমানের ছেলেকেও পণ দিয়ে আনতে হয়।" সকলেবই মত হয়। হুসনা নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবে—"খোদা, বড় ভাইকে লম্বা হায়াৎ দাও, বহুত দৌলত দাও।" গল্পটিতে খুব বলবার মতো কিছু নেই। কিন্তু একটি পরিবারের স্বাভাবিক প্রতিফলন আছে। জীবন-বাস্তবেব রূপবিম্ব।

এই সব নিয়েই গৌরী আইয়ুবের গল্প-সংকলন। আমরা আগেই বলেছি, লেখক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার জোরালো সংকল্প তাঁর ছিল না। জীবনযাপনের পথে নিজের অভিজ্ঞতা, ভাবনা আর উপলব্ধি সাজিয়ে অবসর মতো কিছু গল্প তিনি লিখে গেছেন। গল্পগুলি থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি আমরা।

আমরা দেখি তাঁর পর্যবেক্ষণ গভীর ও নিবিড়। অনুভব করি নারীমনের গহন স্তরগুলিকে তিনি চিনতে ও চেনাতে চান। তাঁর গল্পে মানবিক মূল্যবোধেব স্বীকৃতি যেমন আছে তেমনি মনের জটিলতার দিক থেকেও তিনি চোখ সরিয়ে নেননি; সমাজ কিভাবে মানুষের মনের উপর নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করে তা তিনি অনুভব কবেন। মানবাধিকারের মূল্যই তাঁব কাছে সবচেয়ে মহার্ঘ। তবে নরনারীর প্রেম-সম্পর্কে শরীরচেতনার দিকটাব ইঙ্গিত থাকলেও বর্ণনার ক্ষেত্রে এই দিকটি তিনি পরিহার করেন।

গৌরী আইয়ুবের গল্পবয়ন-ক্ষমতায় সামর্থ্যের অভাব ছিল না। তবে প্লটের বৈচিত্র্য সম্পর্কে খুব বেশি ভাবনা তিনি ব্যয় করেননি। ঘটনা নয়, তাঁর গল্প মনোবিশ্লেষণের উপরেই নির্ভর করে। তাঁর গদ্যভাষা সাবলীল, সূক্ষ্মতা বিহারী, বাস্তবকে প্রতিরচনা কববার পক্ষে সুনিপুণ। তবে তাঁর ভাষায় অতীন্দ্রিয়তার ব্যঞ্জনা খুব বেশি নেই। যদিও প্রকৃতি বর্ণনায় তিনি সুদক্ষ। সেখানেও অবয়বীকরণের দিকে তাঁর ঝোঁক। আর, নিম্নবিত্ত মানুষের কথা বলেন যখন তখন ভাষার স্বাভাবিকতা অনেকখানি ধরলেও তাদের মুখের ভাষাব অনিবারিত অশালীনতার দিকটি তিনি

বর্জন করেন। ব্যক্তি গৌরী আইয়ুবের অসম্ভব সুভদ্র ও শালীন রুচিবোধই হয়তো তাঁর মহৎ সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পক্ষে ছিল সঙ্গত প্রতিবন্ধক।

গল্পের ক্ষেত্রে গৌরী আইয়ুব প্রথাসিদ্ধ গঠন ও বিবৃতিধর্মী ভাষার ব্যবহারেই প্রধানত অভ্যস্ত ছিলেন। কখনো কখনো উত্তম পুরুষের বাচন তিনি ব্যবহার করেছেন কিন্তু তাতে ভাষা কাঠামোর তেমন কোনো বদল হয়নি। তাঁর গল্পের প্লট ও ভাষা—দুইই বাস্তবতার সঙ্গতির সীমায় রক্ষিত। কিন্তু জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে, পরিণত বয়সে 'গল্প' সম্পর্কে গৌরী আইয়ুবের ভাবনার কিছু পরিবর্তন হয়েছিল মনে হয়। চমকে দেবার মতো একটি গল্প তিনি লিখেছিলেন 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার ডিসেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যায়—নাম 'কবন্ধ'। প্রায় একটি সুররিয়ালিস্টিক গল্প। এক মনোরম অপরাহ্ণে খোলা মাঠে এক বিনোদন আসরে গল্পের কথক-চরিত্র এক প্রবীণা মহিলার পাশে এসে বসেছিল এক ব্যক্তি। ঠিক ব্যক্তি নয়, এক যন্ত্র-মানব। তার মাথা নেই, গলার নলির উপর বসানো একটি ব্লেডওয়ালা পাখা। ঘুরছে কখনো জোরে, কখনো আস্তে। সেই কবন্ধ এসে মহিলার পাশে বসে আলাপ জমায়, পরিচয় দেয়, চকোলেট খাওয়ায়। অথচ মহিলাটি দেখেন পাশাপাশি কেউই যেন অস্বাভাবিক কিছু দেখছে না। বিস্তৃত বিবরণে গা ছমছমে অলৌকিকতা আর বাস্তবতার যে নিপুণ মিশ্রণ গৌরী আইয়ুব ঘটিয়েছেন তা বিস্মিত কবে দেয় আমাদের। মনের মধ্যে ভয় অথচ বাইরে স্বাভাবিকতার মুখোশ বজায় রেখে তিনিও আলাপ চালান। তার পর এক সুযোগে উঠে পড়ে পা চালান জোরে। পিছনে অনুসরণ করে পাখা-মাথা যন্ত্রমানুষ। উর্ধ্বশ্বাস ছোটা, বাস, ট্রেন, ট্যাক্সি—সর্বত্রই পিছনে সেই কবন্ধ ছুটে আসে। শেষ পর্যন্ত ভাইদের ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে দরজা আটকে দেন তিনি। দরজায় তখন স্টিলের আঙুলের ধাতব শব্দ। এর পরেই কিন্তু অলৌকিকের আবরণ ছিঁড়ে গল্পটিকে লেখিকা দাঁড় করান এক স্বপ্ন দেখায়। বোঝা যায় ক্ষমতা থাকলেও কল্পনার উদ্ভটত্বকে স্বরূপে শিল্পিত করতে চান না তিনি। আদ্যন্ত যুক্তিবাদী লেখিকা-লেখার জগতেও তা-ই থাকতে চান। শেষের দিকে গল্পটি একটু নীতি প্রচারের মতো হয়ে যায়। সেই কবন্ধ ব্যাখ্যাত হয় 'অবচেতনার ভয়'-এর প্রতীক রূপে। গল্পের শেষ ছত্র—"...নিজের অহংকে ধন্যবাদ দিলাম, আমার অবচেতনার ভয়ের কাছে আমাকে হেঁট হতে দেয়নি।

রবিবারটা এবার রবিবারের মতনই লাগল।" একটি অসামান্য কল্পনার গতানুগতিক সমাপন। হয়তো চিন্তা করলে এই রসের গল্প লেখায় পূর্বের সৃষ্টি ছাপিয়ে যেতেন তিনি।

গল্প-লেখক গৌরী আইয়ুব-এর এই সৃষ্টির খতিয়ান থেকে আমাদের মনে হয়—গল্পকার হিসেবে নিজের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার তিনি করে উঠতে পারেন নি। কিছুটা কর্মব্যস্ত জীবনের সময় ও সুযোগের অভাব, কিছুটা আগ্রহেরও অভাবে। অন্তত খুব গুরুত্ব দিয়ে গল্প লেখার ব্যাপারটাকে তিনি ভাবেন নি বলে মনে হয়। কিন্তু মূল কারণটি সম্ভবত নিহিত ছিল তাঁর অহংবোধেই। নিজের ব্যক্তিত্বের আদর্শ, নীতি ও রুচির যে উচ্চতা তাঁর মনকে আকার দিয়েছিল সেখান থেকে জীবনের হীনতা ও নীচতার কৃষ্ণতম রন্ধ্রকে চেনা যায় কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার সমান্তরাল ভাষা মুখে আনা কঠিন। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অনেকখানি নৈর্ব্যক্তিকতা মেশাতে পারলে তবেই প্রকৃত মহৎ শিল্পী হওয়া যায়। কীটস কথিত সেই 'নেগেটিভ্ কেপেবিলিটি'। খুব বেশি আত্মসচেতন এবং অহংবোধসম্পন্ন (সদর্থে) মানুষদের পক্ষে সব সময়ে শিল্পী হওয়া, বিশেষত ভাষা-শিল্পী হওয়া সহজ নয়। গৌরী আইয়ুবের পক্ষে কখনো ভোলা সম্ভব ছিল না যে তিনি গৌরী আইয়ুব—তরুণ প্রজন্মের আদর্শ শিক্ষয়িত্রী, সমাজসেবিকা, নারী। বোধ হয় সেজন্যই তাঁর বড় গল্প-লেখক হওয়া হল না।

আর সেইজন্যই 'এই যে অহনা' নামের অপরূপ মধু-কথাটি অনুপম শিল্পিতায় শুনিয়ে দিতে

পেরেছিলেন তিনি। এই লেখাটির রচয়িতা রূপে তাঁকে—গৌরী আইয়ুবের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বটিকেই প্রয়োজন ছিল। ছোটগল্প নয়, ঠিক স্মৃতিকথাও নয়। জীবনকথার একটি সজীব সুবাসিত টুকরো—যেন একমুঠো সদ্যোমুকুলিত জুঁইফুল কিংবা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"তখন বর্ষণ শেষে/ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে উন্মীলিত গুল্মোরের থোলো"। যে না পড়েছে তাকে বোঝাই কী বলে। ঠাকুরমা থাকেন শান্তিনিকেতনে, বেড়াতে গেছেন ছেলের বাড়ি মুম্বই। সেখানে থাকে ছেলে আর পুত্রবধূ। দুজনেই বিজ্ঞানসাধনা করে। আর আছে ছ-সাত বছরের নাতনি অহনা। ঠাকুরমা—অহনার আম্মা তিনি—আর অহনার দিন যাপনের আলেখ্য এই লিখনটি। অবন ঠাকুরের মতোই ছবি লেখায় ভরা। ছত্রে ছত্রে যেন বেজে ওঠে রবীন্দ্রনাথের গান, রিমঝিম করে ওঠে অহনার স্কুলে শেখা চমৎকার সব 'রাইম্'। নাতনি-ঠাকুরমার মহাভারত পাঠের আসরে, জন্মদিনের উৎসবে, সমুদ্রতীর ভ্রমণের রঙিন বিকেলে আমরা নিবিড় সঙ্গী হয়ে থাকি। তারপর আসে একদিন ঠাকুরমা-র ফিরে যাবার বেলা। চোখের জল ভিতরে নিয়ে আমরাও আম্মা-র হাতে অহনার হাত দিয়েই তুলে দিই হিমঝুরি-র ফুল। অহনার ছুটি হলে আমরাও তো যাব শান্তিনিকেতনে বেড়াতে—অহনার সঙ্গেই। তখন লেখা হবে শান্তিনিকেতনের দিনগুলির গল্প। সেই পরাণ-কথাটি নক্‌শি কাঁথায় পাড়ের সুতোয় তুলে রাখার আগেই গৌরী আইয়ুব মেঘের দেশে গেলেন।

[সুমিতা চক্রবর্তী বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও পেশায় অধ্যাপক]

সৃষ্টির বিচিত্র পথে এক নিভৃতচারিণী

তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়

শুক্লপক্ষের চৈত্র আকাশে জ্বলজ্বল করে কালপুরুষ তারামণ্ডল—আর তার পায়ের তলায় লালাভ উজ্জ্বল একটু বড় 'লুব্ধক' তার সমস্ত স্বাতন্ত্র্য দিয়ে দৃষ্টিকে টেনে রাখে। রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনায়, মানবতাবাদী চেতনায়, সমাজ বিশ্লেষণে অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুব বাঙালী বুদ্ধিজীবীর কাছে এমনই কালপুরুষতুল্য। তাঁর সেই বিপুল পাণ্ডিত্যের দীপ্ত বলয়কে উজ্জ্বলতর করেছে অসামান্য মানবদরদী প্রখর যুক্তিবোধে তীক্ষ্ণ, সংবেদনশীল মননের অধিকারী শ্রীমতী গৌরী আইয়ুবের ব্যক্তিত্বের স্নিগ্ধবিভা। কবি শঙ্খ ঘোষ শ্রীমতী আইয়ুবের অবস্থানটিকে যথার্থ চিহ্নিতকরণে বলেছিলেন—"পটভূমিকার প্রচ্ছন্ন"। যদিও সমাজ সংগঠনের কাজকর্মে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গ্রন্থনায় বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক পটপ্রেক্ষায় গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে গৌরী আইয়ুবের একটি নিজস্ব জায়গা ছিল। শুধু তাই নয়, সমস্ত রকম খ্যাতির মোহ থেকে দূরচারী এই মানুষটি যে সাহিত্যের অধিকাংশ শাখাতেই স্বচ্ছন্দ বিহারী তা আজও বহু বাঙালী পাঠকেরই অজানা।

কল্পনা, মনন তথা বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই। গৌরী আইয়ুবেরও শিল্পীসত্তার প্রকৃত মূল্যায়ণই তাঁর চরিত্র ও প্রতিভার যথার্থ নির্দ্ধারক হয়ে ওঠে। পাদপ্রদীপের আলোকবৃত্ত থেকে দূরে থেকেও প্রবন্ধ, সাহিত্য-সমালোচনা, ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা-অনুবাদ

সাহিত্য, এমনকি বিশুদ্ধ কথা সাহিত্যচর্চাতেও তাঁর সাবলীল গতায়াত। একারণে আধুনিক ও উত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি নির্দ্ধারণে এমন একজন বিচিত্রগামী স্রষ্টাকে সঠিক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব সমকালের এবং পরবর্তী প্রজন্মের থেকেই যায়।

মোটামুটি ষাটের দশক থেকেই সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে গৌরী আইয়ুব কোন না কোনভাবে সংশ্লিষ্ট থেকেছেন। এবং তারই তীব্র সজাগ ও চিন্তাঋদ্ধ প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে। তার মধ্যে যে লেখাগুলো বর্তমান পাঠিকার দৃষ্টি সীমাভুক্ত সেগুলির পবিপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে, তাঁর এইসব রচনাগুলি যুগপৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য আধারিত। তবে কখনই তা প্রচলিত গোষ্ঠী রাজনীতির প্রভাবপুষ্ট নয়। বরং অভূতপূর্ব মানবদরদী রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ। আবার নিতান্ত তত্ত্ব ও তথ্যভাবে ন্যুব্জদেহ নয়, কিন্তু অসম্ভব প্রবাদগুণসম্পন্ন, তন্বী সাবলীলতায় আকর্ষণীয়।

কৈশোর যৌবন-লালিত দার্শনিক স্থৈর্যই গৌরী আইয়ুবকে দিয়েছিল নিরপেক্ষ উদার সমাজ দৃষ্টি। "মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন" ছিল তাঁর জীবনের বারোআনা। হিন্দু, মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় এবং সামাজিক বিশ্বাসের অনুদার-অমানবিক দিকগুলিকে দ্বিধাহীন দৃঢ়তায় অথচ নম্র দরদীয়ানায় সমালোচনা করেছেন। উভয় সম্প্রদায়ের তরুণ প্রজন্মকে স্বচ্ছ বিচারবোধ প্রয়োগে সারাজীবন উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাঁর এজাতীয় বিষয়ভাবনা সমৃদ্ধ পরপর লেখা দু'টি প্রবন্ধ হল—"হিন্দু-মুসলমান বিরোধ—রবীন্দ্রনাথের চোখে" এবং "জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধ"। প্রথম লেখটির মূল আশ্রয়—রবীন্দ্রভাবনায় ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক বিরোধেব সমাধান সন্ধান। অবশ্য দ্বিতীয় রচনাটিতেও মানবতাবাদী জাতীয়তাবোধের মর্মোদ্ধারে লেখিকা একাধিকবার কবিগুরুর দ্বারে প্রার্থী হয়েছেন। তবে দু'টি লেখার কোনটিতেই রবীন্দ্র-অভিমতের প্রতি তাঁর অন্ধ আনুগত্য দেখা যায় নি। রবীন্দ্রনাথেব প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের আধারে তিনি সাম্প্রদায়িক দূরত্বের কাবণগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। দেখিয়েছেন—অর্থনৈতিক তীব্র প্রতিযোগিতা, একপক্ষের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা এবং স্বাধীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার সাংবিধানিক ঘোষণার কিছু মৌলিক ত্রুটি কিভাবে সাম্প্রদায়িক বিভেদের অঙ্কুরটিকে পুষ্টি যুগিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ চতুর্বর্ণ প্রথাকে একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বললেও গৌরী আইয়ুবের মতে, আমাদের এই প্রাচীন সমাজ-কাঠামোর মধ্যেই সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতার বীজটি উপ্ত করা হয়েছিল। আর্যদের থেকে অনার্যরা যে সব ব্যাপারেই পশ্চাদপদ এজাতীয় রবীন্দ্র বক্তব্যও লেখিকার কাছে ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য বিপজ্জনক মনে হয়েছে। যদিও শেষপর্যন্ত আশ্রমকন্যা গৌরী সাম্প্রদায়িক সমস্যার একমাত্র সমাধান খুঁজে পেয়েছেন "মানুষের ধর্ম"-এর মধ্যেই। বিশ্বভারতীর মুসলমান আশ্রমিকদের দেখে গৌরীর এও মনে হয়েছিল যে, হিন্দুদের থেকে মুসলমানরাই দ্রুত রবীন্দ্র-দর্শনে অনুপ্রাণিত হবে। অবশ্য সেক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকেই যায় যে, গৌরী যাঁদের দেখেছিলেন তাঁরা শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান, কিন্তু ভারত ও বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক অনগ্রসর অশিক্ষিত নানাভাষী মুসলমানের প্রতিক্রিয়াও কি একইরকম হবে? আসলে প্রাবন্ধিকেরও এ বিষয়ে দ্বিধা ছিল, তাই তাঁকে লিখতে হয়—"অন্তরে স্বাধীনতার চর্চা করব না, অন্তঃপুরে মেয়েদের স্বাধীনতা দেব না, দেশের এক বিরাট জনসংখ্যাকে পায়ের তলায় চেপে রাখব অথচ সমাজের ওপরতলার ভদ্রলোকের জন্য স্বাধীনতা প্রার্থনা করব...।" স্বাধীন ভারতের বহুমুখী আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার সন্ধিক্ষণে আমরা এধরনের অসঙ্গত আত্মবিরোধকেই লালন করে যাই।

এমনই গভীর ও গম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রেই গৌরী আইয়ুব আরও জটিল বিতর্কিত প্রসঙ্গের অবতারণা করেন "জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধ" প্রবন্ধটিকে। আজকের

ভারতবাসীর কাছে জাতীয়তাবোধের অনুভব কেমন হওয়া উচিত লেখিকা রচনাটির মধ্যে তারই উত্তর খুঁজেছেন। ক্রমশঃ যা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। তা হল, গোষ্ঠী স্বার্থে ভারাক্রান্ত গণতন্ত্র কিছুতেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তাঁর মনে হয়েছে, এক্ষেত্রে এখন একটি পথই খোলা, তা হল— ব্যক্তিস্বার্থ ও দেশীয় স্বার্থের উর্ধ্বচারী আন্তর্জাতিকতাবোধ। সাম্যবাদী আদর্শবোধ, আপৎকালে দূরদেশের মানবিক নিঃস্বার্থ সহানুভূতির স্পর্শ এবং বার্তমানিক-ভুবনীকরণের প্রেক্ষাপট প্রাবন্ধিকের এই ধারণাকে আরও পরিপুষ্ট করে তোলার সম্ভাবনা বহন করে। কিন্তু যেহেতু তাঁর সম্বল শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানাঞ্জন শলাকাটি নয়, তাই দৈনন্দিন জীবন অভিজ্ঞতা সিঞ্চিত খোলামনে আত্মসমালোচনা করতে পেরেছেন এইভাবে—"এদেশে আমরা যারা পরিবারের গণ্ডী থেকে বার হয়ে পল্লীর মঙ্গলটুকুও চিন্তা করতে পারি না, আবর্জনার গাড়ি চলে যাবার পর নিজের সংসার পরিস্কার করে জঞ্জালের পুঁটুলি অনায়াসে প্রতিবেশীর দুয়ারের সামনে রেখে আসি, আপৎকালীন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে কালোবাজারি করি, শিশুদের খাদ্যে প্রাণদায়ী ওষুধে ভেজাল মেশাই এই আমরাই কি করে একধাপে বিশ্বমানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠব ভেবে পাই না।" তবে শেষপর্যন্ত লেখিকা নৈরাশ্যের অন্ধকারকে দূরে ঠেলে ভারতবাসীর সামনে 'নম্রজাতীয়তাবোধের" দীপশিখাটি জ্বালাতে চেয়েছেন।

এমন বিশ্বাসে স্থিতধী ছিলেন বলেই যখন রুশদীর প্রতি উচ্চারিত মৃত্যুর পরোয়ানা সমস্ত বিশ্বকে আলোড়িত করেছে সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় বিদ্বেষের স্রোতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বইটি না পড়েই শুধু আদেশের প্রভাবে ভারতীয় সংখ্যাগুরু ও লঘু উভয়গোষ্ঠী প্রতিক্রিয়াশীল তখন গৌরী আইয়ুব "রুশদী—খোমেইনি এবং আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি" শিরোনামাঙ্কিত প্রবন্ধটিতে এই অন্তহীন বিতণ্ডার কারণানুসন্ধান করেছেন, স্রষ্টার স্বাধীনতার অপব্যবহারকে যেমন নিন্দা করেছেন, সেইসঙ্গে স্রষ্টার প্রতি ধর্মগুরুর আক্রমণকেও সমর্থন করেননি। যে মানুষটি স্বচ্ছন্দে বলতে পেরেছিলেন, "পৃথিবীর সব মন্দির মসজিদ গির্জা থেকে নিজেকে আমি নির্বাসিত করেছি অনায়সে। মাথা নত করবার মতো কোনও দেবতা তো পাই না কোনও দেবালয়ে। বরং আমার পথের ধারেই এসে দাঁড়িয়েছেন কিছু প্রণম্য মানুষ।" স্বভাবতঃই তিনি খোমেইনির ঘোষণার উত্তরে প্রশ্ন করতে পারেন—"এমন দুর্দিন কি সত্যিই এসেছে যে ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষের কীর্তিকে রক্ষা করবার জন্য ভাড়াটে ঘাতকের প্রয়োজন হবে?" লেখিকার মতো আমরাও তো জানি—অমৃতকে রক্ষার দায়িত্ব যে অমৃতের পুত্ররাই বহন করে।

মনে হয়, সারা জীবনে বারবার তিনি ফিরে গিয়েছেন তাঁর সেই দীক্ষাগুরুর কাছে, যিনি নিরন্তর খুঁজে ফিরেছিলেন তাঁর 'মনের মানুষ'-কে। 'শ্যাম-সুখপাখী' সন্ধানী সেই বিশ্ববাউল কবির মর্মবাণীটিও বহুদিন আগে উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টারা উচ্চারণ করেছিলেন : 'আত্মানং বিদ্ধি'—নিজেকে জানো। আর আমরাও তাঁর জীবনচারণা থেকে জানতে পারি, "গৌরীদির প্রিয় একটি বাণী ছিল, পালি ভাষায়—'সে করোহি দীপম্ অওনো।'—নিজেকে দীপের মতো করো।

এইজন্যেই গৌরী আইয়ুব যখন বাহাদুর শা জাফরের কবিগুরু শায়র-উল-মুলুক মির্জা গালিবের জীবনালেখ্য (আবু সয়ীদ আইয়ুব কৃত "গালিবের গজল থেকে" গ্রন্থধৃত গৌরী রচিত 'কবিজীবনী') রচনা করেন তখন সেই বিখ্যাত শায়েরীর স্বপ্নিল সন্তসুলভ আদায়ের 'আড়ালের' "ভয়তাড়িত বিভ্রান্ত এক অসহায় মানুষ"কে খুঁজে পান। সিপাহী বিদ্রোহ, বিদেশী শাসকের কোপদৃষ্টি, অর্থনৈতিক বিড়ম্বনা, ধর্মীয় রক্ষণশীলতার আক্রমণে দ্বিধাদীর্ণ, অস্তিত্বের সংকটে অসহায় এই বুদ্ধিজীবী "ব্যক্তিগত ও দেশজোড়া সর্বনাশের মধ্যে কোনোরকমে নিজের শিল্পী সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করেছেন।" এই কবি প্রাচীন ফারসীতে লিখে আত্মজীবনীকে

লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে চান অথচ গ্রাসাচ্ছাদনের তাড়নায় রাজদরবারে তৈমুর বংশের ইতিহাস রচনা করেন।

যদিও টেনিসনের জীবনীপাঠের পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "কবি কবিতা যেমন করিয়া রচনা করিয়াছেন জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই। তাঁহার জীবন কাব্য নহে।" সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘনঘটায় উৎপীড়িত গালিবের জীবন কখনই কবিতা নয়। গৌরী আইয়ুবের মতো সমাজমনস্ক জীবনীকার যদি কবি ও ব্যক্তি গালিবের জীবনকে এমন একই ছন্দোবন্ধনে পরিবেশন না করতেন তবে জানাই হোত না এই আন্তর্জাতিক রোমাণ্টিক মানবদরদী কবি কিভাবে এমন মরমিয়া অথচ নিস্পৃহ জীবনভঙ্গীটি আয়ত্ত করেছিলেন। দেশজুড়ে যখন ওয়াহাবি ফরাজীর উত্তাপ তখনও নিশ্চল এই কবি সমস্ত রক্ষণশীলতাকে নস্যাৎ করে একটি চিঠিতে লেখেন : "আমি কখনও নামাজ পড়িনি, রোজা রাখিনি, অন্য কোন পুণ্য কর্মও করিনি।" স্বভাবতই গালিবের এই জীবনবোধ গৌরী আইয়ুবের হৃদয়তন্ত্রীতে একই সুরচেতনার ঝংকার তোলে। প্রচলিত ধারণায় গজদন্ত মিনারবাসী গালিবকে পাঠকের কাছে রক্তমাংসের সীমায় এনে উপস্থাপিত করেন তিনি এইভাবে—"এদিকে আত্মসম্মানবোধ টনটনে অথচ ওদিকে গ্রাসাচ্ছাদন আর মদ্যপানের জন্য খাতকদের লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন।" আবার বোধহয় একমাত্র গালিবই স্বচ্ছন্দে নিজেকেই সস্নেহ সান্ত্বনায় বলতে পারেন—"গালিব, বুরা ন মান জো বাইজ বুরা কহে,/ এ্যায়সা-ভী কোঈ হো কি সব আচ্ছা কহেঁ জিসে।" (গালিব কিছু মনে কোর না যদি ধর্মোপদেষ্টা তোমাকে মন্দ বলেন/এমন কি কেউ আছে যাকে সবাই ভালো বলে।) গৌরী আইয়ুব রচিত 'কবিজীবনী' পড়ে তাই একথাই মনে হয়, কবিকে জানার জন্য তাঁর জীবনের পথচলাটুকু জানারও প্রয়োজন আছে।

স্রষ্টার জীবন যে অধিকাংশক্ষেত্রেই তাঁর সৃষ্টির বিপরীত উদ্ভাস তা আর একবার গৌরী আইয়ুবের সৈয়দ মুজতবা আলীর সংক্ষিপ্ত স্মৃতি আলেখ্যটিতে প্রতিষ্ঠা পায়। এই লেখাটি গৌরীর 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি'র পরিপূরক। কেননা মুজতবা আলীর প্রসঙ্গে প্রতিবারই এসেছে আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে গৌরীর পরিচয় পর্বের নানা অনুষঙ্গ। অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী, সহানুভূতি পূর্ণ, সরসভঙ্গী সঞ্জাত এই স্মৃতিচারণটি থেকে জানা যায় মুজতবা আলীর যৌবনের প্রথম পর্বটি—যে সময়ের শিকড়হীন যাযাবর সদৃশ অনিশ্চয়তাপূর্ণ জীবন-প্রেক্ষিত থেকে কি অদ্ভুত বৈপরীত্যে সৃষ্টি হয়েছে 'দেশে-বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র', 'ময়ূরকণ্ঠী'-র মত সরস রম্যরচনাগুলি। প্রথম কাবুলযাত্রার সময়ে মুজতবার বিপর্যস্ত পরিস্থিতির বর্ণনা 'শবনম্', 'শহর-ইয়ার' উপন্যাসের প্রতিবেশকে চেনাতে সাহায্য করে। আবু সয়ীদের সঙ্গে মুজতবার প্রীতিপূর্ণ হালকা আড্ডার আবহটিই 'পঞ্চতন্ত্র,' 'ময়ূরকণ্ঠী'-র লেখাগুলির যথেচ্ছবিহারী নির্ভার ভঙ্গীটি তৈরী করে দিয়েছে। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে পারিবারিক ও কর্মজীবনে নানাভাবে বিব্রত মুজতবাকে নিয়ে অসঙ্গত কৌতূহলের একটি পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, গৌরী আইয়ুব এর এই লেখাটিতে তার যথোপযুক্ত সৌজন্যমণ্ডিত একটি দরদী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ জীবনীভিত্তিক সাহিত্য সমালোচনার পক্ষপাতী নাহলেও আরও আগে ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সম্ভারের সম্পাদনার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন-কবিতা জানা ভাল তবে কবিকে জানা আরও ভাল। স্রষ্টা গৌরীর শিল্পীমনের অন্দরমহলের সঙ্গে সেইরকম পরিচয়ের সুযোগ ঘটে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আমাদের দুজনের কথা' অংশ বিশেষ এবং 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি' (চতুরঙ্গ) লেখাদুটির মধ্যে দিয়ে। এইসব স্মৃতির আলাপনাগুলির মধ্যবিন্দু হল অধ্যাপক আইয়ুবের সঙ্গে গৌরীর পরিচয়ের প্রথম পর্বটি। শিক্ষক হিসেবে পাওয়ার

আগে আবু সয়ীদের মত প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীটি সম্বন্ধে যে গৌরী কিছুই জানতেন না--সেই কুণ্ঠিত লজ্জারুণ স্বীকারোক্তি, প্রথম চিঠিতে অধ্যাপক আইয়ুব গৌরীকে কি লিখেছিলেন এবং গৌরীর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া—এইসব মনে পড়াগুলো গৌরীর সহজ নিরাভরণ অন্তঃকরণকে চিনতে সাহায্য করে। এই লেখাগুলোর আর একটি সম্পদ হল সেই সময়ের শান্তিনিকেতনের আবাসিক জীবনের সরল অনাড়ম্বর জীবনাভ্যাসের বর্ণনা, সেকালে অধ্যাপক-ছাত্রের পারস্পরিক নির্ভরতার স্বর্ণালী ছবিগুলি। শান্তিনিকেতন যে গৌরীর দ্বিজত্ব প্রাপ্তির পীঠস্থান তা নানাভাবে এ লেখা থেকে উঠে আসে। শিক্ষাভবনে ভর্তির সময়ে ফর্মে রিলিজিয়নের জায়গায় যে সদ্যযুবতী ছাত্রীটি কাটাকুটি দিয়ে অফিসকর্মীকে 'জাঁক' করে বলেছিলেন "আমি তো চিরকাল এইরকম লিখে এসেছি।" তিনিই তো পরিণত বয়সে স্বচ্ছন্দে লিখতে পারেন, "নানা বর্ণ, নানা ভাষা, নানা ধর্মকে আত্মস্থ করেই বিবর্তিত হবে যে জাতীয়তার বোধ তাকে তো অনেকান্তবাদী হতেই হবে।"

গালিবের জীবনীচর্চার সাহিত্য-গবেষক হিসেবে গৌরী আইয়ুব হয়তো মোমোন্টে, বেস, মিলিউ-এর সংশ্লেষ রচনার সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু কখনো কবিজীবন সম্পর্কে অকারণ অসৌজন্যমূলক কৌতূহল প্রকাশ করেননি কেননা তাঁর অজানা ছিল না রবীন্দ্রনাথের সেই আক্ষেপোক্তি : "মনে হয় আধুনিক সমাজে কবির আর লুকাইবার স্থান নাই ; কাব্যস্রোতের উৎপত্তি যে শিখরে সে পর্যন্ত রেলগাড়ি চলিতেছে।" একারণেই রবীন্দ্রজীবনের একটি বিশেষ পর্ব সম্বন্ধে গবেষক কেতকীকুশারী ডাইসনের অপার অসঙ্গত অনুসন্ধিৎসাকে মেনে নিতে পারেননি গৌরী আইয়ুব। 'চতুরঙ্গ'তে দু'কিস্তিতে প্রকাশিত "রবীন্দ্রগবেষণার একটি অভিনব ধারা" এবং "রবীন্দ্র-গবেষণার অভিনব ধারার প্রবর্তিকার সমালোচনার জবাবে" লেখাটিতে গৌরী তাঁর আপত্তির কারণ প্রাঞ্জল করেছেন।

"রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে" এবং "In your Blossoming Flower Garden" বই দুটিতে কেতকী যেভাবে রবীন্দ্রনাথ-ওকাম্পো-এলমহার্স্টের ত্রয়ী সম্পর্ককে বুদ্ধিগ্রাহী বিশ্লেষণে উন্মোচিত করেছেন তার জন্য পরিশ্রমী গবেষককে গৌরী আইয়ুব ধন্যবাদ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'নারীভাবনা' সম্বন্ধে কেতকীর আলোচনার উপভোগ্যতাও স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যদিও মনঃসমীক্ষণবাদী সাহিত্য সমালোচকদের 'ব্যবসাদার বিচারক' বলেছিলেন কিন্তু সমালোচক গৌরী আইয়ুব কেতকীর রবীন্দ্রগবেষণার অভিনব আঙ্গিককে 'Psychic kaleidoscope' বলে স্বাগতই জানিয়েছেন। তাঁর প্রধান আপত্তি গবেষণা কর্মটির ওপর ভর করে থাকা 'পরগাছা' উপন্যাসটি সম্পর্কে। গৌরীর মনে হয়েছে, "ওই কাহিনীর স্থান ওখানে হতে পারে না—যৌক্তিক, নান্দনিক কোন বিচারেই। পাঠককে ওই বস্তু গলাধঃকরণ করিয়ে লেখিকা কৃতজ্ঞতাভাজন হন নি।" এ তাঁর কাছে হীরের সঙ্গে কাচকে গছিয়ে দেবার বেসাতিতুল্য। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ আর 'রক্তকরবী' নাটকের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ-ভিকতোরিয়া এলমহার্স্টের পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রসমীক্ষার একটা আগ্রহ পাঠকমনে দেখা দেয় ঠিকই কিন্তু অনুভবী গৌরী আইয়ুবের কাছে তা 'অ-সাহিত্যিক কৌতূহলমাত্র।' এলমহার্স্টের প্রতীকী ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ চিঠির কেতকীকৃত ব্যাখ্যা পড়ে তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি হল : 'আমার সাহিত্যিক অনুভব কোন দিক থেকে যে সমৃদ্ধতর হয়েছে—এমনটা মনে হল না।' ঠিক যেমন একদা ওয়ার্ডস্বার্থের জীবনী (A Coat of Many Colours) পড়ে হতাশ এলিয়ট তাঁর 'The Frontiers of Criticism' রচনায় লিখেছিলেন : "too much information about the origins of the poem may even break my contact with it. I feel no need for

any light upon the Lucy poems beyond the radiance shed by the poems themselves." গৌরী আইয়ুব তার সমালোচনার একজায়গার তাই অশেষ বিরক্তিতে এই গবেষণা সম্বন্ধে লিখছেন ঃ "অবশেষে রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে দৈহিক আকর্ষণের সুনিশ্চিত যে প্রমাণ আবিষ্কার করেছিলেন বুয়েনোস এয়ারিসে গিয়ে ভিকতোরিয়ার কাগজপত্র ঘেঁটে, সেটিই সোৎসাহে পেশ করেছেন।" গৌরী আইয়ুবের আশঙ্কা এখানেই যে, বিদেশী পাঠকের কাছে ইংরেজী বইটির এজাতীয় বিবরণী রবীন্দ্র সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়নে আদৌ সহায়ক হবে না বরং তার পরিপন্থীই হবে। গবেষক কেতকীর কাছে যে আবিষ্কার রবীন্দ্রজীবনী উন্মোচনের 'সোনারকাঠি' মনে হয়েছে, তারই প্রকাশ্য আলোচনায় গৌরী আইয়ুব কুণ্ঠা বোধ করেছেন। কেতকী তাঁর গ্রন্থে ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে অতিরিক্ত সোচ্চার আর সেই প্রেক্ষিতেই গৌরী আইয়ুবের যুক্তি হল. প্রত্যেক মানুষেরই 'ব্যক্তিগত' থাকারও স্বাধীনতা প্রত্যাশিত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথই বা তার ব্যতিক্রম হবেন কি করে! তাই মুম্বই হাসপাতালের রোগশয্যা থেকেই বিচলিত গৌরী আইয়ুব কেতকীকে প্রশ্ন করেছিলেন : "কোনো কোনো পরিস্থিতি আছে যে পরিস্থিতিতে অন্য কেউ আমাদের দেখুক এটা আমরা চাই না...প্রিয়জনের, শ্রদ্ধেয়জনের এই না-চাওয়াটা অনুভব করতে পারা এবং তাকে মান্য করা কি তাঁদের উপর নৈতিক সর্দারি করা?" বিশেষতঃ বিশ্বপ্রাঙ্গণে যিনি আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ধারক, জটিল সন্ধিক্ষণে একমাত্র পথদ্রষ্টা তাঁর নিভৃতজীবনের মূল্যায়ণে তো আরও সাবধানী হতেই হয়।

দীর্ঘদিন ব্রিটিশ উপনিবেশ থাকার দরুন আমাদের চিন্তাজগতের আদানপ্রদানের সংযোগটি নিবিড় হয়েছিল য়ুরোপের নানাদেশের সঙ্গে। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ধারাটাকেও এতাবৎ সজীব করে রেখেছে মূলতঃ ইংরেজী, রাশিয়ান এবং ফরাসী ভাষান্তর। প্রতীচ্যের তুলনায় প্রাচ্যের অন্যান্য ভাষার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অপ্রতুল। সেই অল্পচেনা পথটাই এই বৈচিত্র্য সন্ধানী লেখিকা বেছে নিয়েছেন। যুগপৎ অনুবাদ এবং ভ্রমণসাহিত্যের রসাস্বাদ দিতে গিয়ে গৌরী আইয়ুব নির্বাচন করেছেন তিনশো বছর আগের আধুনিক জাপানী কবিতার জনক মাৎসুও বাশোউ-এর লেখা একটি ভ্রমণকাহিনী "ওকু নো হোসোমিচি" যার প্রায় আক্ষরিক তর্জমা "দূরপ্রদেশের সংকীর্ণ পথ।" ক্যোউকো নিওয়াকে সঙ্গে নিয়ে গৌরী এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থটির স্রষ্টা। রচনাটি নিতান্ত একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত হয়ে থাকেনি। মধ্যযুগের জাপানী সমাজ ও সংস্কৃতিকে চিনে নেবাব মাধ্যম হয়ে উঠেছে। মিস্টিক কবির শান্ত স্নিগ্ধ ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রবৎ হাইকুব গ্রন্থনা অনুবাদটিকে ব্যক্তিগত রম্যরচনার নিভৃত আলাপ-চারিতায় পরিণত করেছে। গৌরী আইয়ুবের লেখা এ গ্রন্থের ভূমিকাটি বাংলা অনুবাদসাহিত্যের শৈলী নির্মাণের দীর্ঘকালীন সমস্যার সমাধানসূত্র এনে দিতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বাশোউ-এর দুটি হাইকুর রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদের স্বাদ ও অনুষঙ্গ নিয়ে সমালোচক গৌরী যথেষ্ট আপত্তি তুলেছেন, এমনকি রবীন্দ্রনাথের ত্রুটি সংশোধনেও দ্বিধাহীন। প্রাচীন এই ভ্রমণবৃত্তান্তের ভাব গাম্ভীর্য ও ধ্রুপদী মাহাত্ম্যকে অবিকল রাখার অভিপ্রায়ে লেখিকা তৎসম-তদ্ভব-প্রাকৃত ও আটপৌরে ক্রিয়াপদের সহাবস্থান ঘটিয়েছেন কত সংস্কারমুক্ত ভাবে তার একটু নিদর্শন উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো গেল না : "অন্ধকারে পথ হাতড়ে হাতড়ে তারা চলেছিল, চৌমাথায় এসে ইতস্তত করেছিল, ভেবে পাচ্ছিল না কোন্ পথে যাবে—পুরানো পথে না নূতন পথে। পথ দেখাবার মতো একজনকে তাদের প্রয়োজন ছিল।. .কে ভেবেছিল যে আমার পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই কাব্যিক তীর্থযাত্রায় এসে আমিও আবার কাব্য রচনা করতে বসে যাব।" অনুবাদকের গদ্যের এই নির্ভার কাব্যময়তা মনে পড়িয়ে দেয় আর এক শেষহীন তীর্থযাত্রার কথা . "অন্ধকারে

তারা চলে।/পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে,/পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।/স্বর্ণপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সংগীতে বলে, 'সাথি, অগ্রসর হও।'/অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, আর বিলম্ব নেই।" গৌরী আইয়ুবের অনুবাদের সংবেদনশীলতা বাঙালী পাঠককে বাশোউ-এর কবিমনের অতন্দ্র বাতিঘরটি চেনাতে সাহায্য করবে।

এইভাবে অনুবাদ-সমালোচনা-স্মৃতিচারণার বহুধা পথে যিনি বারবার সারস্বতদের সাদর অভ্যর্থনা করেছেন, তিনি তো তাদেরই 'ঘরের লোক'। গল্পকার গৌরী আইয়ুব তাই জাপানী কবিদের মতো গদ্যে ছবি আঁকেন। ঘটনা আর চরিত্রের সেইসব নিখুঁত ফ্রেমিং-এ গল্পের বিষয় বেশীরভাগই মেয়েদের মানসিক অথবা সামাজিক সংকট। হয়তো 'দায়' গল্পটির মধ্যে 'নষ্টনীড়ে'র একটুখানি ছায়া, 'প্রত্যর্পিত'-র মধ্যে আশাপূর্ণার 'ছিন্নমস্তা'-র চকিত সাযুজ্য কিংবা 'নীচ' গল্পে মোপাঁসার 'নেকলেস'-এর বিপরীত প্রতিফলন পাঠকমনে উঁকি দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাঁর বেশিরভাগ গল্পই জীবনকে নানা কৌণিক দৃষ্টিতে দেখাও চেনার বহুমাত্রিকতায় বর্ণময় হয়ে উঠেছে। যেমন 'বেজোড়' গল্পটিতে জীবনের পড়ন্তবেলায় দুটি নারীপুরুষের প্রতিকূল সামাজিকতাকে এড়িয়ে পারস্পরিক নির্ভিরতার সে আত্যন্তিকতা—তার আবেদন বড় বেদনাময়। 'বিলম্বিত লয়'তে আবার এই সম্পর্কই অতি ব্যবহারে জীর্ণ। একজনের মৃত্যু তখন অন্যজনকে নির্মমভাবে জানিয়ে দিয়ে যায়—সম্পর্কের মরণ অনেক আগেই হয়েছিল। 'আমি চিনি গো চিনি'-গল্পটিতে অসমবয়সের দাম্পত্যের জটিলতায় আহত হয়েও পুরুষের অক্ষমতাকে কত ঔদার্যে, সহমর্মিতায় নারী আড়াল করে রাখে, এমনকি হয়তো নিজের কাছেও নারীর এই আপনাতে আপনি নিঃশেষিত হবার মহিমা পাঠককে চমৎকৃত করে। শুধু নারীমনের অতলান্তিকতাতেই অবগাহন করেননি লেখিকা, সমাজমনস্ক প্রতিবাদের অনমনীয়তায়, নির্দিষ্ট জীবন দৃষ্টির ঋজুতায় জীবনের দেখা-অদেখা ছোট ছোট সুখ-দুঃখের মুহূর্তগুলি চয়ন করেছেন তাঁর 'তুচ্ছ কিছু সুখ-দুঃখ' নামিত একক গল্প সংকলনটিতে। কিন্তু এই সংকলনের বাইরেও হয়তো থেকে গেছে আরও কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গল্পের মণিমুক্তো। 'কবন্ধ' এমনই একটি গল্প, যেটি 'চতুরঙ্গ' তে ১৯৮৮-র ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অবচেতন মনের অদ্ভুত বিক্রিয়া, স্বপ্ন এবং দিবাস্বপ্ন এসবের মধ্যে এক মধ্যবয়স্কের একাধিক ভাবমূর্তির ভেতরে অস্তিত্বের সংগত এ গল্পের উপজীব্য। গল্পের আরম্ভের অপার্থিব, কিছুটা বিজাতীয় পরিবেশ খানিকটা কল্পবিজ্ঞান ঘেঁষাও।

কিন্তু গল্পের মেরুদণ্ড মনোবিজ্ঞানীর যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ।

অধ্যাপিকা গৌরী আইয়ুব শিশু মনস্তত্বের অনেক গলিখুঁজিরই খোঁজ রাখতেন। 'খেলাঘর' হয়তো ছিল তাঁর তাত্ত্বিক জানার বীক্ষণাগার-আর এসব কিছুই মিলেমিশে উঠে এসেছে 'এই যে অহনা' নভেলেটটিতে। এ গল্প 'আম্মা' আর ছোট্ট নাতনি অহনার। এ লেখায় আম্মা কত গল্পের বিনিসুতোর মালা গেঁথে অহনার অনাবিল কল্পনার পৃথিবীতে পা রাখতে চান কিন্তু রিটায়ার্ড অধ্যাপিকা আম্মার ভুল শুধরে দিয়ে পাকাবুড়ি অহনা মনে করিয়ে দেয়—"একবার মাস্টারি করা শুরু করলে কি আর ছাড়া যায়?" আবার মায়ের কাছে 'সব যে হয়ে গেল কালো/ নিবে গেল দীপের আলো' শুনে ছোট্ট অহনা কেন অনুনয় করে 'এই Hymn টা গেও না।' মাস্টারি করা আম্মার তখন মনে হয়, "সারাদিন কি একটা শিশুর বয়স একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে?" আর সেইজন্যই এ কাহিনী কখনো ছোট্ট অহনার, কখনো তার আম্মার।

হয়তো যেখানেই হাত দিয়েছেন, সেখানেই সোনা ফলিয়েছেন-এমন স্রষ্টা গৌরী আইয়ুব নন। কিন্তু তিনি কঠিন কথাকে সহজ করে বলতে জানতেন। হয়তো লেখিকা গৌরীব পরিচিতির

বেশিটাই জুড়ে আছে তত্ত্বগম্ভীর একজন প্রাবন্ধিক। আসলে প্রাবন্ধিক বলতে এই একটা চেহারাই আমাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু গৌরী ঠিক সেধরণের ধরাছোঁয়ার বাইরের প্রবন্ধ লেখক ছিলেন না। তিনি একেবারেই আমাদের রোজকার জীবন্ত সমস্যাগুলোকে ছুঁতে চাইতেন তাঁর লেখায়। কিন্তু বড় বেশি আড়ালে রাখতেন নিজেকে—তাও যে স্বেচ্ছায় এমন নয়, বোধহয় এ ব্যাপারে তেমন মনোযোগী ছিলেনই না। অপরিচয়ের জন্যেই এ লেখিকার সঙ্গে পাঠকের ভ্রান্তধারণার দূরত্ব তৈরী হয়েছে। ব্যক্তি গৌরীর মতই স্রষ্টা গৌরীও ছিলেন অত্যন্ত খোলামনের স্বচ্ছন্দভঙ্গীর একজন রচনাকার। যিনি সদর্পে সমাজসেবী, প্রতিবাদী সাহিত্য আন্দোলনের সহমর্মী, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরক্ষায় এক বিশ্রামহীন কর্মী হয়েও কখনো কোন বিশেষ মতাদর্শের অন্ধত্বে ভোগেননি। আজ যখন দুই বাংলার ভাষা সাহিত্যের সমস্ত দূরত্ব ঘুচিয়ে অনেকেই তার একটি মাত্র বিভেদহীন চেহারা দিতে বদ্ধপরিকর, এ বঙ্গের বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের উপেক্ষা নিয়ে সোচ্চাব-গৌরী তখন তাঁর নিরপেক্ষ মৌলিকতায় জানান দিতে পারেন যে, "দুই বাঙলার মানুষকেই মেনে নিতে হবে যে ভাষা আর সাহিত্যের মূল কাঠামোয় মিল থাকলেও দুই বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই দুই দেশের ভাষা আর সাহিত্যে একটা লক্ষণীয় পার্থক্যও থাকবে।"—(কাবিননামহ বনাম বসুধারা)। বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের উপেক্ষার অভিমান সম্বন্ধেও লিখতে পারেন : "যে সমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় নেই, যার ভাবনা বেদনায় যথেষ্ট প্রবেশ করেননি লেখক, তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে যাওয়া বিপজ্জনক।" কোনরকম গোঁড়ামির ধার না ধরে গৌরী বলতে পারেন—"রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'পদ্মানদীর মাঝি' লেখা সম্ভব ছিল না, শরৎচন্দ্রের পক্ষেও না।' আবার এই দূরত্ব ঘোচানোর সচেতন প্রয়াসে যখন 'প্রেম নেই' লেখা হয়—তাও গৌরীর কাছে স্বাগত। এভাবেই শুধু ভাবনাচিন্তার গণ্ডীকেই যে মুছে দিয়েছেন তা নয়, তাঁর সৃষ্টির মধ্যেও নিজেকে নানা প্রেক্ষিতে বিকশিত করেছেন। বহুমুখী কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর সৃষ্টির চাকা নিয়ত নতুন পথের সন্ধানী—"যে পারে, সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।" কিন্তু এ ফুলের অনেক পাপড়ি কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, হয়তো কতো হারিয়ে গেছে—সেইসব সুগন্ধের একটুখানি নির্যাস হয়তো আমার এই সামান্য প্রয়াসে ধরা দিয়েছে কিন্তু এখন প্রয়োজন সেইসব ছড়িয়ে থাকা, হারিয়ে যাওয়া রচনাগুলির একত্রীকরণ। যিনি দীপশিখার মত নিজেকে চিব জাজ্বল্য বাখতে চেয়েছিলেন, তাঁর সাহিত্যচর্চার মূল্যায়ন সেই অসামান্য জীবনকেই আরও দীপ্যমান করে তুলতে পারে।

[তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়েব পেশা অধ্যাপনা, নেশা সাহিত্যচর্চা]

গৌরী আইয়ুবের নির্বাচিত

স্মৃতিচারণমূলক রচনা

মহিমময়ী পরমাত্মীয়া

মৃত্যু যে দূরত্ব সৃষ্টি করে তার ফলে একটি মানুষকে সম্পূর্ণভাবে দেখা সহজ হয়। চিরদিনের চেনা মানুষটিই যখন ঢেউয়ের এক ধাক্কায় অনেক দূরে সরে যান তখন যেন একটা বিরাট পটভূমিকার মাঝখানে একেবারে পরিপূর্ণ করে দেখতে পাই তাঁর চেহারাটি। তেমন করেই দেখতে বসে জেঠিমার ব্যক্তিত্বের কত দিকই না চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছে আজ। তবে দুহিতা, জায়া, জননীর নানা ভূমিকার ভিতর দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে প্রকাশটি আমার চোখে ধরা পড়েছে তা এক বুদ্ধিদীপ্ত হৃদয়বতী মহিলার। মহিলাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে সাধারণত কেউ মাথা ঘামায় না। বুদ্ধির প্রকাশের ক্ষেত্রও সেই সব মহিলাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত নয় যাঁরা একান্তই গৃহবদ্ধ। তাছাড়া এমনতর একটা কথা অনেকে মেনেও নিয়েছেন যে সংসারের পরিচালনায় হৃদয়াবেগই যথেষ্ট, বুদ্ধি একটা অবাঞ্ছিত উপসর্গ। পুরুষ বুদ্ধি দিয়ে যতটা বোঝে নারী হৃদয় দিয়েই নাকি তা অনুভব করতে পারে। তাই তীক্ষ্মধী মহিলাদের কেউ কেউ যেন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলেই মনে করেন। কিন্তু সেটা বোধ হয় ঠিক নয়।

বুদ্ধি আর হৃদয়ের সুষম মিলন হয় যে মানুষে তিনি নারীই হন আর পুরুষই হন, তাঁকে শ্রদ্ধা না করে, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাকা যায় না। আমাদের জেঠিমা এই ধরণের মানুষ ছিলেন। তাঁর হৃদয়ের প্রাচুর্যের ভিতর দিয়েও বুদ্ধির দীপ্তি প্রকাশ পেত। যে বুদ্ধি অপরকে আঘাত করতে সুচতুর, যে বুদ্ধি নিজের স্বার্থরক্ষার তৎপর, যার প্রাখর্য্য ভীতির সৃষ্টি করে, এ সে বুদ্ধি নয়। বরং যে বুদ্ধি পরের দুর্বলতাকে সস্নেহে গোপন করতে পারে, যে বুদ্ধি সযত্নে আপনপর সকলকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, যে বুদ্ধি পরের স্বার্থকেই নিজের স্বার্থ বলে আভাসিত করতে যত্নশীল, এই মহিলা সেই বুদ্ধির অধিকারিণী ছিলেন। কত সময়ে তাই লক্ষ্য করেছি যে কারুর জন্য কিছু করে, বা অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করেও এমন ভাব করেছেন যেন বা তিনি নিজেই উপকৃত হলেন, ধন্য হলেন। ফলে সত্যিই যে উপকৃত হল তার মনেও কিন্তু কোনও দীনতার প্রকাশ হল না। হৃদয়ের ঐশ্বর্যকে বুদ্ধি যখন যথাপথে পরিচালিত করে তখনই এমনটা সম্ভব হয়।

জেঠিমার প্রাতিষ্ঠানিক বা অ্যাকাডেমিক শিক্ষাদীক্ষা বেশি দূর নয়। কিন্তু বুদ্ধি ও আগ্রহের প্রাচুর্যে তাঁর জানবার বুঝবার প্রয়াস ছিল অসাধারণ। এ বিষয়ে নিরন্তর সহায় ছিলেন শান্ত, ধীর, সদাপ্রসন্ন অধ্যাপক স্বামীটি। স্বামী-স্ত্রীতে সংসার পরিচালনা ছাড়াও জাগতিক পারমার্থিক অন্য নানা ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করছেন, একসঙ্গে কিছু পড়ছেন, এমনটা আমাদের ছেলেবেলায় খুব বেশি দেখতে পেতাম না। জ্যাঠামশাই জেঠিমা এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম ছিলেন। খবরের কাগজই হোক, বা সাহিত্যই হোক, কিংবা মনোবিজ্ঞান বিষয়ে কোনও প্রবন্ধই হোক, অনেক সময় তাঁরা একসঙ্গে পড়তেন, আলোচনা করতেন ; আবার একই খাতায় কখনও ইনি কখনও বা উনি মনের কথা লিখে রাখতেন। কিশোর বয়সে যখন এসব দেখতাম তখন খুব অনুপ্রাণিত

বোধ করতাম, আজ প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসেও সে কথা স্মরণ করে মন আবেগে সঞ্জীবিত হচ্ছে। একথাও স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে যে আমাদের জ্যাঠামশাই সে জাতীয় পুরুষ ছিলেন না যাঁরা স্ত্রীবুদ্ধিকে সন্দেহ করা বা অবজ্ঞা করাকেই পৌরুষ প্রকাশের মোক্ষম উপায় জ্ঞান করতেন। সস্নেহে সযত্নে স্ত্রীকে সখী সচিব প্রিয়শিষ্যা করে তুলতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁদের দাম্পত্য আকৈশোর আমার আদর্শ হয়ে আছে।

জ্যাঠামশাই যখন পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী, কথাটি পর্যন্ত ভাল করে বলতে পারেন না, তখন দেখেছি কিভাবে দিবারাত্র জেঠিমা তাঁর পরিচর্যা করেছেন। আত্মীয় পরিজন ছাড়াও পরিচারক পরিচারিকার তো অভাব ছিল না, কিন্তু একদিনের জন্যও জেঠিমা তখন বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাননি। রাত্রেও ক্ষণে ক্ষণে উঠে স্বামীর সেবা করেছেন। এত পরিশ্রম অল্প বয়সে যদি বা সহ্য হয়, ওই বয়সে উনি কি করে এত করছেন তা ভেবে আমি বিস্ময় বোধ করতাম। তখন তাঁর বয়স নিশ্চয়ই পঁয়ষট্টি পার হয়ে গেছে। এক সময় দেখলাম শারীরিক দুর্বলতার জন্য ঘাড়টা সোজা করে তুলতে পারছেন না, তারও চিকিৎসা করাতে হল। কিন্তু ওইটুকু ছোটখাটো মানুষের মনের জোর ছিল অপরিসীম। তাই শেষদিন পর্যন্ত স্বামীর সেবা করতে পেরেছেন স্বহস্তে। সহায়িকার হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম নিতে রাজি হননি নিজে। দীর্ঘদিনব্যাপী এই কঠিন কর্তব্যেও ধৈর্য হারাননি।

আত্মীয় পরিজন অতিথিসজ্জন চিরকাল তাঁর সংসার ঘিরে রেখেছেন। স্নেহে সৌজন্যে পরিচর্যায় যে শুধু আকৃষ্ট করেছেন সকলকে তাই নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা চৌম্বকশক্তি ছিল। তা ছাড়াও ছিল একটি পরিশীলিত স্বচ্ছ দৃষ্টি। কখনও কখনও সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি যে তাঁর কনিষ্ঠরাও যে সব সংস্কার থেকে মনকে মুক্ত করতে পারেননি তিনি তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধির গুণে সে সব থেকে আশ্চর্যভাবে মুক্ত করে ফেলেছেন মনকে। পুতুলের মতো ছোট্ট এই মানুষটির গুণগ্রাহীর বৃত্ত কিন্তু ছিল মস্ত বড। একএক জনকে বলতে শুনেছি, "ওঁকে একবারই দেখেছি, কিন্তু কী সুন্দর মানুষ, ভোলা যায় না!" হাওড়ায় গঙ্গার ধারে একটি পরিসর কোয়ার্টারে যখন থাকতেন, প্রায়ই তখন অনেকে তাঁদের কাছে যেতেন সারাদিন কাটাতে। তখন দেখতাম কি অক্লান্ত পরিশ্রমে কত সুখাদ্য তৈরি করতেন মাতা ও জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাঁদের কোনও ক্লান্তি বা বিরক্তি দেখতাম না। আমরা কত সহজেই অতিথিদের সময়জ্ঞানহীনতায় বিবক্ত হই, ক্লান্ত বোধ করি। উনি কখনও করতেন না। আবার রান্নার ব্যাপারে জেঠিমার উদ্ভাবনীশক্তির খুব প্রকাশ হত। গতানুগতিক রান্নাতেই এটা সেটা যোগ করে কেমন অপূর্ব করে ফেলতেন। ইদানীং অবশ্য তাঁর স্বাস্থ্যও তেমন ছিল না, তা ছাড়া সুনিপুণা পুত্রবধূর হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তও ছিলেন। তাই তাঁর সেই চারদিকে সব ছড়িয়ে মাঝখানে মোড়ায় বসে রান্না করার চেহারাটি আর দেখতে পেতাম না। কিন্তু এক মাস আগেও যেদিন বিকালে তাঁর ই সি জি করার কথা হল, সেদিনও সকালে বুকে ব্যথা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্য রেখেছেন যে যাঁরা তাকে দেখতে এসেছেন তাঁদের আপ্যায়নের ত্রুটি ঘটল না তো। যখন তিনি চৈতন্য-অচৈতন্যের দোলায় দুলছেন, কণ্ঠ ক্ষীণ অস্পষ্ট হয়েছে, তখনও একটু সচেতন হলেই খোঁজ নিয়েছেন কে এল, তার যাবার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা আছে কিনা।

বলার কথা এত আছে যে শেষ করা সহজ নয়। একটুখানি ব্যক্তিগত কথা বলে শেষ করব। বছরখানেক আগে একদিন বলছিলেন, "তোমার ছেলেবেলার একদিনের চিৎকার এখনও আমার কানে আসে।" অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলাম কিসের জন্য চিৎকার। বলেছিলেন, আমার ছোট ভাই বিজুর জন্ম হয় গৌহাটিতে ওঁর কাছে। তখন আমার বয়স দেড় বছরও হয়নি। আমাকে

জেঠিমাই দেখাশোনা করতেন, আমি সারাদিন ওঁব পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করতাম। কয়েক মাস পর যেদিন আমরা গৌহাটি থেকে পাটনা ফিরব সেদিন জেঠিমা আমাকে কোলে করে নাকি পাণ্ডু পর্যন্ত এসেছিলেন স্টীমারে তুলে দিতে। স্টীমার ছাড়বার ঠিক আগে আমাকে কোল থেকে নামিয়ে মার কাছে দিতে যেতেই আমি নাকি তীক্ষ্ণ চিৎকারে চতুর্দিক সচকিত করেছিলাম এবং স্টীমার থেকে নামতে নামতে সে চিৎকার শুনে তাঁর চোখে জল এসেছিল। আজ আমাদের জীবনের তরণী চলেছে এগিয়ে, তিনি স্তব্ধ মধ্যরাত্রে কোন্ তীরে একাকী নেমে মিলিয়ে গেছেন কোন্ অন্ধকারে। কিন্তু চির-বিচ্ছেদের দুঃখ আর তো তেমন চিৎকার হয়ে বার হয়ে আসে না ; চোখ শুধু সজল হয় তাঁর অসংখ্য স্মৃতিতে।

পৃথিবীর সব মন্দির মসজিদ গির্জা থেকে নিজেকে আমি নির্বাসিত করেছি অনায়াসে। মাথা নত করবার মতো কোনও দেবতা তো পাই না কোনও দেবালয়ে। বরং আমার পথের ধারেই এসে দাঁড়িয়েছেন কিছু প্রণম্য মানুষ। তাঁদের পায়ে মাথা রেখে আমি শান্তি পাই। আমাদের এই পরমাত্মীয় তাঁদেরই একজন।

[*সৌজন্যে-চতুরঙ্গ*, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৫]

AN ACCOUNT OF A BRIEF FRIENDSHIP

It is strange that I cannot remember exactly the year in which I met Ellen for the first time. My natural sense of history is poor ; nor do I maintain a diary. It was the first time that Ayyub[1] was seeing her after Roy's death in January, 1954. He took me along with him, not yet as his wife. I was curious of course, but was also full of awe verging on terror. But I was making a valiant effort to get used to the shape of things to come if and when I marry Abu Sayeed Ayyub. I had already met quite a few of his friends who were known to be formidable intellectuals and belonged to the elite of the creative world. Of course my endeavour during those meetings used to be to look a little less unintelligent than what I am. But here was a friend of his who was not only an intellectual but also a revolutionary of many years' standing, and a *memsaheb* to boot! So how critically Mrs. Ellen Roy would view this unexpected and rather intriguing adjunct of a chip of a girl, to a good old bachelor friend of theirs, I was not at all sure on that day.

We went to see her, I think, at Ananda Palit Road at Entally. I guess neither the Deys nor the Dattas[2] were in India at that time. However, Mrs. Roy set my initial misgivings at rest with a kind smile and some polite questions, after Ayyub had introduced me to her as his student from Santiniketan. After that of course I was a silent but attentive audience to their conversation, which sometimes became very personal, sometimes global.

Much later when I tried to recollect what happened on that first day and what a poor impression I must have made on her, it occurred to me that since for about two decades she had been in the midst of a politico-

intellectual "movement" in this country, she must have had sufficient experience of meeting young men and women with as meagre an intellcetual endowment as that of myself. All their followers could not possibly have been Amlan Dattas[3] or Sibnarayan Rays or G. D. Parikhs. There fore, she must have acquired the art of cultivating and drawing out to their best whatever capacity those who were not so bright had. However, on that first occasion of our meeting she did not put me off ; rather I returned with a desire to see her again and know her better. But her stay in Calcutta was not long enough to allow us to visit her very many times. Perhaps soon afterwards, she went abroad for some months.

Another thing that impressed me immensely that day was the restrained emotion with which she talked about her husband, his unbearable and prolonged suffering after that awful accident and his last days. Some time earlier in reply to Ayyub's letter of condolence she had written to him how she had felt when she found her husband suddenly vanish into a precipice at Mussoorie while they had gone out for a stroll. She had written : "Suddenly I discovered that all my hopes lay crumbled sixty feet below the street where I was standing". We have lost this precious letter.

It was about four years later, in 1959, that I really came to know, love and adore Ellen when we went for a holiday to Dehradun. The Roys had invited Ayyub many a time before to go to them, but perhaps he needed a nagging wife to goad him to undertake such a 'hazardous' journey!' But by then M. N. Roy was no more and the real attraction for him was gone. And yet because Ellen was so lonely there was all the more reason that Ayyub should accept her invitation now. Besides he himself had been unwell for quite some time with various stomach ailments. So we thought a change of climate would do him good. Ellen insisted that we should go to her to stay there for a few months.

Before jumping into the 'adventure' Ayyub had to be very patiently assured on many counts. Almost every other day either a long typed out letter or a hurriedly scribbled note would come from Dehradun bringing my husband some more explanations, assurances and promises about climate, accommodation, food, servant, physician etc , etc One important point was whether Ellen could rent a place for us not too far from her own place so that we could be under her care, and yet not too near her so that we would not be a constant pain in her neck. Then only we could think of a prolonged holiday. But for the first few days we would have to stay with her till the rented place was made sufficiently habitable for Ayyub! Only when Ellen succeeded in allaying all his major misgivings the railway reservations were made.

With all my eagerness to go to Dehradun I could also feel in me a larking fear ablut meeting the lioness at her den. How would a person of such varied and serious interests whose home must be a busy hive of plans, projects, programmes, etc., be able to accommodate, physically and psychologically, a whole family as exacting as the Ayyubs? In particular, I was not sure whether it would be easy for a childless elderly lady of abstract interests to suffer the constant presence of a little boy pattering around her home, which I expected to be a completely adult world. As for the forced company of a non-intellectual being like myself, I thought I would inflict it on her as little as possible and maintain a discreet and

polite distance. But at times how pleasantly fate disposes of all our gloomy apprehensions! Even today when I go through her letters I wonder that she showered so much affection on me. It appears to be too good to be true.

It was in early September of 1959 and around ten in the morning that one day we approached the charmed world of 13 Mohini Road. Mohini means the enchantress. Ellen's enchanting personality was yet to be revealed to me gradually, but her cottage and its garden won my heart at the very first sight. We were welcomed by a few wide open morning glories on a creeper that encircled the fat trunk of the *sheesham* tree at her doorstep, which watched over the bungalow like a tall sentinel Besides, there was the garden full of flowers. After a heavy shower in the morning the garden was glistening in the limpid sunshine.

In recollection I can once again not only see and hear everything vividly but even smell and feel on my skin the impressions of that first day when we went we went round the bungalow with her immediately after we arrived. The rooms were rather cold, dark and pensive—may be due, partly, to the dark clouds which at times returned to the sky. There were also the large trees which cast their sombre shadow on the entire premise. We could also feel the cold absence of someone who made sense to so many big as well as little things around the place. The books in the library, a particular chair near the fire-place, a walking stick in one corner, the large bed with pillows for two—all these told us that the stage had been set for two, and only one person was now trying to manage the show to the best of her ability. Even this unusually gifted widow, though she had succeeded in building up a life of her own and was trying to carry on the unfinished work of her husband, did not find the full use of her talents without the man who reigned supreme there

Her back verandah, part of which was turned into a greenhouse, displayed a large assortment of roots, bulbs, seeds and seedlings It had a refreshingly earthy aroma. Another part of the verandah was a carpenter's workshop turning out furniture according to her designs from every bit of wood that she could lay her hands on. In fact she had several *sheesham* trees in her garden, one of which had been uprooted by a storm sometime earlier. She showed us some very comfortable chairs which she had got made with that wood. So from the very first hour she did not neatly fit into the personality pattern I was in the habit of associating with a woman whose primary concern was not home-making, or one who never made a home in the conventional sense. However, I soon found out that she did make a home and a much better home at that and on a much bigger scale. Her bungalow constantly hummed with the activity of her gardner, carpenter, cook, etc., she herself now supervising these people, now working on her typewriter, or perhaps talking to the innumerable visitors.

On the very first day the lunch time brought a most interesting experience for our son Pushan. Her kitchen and dining room along with a narrow threshold belonged to another little cottage which was separated from the main bungalow by a strip of garden. In the dining room the table was beautifully laid for four persons. But we also noticed that more than half a dozen aluminium plates were laid out on that narrow threshold. Ellen took a gong and beat it lustily for about half a minute with a mysterious smile on her face. We were amazed since we were supposed to be the only guests and we were already in the dining room. But in no

time we found out for whom she was announcing the lunch, when we saw cats of all sizes and colours trooping in from all directions and lining up neatly in front of those plates like a disciplined band of school children. Then their pottage was served by Ellen and her cook. Pushan and his father, cat lovers as they are, watched with much amusement the eating and cleaning operations of a whole feline tribe. I maintained a safe distance. This was Ellen's only interest about which I was not particularly enthusiastic.

The lunch for Ayyub was specially cooked according to directions sent earlier! When he commented with satisfaction that the mince-meat curry was exactly as they used to have as children, Ellen was very pleased indeed. She said it was the highest compliment beceause nothing ever was exactly as good as mother made it. Pushan, however, found her apple sauce with cream more to his taste and remarked in Bengali : "Bhalo, tak tak kintu" (good, but slightly sour). The 'but' here does not have the usual sense because he was not at all averse to the 'sourness' of any edible object. Ellen was greatly amused by his remark and often she would offer something to him and ask : "Pushan, will you please taste this and see whether this one too is balo, tak tak kintu?" She would pronounce the Bengali 'bh' and 't' softly like Pushan.

After lunch we sat on the verandah overlooking the front garden. Ellen explained with some pride how she planned her blooms so that never throughout the year her garden would remain completely bare of any flowers even for a week. She promised us that soon in winter we might expect to have a real feast for our eyes. The chrysanthemums would come first and then the narcissus and daffodils. These would be followed by the snowdrops, iris, amaryllis, hyacinth and a host of others which we don't see in Calcutta. We did not disclose to her immediately that we were not brave enough to face the Dehradun winter.

I had noticed earlier a wicker tray heaped with tiny 'shiuli' flowers (called 'harsingar' in Hindi) on a table on the verandah. Ellen said the Roy used to be filled with childhood reminiscences when the 'shiulis' were in bloom every year. In the morning the tall man would sit precariously perching himself on his heels and stoop to pick the flowers carefully from the ground underneath the 'shiuli' bush. He had told her that those flowers heralded the greatest festival of Bengal—the Durga Puja While we three were talking away, Pushan went on collecting pink and yellow pebbles from her garden path. He had already several piles of them in one corner of the verandah and now he was planning to sit down there to construct something with the building material gathered so painstakingly. Ellen got up in the middle of a sentence and went in. Then she returned with a cut piece of an old carpet and spread it near Pushan. "It is to protect his little buttocks." she said, "the floor is rather damp, he might catch a cold." So this was the childless elderly woman of abstract interests! Ayyub, of course, went on talking about the future of the communist movement in India in the context of the Khruschev revelations in the 20th Congress, unconcerned with what happened to whose buttocks. After about another half an hour Ellen suddenly jumped up in excitement. "Do you hear the river?" she asked.

We were amazed since we did not know what river to hear.

"The river is in spate. Come, come, you must see it."

Ayyub was too exhausted after two days' journey to undertake any sfurther adventure. So Ellen and I ran down Mohini Road which ended at the bank of 'Rishpana'. Yes, Rishpana was in spate. The morning rains had swelled the mountain stream and what a roaring noise it made tumbling over the loose rocks and carrying them along with her. I have lived on the bank of a large river ever since I was born. But the Ganges on the plains has a matronly fullness of form and serenity of spirit. And even during the monsoon one does not hear much noise above a ripple. This Rishpana on the other hand is normally a dry bed of rocks over which several thin lines of water trickle down most of the days. Men and mules walk over her bed and maintain regular contact between the two banks. But after a heavy shower or two Rishpana is a different thing altogether. Then it runs like a fierce mad horse and is capable of carrying away anyone who would dare as much as dip a foot in the stream. I could not imagine that there was such a spot of uncommon natural beauty so near a city. Ellen was very fond of this tempestuous stream and perhaps felt some affinity of character with it.

While returning home from there she showed me on the left hand the first house on the bank of Rishpana. The large mansion stood on an extensive garden and it belonged to the Maharaja of Dumraon. The Maharaja's 'palace' was flanked by a two-storeyed outhouse, the top floor of which used to be the quarter that housed the manager of the estate in good old days. But at that time neither the Maharaja nor the manager was in occupation of his rightful place in those premises. The 'chowkidar' and the 'mali' were all in all. So Ellen had managed through them to rent out the manager's quarter for us to stay for some months.

Our immediate neighbour was the famous D. P., or Dhurjati Prasad Mukherji,[4] who at that time was living a quiet retired life after a not so successful treatment of a malignant tumour in the throat. Dhurjati Prasad, sitting on a wicker chair in his garden, with the Shivalik range as his backdrop at a distance, used to rouse some deep emotions in me. There sat the man who was once a legend for his brilliant conversations, now silently hanging his head on his bosom, so exhausted that he could not even hold his head straight for long. The vivacious man of yesterday now made a picture of despondence in the midst of nature's beauty, once again underlining the absurdity of our existence.

Though Ellen would not let us go immediately to the flat she had rented for us, she had already furnished the place tastefully and comfortably with her own furniture and draperies. We later discovered with what care and affection she had made all the arrangements to make us happy in our temporary dwelling. What particularly elicited unreserved praise from my husband were the chairs she had designed. They had just the correct angle of recline—you neither had to sit up with a straight back as if on an ordeal chair, nor lie down helplessly at an angle of 145^0. Often sitting in one of Ellen's chairs on the open terrace of our flat Ayyub would go into ecstasies over the grandeur of the Mussoorie Hills under the canopy of clouds and then the next moment would remark on the uncommon comfortablility of the chair.

Ellen was devoted to her garden. In the mornings she would take me round the backyard orchard and introduce all her favourite trees to me. She would often tell me how those who appreciated the good things of life

admired the delicious mangoes of her garden. In her orchard among many other new plants I saw for the first time grape fruits which, we were told, a self-respecting Englishman must have as the first thing in the morning for his breakfast. One day David McCutchion,[5] who visited us at Dehradun, demonstrated for our benefit how a grape fruit is eaten after cutting it into two hemispheres and then sprinking a little sugar on the pulp! Ellen's dwarf orange plant in a large wooden tub was a real curiosity piece. Every year this Lilliputian tree would yield about fifty oranges of a size smaller than a lemon. And she would make her own home-brewed liquor from these oranges.

On the very first evening, after dinner, she offered us this precious liquor with all the accompanying ceremony. But what wastage! She brought out a narrow and oblong wooden box with a sliding lid, placed it on the low centre table and opened the lid with appropriate artistic 'mudras' of the two hands. The inside revealed six little Japanese cups of white porcelain. On each of the cups was painted a fat-bellied wise man of Nippon. She asked us to choose our wise men to drink with. Then she chose her own cup and poured a little of her selfmade golden potion into each little cup. It looked beautiful and smelt inviting. But Ayyub appeared to be quite nervous and started saying feebly that the only injunction of the Shariat that he observed was abstention from drinking. And also that his stomach could not digest pork. To that extent he was a devout Moslem! Ellen assured him that, correctly speaking, it was not an intoxicant at all I sipped a little and found it pleasantly sweet. It did not make any difference in me. But my husband started complaining of stomach ache as soon as he had cautiously touched the cup with his lips. He said that his head was reeling. He did not lift the cup for the second time, Ellen was aghast and admonished him : "Don't be silly, Ayyub, this can't do any harm even to a baby." But she had yet to know what a baby she had taken into her hands.

Ellen's mornings were equally distributed between her spacious garden and her portable typewriter. She was quite a fast typist though she used only four fingers. Early in the morning she would spread out all her papers and correspondence around her typewriter on a large table on the verandah overlooking the lawn. On another table would stand a cup and a coffee pot under a tea-cosy. She did not eat a proper breakfast. She would go on typing since early morning and would pour endless cups of coffee for herself. But once in every twenty minutes or so she would jump up to give some instruction to the gardener, or to dig out something with her own hands, or to inspect the preparation of a new plot in some distant and hidden corner of the garden, or parhaps just to stand quietly for a few minutes to admire the gladioli of many colours which she grew around what she called her "little Taj Mahal"—the bower under which lay buried the ashes from her husband's pyre. Though she laughed at herself about this bit of sentimentality in her, there was no denying the fact that this particular corner of her front garden was sacred to this pronounced materialist and she tended it with special care. Every evening the first light she would put on was a naked bulb hanging from that bower and it would be burning there all through the night watching over her husband's *samadhi*.

One afternoon there was a heavy hailstorm. Ellen was particularly

upset that all her gradioli of an uncommon purple colour would be ruined. We sat on the covered verandah watching helplessly. But she, ignoring all our entreaties to the contrary, would dash out with a large pair of garden scissors in her hand and cut a few stalks of flowers and rush back. After several such sorties she rescued all the flowers, and miraculously enough did not get hurt herself by the hailstorm. Later in the evening she arranged the gladioli in a vase, and when the storm was over, she put the vase under the bower. A very proper tribute to the memory of a stormy man!

Ellen was really proud of her collection of Cactii, specially the Hawaiian Cactus which flowered once a year or perhaps once in several years[6] She told me how these Cactus buds would start unfurling their petals in the evening, and by the time they were fully open it would be midnight, and that such occasions were celebrated as great events at 13 Mohini Road She would ring up all her friends to come with their cameras and watch the flower open. To make a night-long vigil both physically and spiritually satisfying, Ellen would throw a party with the help of her cook, Alimuddin whom she described as "that biblical figure" I saw half a dozen enlarged photographs in her bedroom of this folwer at different stages of opening.

Ellen belonged to that, now almost extinct, generation of European housewives whose pantries choked with home-preserved fruits, jams, jellies, juices, squashes, pickles, sauces, chutneys as well as home-baked pies, biscuits, cakes and what not She would make rows and rows of mango squash or limejuice or mango pickles to be consumed during the annual study camp of the Radical Humanists. Fortunately for their followers, neither Roy nor his better half believed in starving the body for uplifting the spirit! She could work wonders with her primitive-looking kerosene stove and oven. While hurriedly typing out perhaps an article or and editorial for the *Radical Humanist*, which at that time used to be jointly edited by her and Sibnarayan Ray and published from Calcutta, she would rush into her kitchen to give her hand to rolling hamburgers with minced venison or to beating cottage cheese with chopped mint for the salad. The dinners were sumptous From the soup to the dessert she would plan carefully and execute meticulously with her own hands. She would make her own mayonnaise dressing for the salad. I thougt it quite a job when she asked me to drip salad oil from a bottle held a little above a bowl in which she went on beating briskly the yolk of an egg with a fork. All her aperitifs were home-made. She showed me how to preserve in vinegar or oil little onions, radishes, cucumbers—practically everything that she grew in the various parts of her kitchen garden. She wanted me to help her while stuffing capsicum or making salad with tomatoes, hard-boiled eggs and beaten cottage cheese. I found the smell of her kitchen very pleasing.

In the afternoons sometimes we used to go to the city for shopping in Ellen's ancient car driven by a really ancient and devoted driver. At one of those shops she found for Pushan a tiny little tumbler of a whitish alloy. We browsed around the shops talking animatedly about pots and pans, baskets and buckets, spoons and sieves which make domestic chores such a pleasure! She insisted on my buying two sets of Chunar bowls. There were about six bowls of graded sizes in each set. The biggest bowl would hold within it the next smaller size and in this way the smallest would

be in the centre. It was a good idea since I wanted to bring back to Calcutta in my not so commodious kitchen box all these newly acquired treasures!

The feminine in Ellen showed itself more fully when we went to buy some warm material to protect ourselves against the Dehradun October which turned out to be cooler than what we had expected. Though she would wear rather drab looking slacks in the mornings, she liked to dress elegant in the evenings. Of course compared to her friend Mrs. Uttam Singh, she considered herself quite dowdy. But she did take interest in clothes and had drawers full of "jewellery", not of course of gold and pearls as we Indian women have. She had a wonderful collection of costume jewellery made of wood and shell, steel and inexpensive but uncommon stones.

One day Ellen took us to a big cloth merchant in the heart of the city to select some cotswool. Leaving us to search for the material that would suit our purse as well as the weather, Ellen ordered another shop assistant to show her some dress material. Bales of dress material of different colours and textures were piled up before her. Then standing in front of a full-size mirror she would throw on her, one after another, dress material of various designs and colours, not able to make up her mind, like a little girl, as to which colour she liked most and would also suit her most. At long last she chose a steel-blue piece with white polka dots Nodoubt it would suit her beautifully. We requested her to allow us to pay for this dress material because that would spare us the trouble of choosing a gift for her! She was embarrassed but agreed after a while. Later we went to another shop to buy a shawl for Ayyub. This time Ellen helped him to make up his mind quickly, saying, "That mouse colour would suit you best". I too liked the colour she pointed out, but did not think that it should be described as "mouse colour".

Ellen wanted that we should spend the evenings at her home and return to our place after dinner. Thus we had long hours together and Ellen had a rich fund of experience to keep us thoroughly engrossed. One day she talked about the Indians she had met before coming to India. Once she even had a chance to work as an interperter for Rabindranath when he visited Germany. On the occasion she also met for the first time Soumyendranath Tagore.[7] She imitated how Soumyendranath rather pompously and in a poetic language described his activities in Europe when the poet wanted to know from him what he was doing those days But I was a little surprised to hear that these two Bengalis, and such close relations as they were, talked to each other in English. Was it for the benefit of the German girl who was interpreting for Rabindranath? Ellen talked about Soumyendranath more as a person than as a politician. Soumyendranath has registered, in writing, his hearty dislike for M. N. Roy, but I don't know whether Roy has shown any awareness of the existence of the other illustrious son of Bengal.

That day and on several other occasions also it seemed to me that neither Ellen and (by inference) nor Roy himself had much enthusiasm for Bengali culture They definitely did not have a very high opinion of Tagore or his Santiniketan. What surprised me really was that though they were so close to some important literary people of Bengal, they seemed to be quite indifferent to Bengali literature. Was it because they were wholly political persons themselves? I still remember with amuse-

ment that Ellen did not approve of "Sib wasting himself among inbred Bengali literary adda". It rings very similar to what my own Gandhian father used to say. Ellen had a vision, it seems, of Sib's career as a political thinker only.

One night while we were taking leave after dinner Ellen gave me two or three foolscap size exercise books and asked me to read through them. She whispered to me that those were meant for me only. I was really surprised when I started reading them. Those were closely scribbled pages of effusive experession of her grief. She wailed over her lonely life in such uninhibited language that it was diffcult to imagine that those were written during the long and lonely sleepless nights by the same woman who succeeded in keeping herself so pleasantly and thoroughly occupied all day. She had useful work and faithful friends during the daytime. But at night she had nothing more than the company of the sleeping suit of her husband, which she would religiously take out every evening and lay on the bed as if some one would change into them after dinner. In her work-a-day life she could blend rationality and sentimentality wonderfully.

In so far as her published writings were concerned I was familiar with a cool, and at times, caustic rational thinker. But here was I granted an unexpected privilege of peeping into the very personal and extremely lonely life of a very strong woman I shuddered and I felt embarrassed at the strength and frankness of her emotions. At that time I was not mature enough to be able to tell her adequately my reactions, either to her satisfaction, or to mine. Today when I think of her own grief I also remember what she wrote to me after Sudhindra Nath's death : "I hope Rajeshwari will bear up without disintegration She had so bravely built up herself and her life with Sudhin. It will be difficult to make her feel that it does not lose all sense without Sudhin. I know." Yes, both these women tried their best not to disintegrate, yet it was not easy to get over that sense of emptiness. As for myself, I wish I had an access to these manuscripts once again. I would now read through the whole thing with greater love and a mature heart.

On another occasion Ellen talked about Nehru. Roy's ambivalence towards Jawaharlal was well known. He had expressed publicly his bewilderment at the length to which Nehru would go to accommodate Gandhi's eccentricity and obscurantism. Yet he could not help admitting that Nehru had a modern outlook and rational mind so rare in the Indian political scene. He, it seems, could not forgive Nehru's flexibility, and at heart accused him of surrendering principles for immediate political success. Yet his outstanding qualities as a man and a leader could not possibly have gone unnoticed by Roy. Even in his personal relationship this ambivalence was quite obvious. During his last days when he was bedridden, Nehru had been to see him more than once. Ellen admitted that these were trying occasions for her. Roy would be in fits of temper as soon as he was told that Jawaharlal wanted to come to see him. Sometimes he would petulantly declare : "Who wants him here? Why does he want to come to see me? I don't want to see him!" But all his resistance would melt as soom as Jawaharlal entered the bedroom and stretched his hand with a winsome smile, and Ellen would sigh in relief. Nehru surely had belied Roy's expectations as a leader of India's destiny, but he did not

fail in expressing his own admiration for Roy's intellect, moral integrity and physical courage. Thanks to Ellen's histrionic talents we could almost see the two men meeting each other in her bedroom.

Inspite of Ellen's warmth and care Dehradun was becoming too cold for us and my husband did not want to stay on any longer. But Ellen would not hear of it. How could we go away, she asked, before the 20th November which was celebrated in a big way as the day on which Roy was released from the Indian prison. We were uncomfortable because we did not have sufficient warm clothes. Ellen, therefore, piled on us all the blankets, cardigans, socks, coats and scarves that she could spare. She sent Roy's woollens for Ayyub which were several sizes too big for him. Ultimately the tug of war between her and Ayyub became so tense that one morning after breakfast we had to go to get out train reservations. Ellen went with us ostensibly to exert her influence in getting reservations for an early date But like a naughty schoolgirl she refused to do anything because it was being done against her wishes. She had told us earlier that she could get reserveations made for us any time we wanted. But now at the reservation counter she announced that she could not find the man whom she knew and who always eagerly obliged her. This unnerved Ayyub and he could not view with equanimity, as I did, the prospect of freezing in Dehradun for another fortnight or three weeks. I had a hard time pacifying a furious husband on the one hand and an *abhimanini* friend on the other She was hurt that we did not listen to her request. But finally peace returned after the reservations had been made, though not for a conveniently near enough date according to my husband.

Though politically D P and Ellen belonged to two poles they were good neighbours, and Dhurjati Prasad sometimes came smartly dressed to join the afternoon tea at Ellen's. But he would neither eat not drink anything because both were painful exercise for him in those days. Still he enjoyed talking and listening to conversations—not of course for a long time at a stretch. One day Dhurjati Prasad took Ayyub to Rathindra Nath Tagore[8] who had then exiled himself to Rajpura in the outskirts of Dehradun. I did not want to go with them. But I did meet Rathida at Ellen's place one afternoon when he came to tea at her invitation. The person who was held in awe in Santiniketan had since then shrunk in stature to me. The botanist that he was, he went round Ellen's garden appreciating many of her collections. Ellen showed him some rare varieties of hibiscus that day.

The newly built annexe to the left of her cottage housed the Renaissance Institute Library and the guest room which were specially meant for visiting scholars. Ellen invited Ayyub to use his library and I was allowed to help her in dusting and rearranging the books. Often she would send me a note asking me to come after lunch to give a hand in re-organising the library. That gave me a chance to be with Ellen longer and talk about things which may not interest my husband. Naturally our work did not progress very fast, but we were not very sorry for that. One day she gave me a copy of the *Duino Elegies* to read, a copy of which Buddhadeva Bose[9] sent us later as a gift from the United States. So Rilke always reminds me of both these friends It was in her library again that I came across a copy of the famous legend of Tristan and Isolde about which I knew nothing till then Though apparently there is nothing in the

legend which resembles Ellen's own life, yet somehow this story as associated with her and 13 Mohini Road makes the tragedy of all loves more complete in my mind. Or, why should I not use the word 'life insted of 'love' in the above sentence? The "golden sorrow" that life is never ceases to intrigue us, however. As a rationalist Ellen took pride that the number of her house was "thirteen" But I did not like the terrible coincidence of her murderers choosing the 13th of December as the day for committing that heinous crime. All unfavourable coincidences have an insidious way of gnawing at the root of our rational judgments.

As our day for departure from Dehradun approached Ellen kept telling us that this first visit of ours was only exploratory, and not that we know ourselves how beautiful and convenient a place Dehradun was we should come here every year. I am sure this was not something which she only told us but all her friends must have received equally warm treatment from her. But from our side we can say without hesitation that such eagerness to have us with her and such almost irrational refusal to part with us, we have not come across again.

Ellen came to see us off at the station ; she saw to it that everything that Ayyub needed was there. She gave us a copy of Roy's *Letters from Prison* to read on the train Then we sat in the coupe together for some time and told each other that we were going to meet soon again, either at Calcutta or at Dehradun. The woman who had an endless fund of conversation was very silent on that day After a while she got up, shook hand with Ayyub, kissed Pushan and hugged me We kissed each other and then she hurriedly got down, but not because the train had started by then. She did not turn back, nor did she wave her hand at us. She had a dark long coat on her and she walked fast into the drakness of the evening. That was the last time I ever saw her.

If I even wanted to be like another woman it was Ellen, and if that were really possible no one would have been happier than my husband

1 Abu Sayeed Ayyub, distinguished philosopher and literary critic, author of several books on Tagore Gauri, his wife, is an educationist and social worker

2 Sushil and Indira Dey , Sudhin and Rajeswari Datta.

3 Amlan Datta, educationist, economist and author of many books , close associate of the Roys and the radical humanists since 1946

4 D. P Mukherji, novelist, essayist, social scientist and musicologist

5 David McCutchion (1930-1972) taught English at Santinketan (1957-60) and later comparative literature at Jadavpur University (1960-72) , author of several books including monographs on the terracotta temples of Bengal

6. This was grown from a tiny cutting which had been mailed to her in an envelope by Mrs Watumall from Hawaii

7 Rabindranath's nephew He in the Soviet Union for some time, and subsequently founded at Calcutta his own political party, the R C.P I musician and author, he published several books including his autobiography in Bengali, *Yatri*

8 Rabindranath's son.

9 Buddhadeva Bose (1908-1974), poet, novelist, playwright and critic; author of more than a hundred books in Bengali , translated Hoelderlin, Baudelaire and Rilke into Bengali

[স্মৃতিচারণাটি শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত এলেন রায় স্মারক গ্রন্থ (1979)
The World Her Village থেকে গৃহীত]

দিনের শেষে শান্তিনিকেতনে

শতাব্দীর মধ্যাহ্নে, ১৯৫০-এর ঠিক মাঝামাঝি আমার একটা জন্মান্তর ঘটে। তখন আমার বয়স উনিশ। তার আগে কেটেছে জন্মস্থান পাটনায়। সেখান থেকে উৎখাত হয়ে আর কোথাও ছিটকে পড়ব তা কখনও ভাবিনি। শেষ ছ'টা মাস উদ্বেগে অশান্তিতে অনিশ্চয়তায় দীর্ণ ছিলাম। তারপর একদিন বিকেলে আমার ছোটভাই বিজুকে সঙ্গী করে বোলপুরের ট্রেন ধরলাম।

পরদিন ভোরে বোলপুর পৌঁছে ডাকবাংলোর মাঠের প্রান্তে একটি গৃহে আতিথ্য লাভ করলাম। তখনই মনে হল এ এক নতুন পৃথিবী। তখনও ডাকবাংলোর মাঠের এক প্রান্তে অল্প একটু শালবন ছিল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে সেই বাড়ির কন্যা আমার বান্ধবী আর পাঠভবনের প্রাক্তনী, গীতা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে তার সাইকেলে চলল। দেখে চমৎকৃত হলাম। একটা রিকশায় আমি আর বিজু পিছন পিছন শান্তিনিকেতন পৌঁছলাম। দিনের শেষ বেলায় শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমার সমস্ত মনপ্রাণ অভিভূত করেছিল।

শ্রীপল্লীতে লালবাঁধের ধারে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের গৃহ ছিল আমার প্রথম গন্তব্য। হাতে ছিল আমাব পিতার একটি চিঠি। তাঁর সঙ্গে আমাদের একটু আত্মীয়তাও ছিল, পরে তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় অধ্যাপক হয়েছিলেন। যেমন সুন্দর লেগেছিল শান্তিনিকেতন, তেমনই সুন্দর ছিল এই ছান্দসিক অধ্যাপকের সংসারটি। সেদিন দেখা তাঁর সুন্দরী হাস্যমুখী গৃহিণীটির সেই ছবি আজও অমলিন হয়ে আছে পরবর্তী বহু করুণ স্মৃতিকে ছাপিয়ে।

ঠিক হল পরদিন সকালেই আমি শিক্ষাভবনে এসে ভর্তি হব। অধ্যাপকের অন্যতমা ছাত্রী আরতি সেনকে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করার দায়িত্ব দেওয়া হল। তখন গীতার সঙ্গে বোলপুরে তাদের বাড়িতে ফিরে এলাম।

সেদিন রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। পরদিন সকালে যখন শান্তিনিকেতনে রাঙা মাটির পথে নগ্ন পা রাখলাম, তখন এক এক জায়গায় রক্তচন্দনের মতো নরম কাদা ছিল। আগের দিন লক্ষ্য করেছিলাম প্রায় সবাই শুধু পায়ে হাঁটা-চলা করছে। শালবীথি ধরে পথের পূর্ব প্রান্তে দ্বারিক বাড়িতে পৌঁছলাম। সেখানে তখন শিক্ষাভবনের আপিস ছিল। সেই প্রাচীন সুন্দর বাড়িটিকে শান্তিনিকেতনের মানচিত্র থেকে লুপ্ত কবা হয়েছে। তখন শিক্ষাভবনের আপিস সামলাচ্ছিলেন একটি মাত্র ব্যক্তি। ভুজঙ্গদা চট কবে ভর্তি হবার ফর্ম বার করে দিলেন। তাতে নাম-ধাম সব লিখে রিলিজিয়নের জায়গায় একটা কাটাকুটি দিয়ে রাখলাম। ভুজঙ্গদা এতক্ষণ হাসিমুখেই কথা বলছিলেন। এ বার একটু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এ আবার কী হল?'

আমি সামান্য জাঁক করেই বললাম, 'আমি তো চিরকাল এইরকম লিখে এসেছি। ম্যাট্রিক পরীক্ষাব ফর্মেও রিলিজিয়ন কিছু লিখিনি তো।'

উনি আর কথা বাড়ালেন না। মৃদুস্বরে শুধু স্বগত মন্তব্য করলেন, 'এখনকার ছেলেমেয়েদের যত্ত সব...।'

সেখানেই শ্রীভবনেও ভর্তি হবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। আবার শালবীথি ধরে আরতিদির পায়ে পায়ে এসে শ্রীভবনে পৌঁছলাম।

দোতলায় ছ'জনের একটি ঘরে আমার জন্য একটি শয্যা নির্দিষ্ট হল। ওই ঘরের সামনে

চওড়া ঢাকা বারান্দাটির অনেকখানি বোগনভেলিয়ার লতায় আড়াল করা ছিল। ওই বারান্দায় মাত্র ছ'মাস হস্টেল বাসের কত সুখের স্মৃতি, কত মধুর বেদনার কথা, সখীদের সঙ্গে কত বিশ্রম্ভালাপ মনে পড়ছে। অতি সহজেই শান্তিনিকেতনে প্রবেশাধিকার পেলাম। আমার মন তো আগেভাগেই সবটুকু দখল করে বসল। সেদিন শান্তিনিকেতন আমার জীবনে কী মহা সমারোহে প্রবেশ করেছিল, তার সবটুকু বলার সাধ্য আমার নেই। সেদিনই যেন আমার সবখানি সত্তা জুড়ে এক মহোৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর,
পুণ্য হল অঙ্গ মম ধন্য হল অন্তর।
... ...তোমার মাঝে এমনি
করে নবীন করি লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর,
সুন্দর হে সুন্দর।

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে আমাদের ক্লাস শুরু হল। জেনারেল কিচেনে প্রাতরাশ শেষ করে দ্রুত পায়ে লাইব্রেরির সামনে এসে দাঁড়াতাম আমরা। বৈতালিক শুরু হত। প্রত্যেকটি ভবন পালা করে গানেব দায়িত্ব নিত।

পিতানোঽসি, পিতানোবোধি. সমস্বরে উচ্চারণ করার পরে গান গেয়ে বৈতালিক শেষ হত। যে যার ক্লাসের দিকে চলে যেতাম। তখনও বেশির ভাগ ক্লাস, তা স্কুলের হোক বা কলেজের, গাছতলাতেই হত। আম্রকুঞ্জ এবং গৌর প্রাঙ্গণের অধিকাংশ গাছতলা ছিল পাঠভবনের দখলে। গুটিকয়েক শিক্ষাভবনের ভাগেও পড়ত। অবশ্য শিক্ষাভবনের বিজ্ঞান ক্লাসের জন্য তখনই প্রশস্ত কক্ষ তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল।

আমরা, ফিলসফি অনার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীবা লাইব্রেরির পাশেই একটা বকুলগাছের তলা পেয়ে গেলাম। সাইকোলজি, মেটাফিজিক্স ক্লাসগুলি হত পূর্বাহ্নে। অপরাহ্নে অধ্যাপক ডঃ বেঙ্কটরামন ভারতীয় দর্শনের ক্লাস নিতেন। প্রবাসজীবনদা পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পড়াতেন, সেও অপরাহ্নেই। এথিক্স ক্লাস শুরু হতে ক'দিন দেরি হয়েছিল মনে আছে। তবে দিন কয়েকের মধ্যেই জানা গেল আবু সয়ীদ আইয়ুব নামে একজন নতুন অধ্যাপক আমাদের এথিক্স ক্লাস নেবেন। পূর্বাহ্নেই।

প্রথম যেদিন এথিক্স ক্লাস হয়, সেদিন বৈতালিক ভাঙবার পরে অধ্যাপকদের মধ্যে থেকে একজন নতুন ব্যক্তিকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সতীর্থ পূরবী দত্ত। আমাদের ইংরেজির অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্তর কন্যা। সেদিন বৃষ্টি পড়ে চারদিকটা ভেজা ভেজা ছিল। তাই গাছতলায় না বসে পূরবী তার অসাধারণ ছন্দে পা ফেলে এগিয়ে চলল দ্বারিক ভবনের দিকে। তাকে অনুসরণ করে ধুতি পাঞ্জাবি ও কালো জবাহের জ্যাকেট পরিহিত যে-মানুষটি ছাতায় ভর করে মৃদু গতিতে সাবধানে যাচ্ছিলেন, তাঁকে দেখে অবাক হয়ে ভেবেছিলাম, এই কি আবু সয়ীদ আইয়ুব।

আমি তখনও পর্যন্ত কোনও মুসলমানকে ধুতি পরতে দেখিনি। আমি ধরেই নিয়েছিলাম শেরওয়ানি পাজামা ফেজ পরিহিত একটি অধ্যাপককে দেখতে পাব। এবং মুখে যাঁর সুগন্ধি পান।

সেদিন দ্বারিকের দোতলায় অধিকাংশ জায়গা দখল করে নিয়েছিলেন অন্য কয়েকজন অধ্যাপক। আমরাও একতলার এক পাশে একটু জায়গা পেলাম। সবাই যে যার আসন পেতে বসতে গিয়ে দেখা গেল অধ্যাপকের হাতে কোনও আসন নেই। তিনি বিব্রত মুখে এদিক ওদিক

তাকাচ্ছেন। তাঁকে আমার আসনটি দিয়ে আমি মাধবীর আসনের এক অংশে স্থান পেলাম। উনি আসনটি পেতে সসঙ্কোচে বসলেন একপাশে দুটি পা মুড়ে। ওই ভঙ্গিতে পুরুষেরা সাধারণত বসেন না। অবশ্য গান্ধীজির একটি বিখ্যাত ছবিতে দেখা যেত যে তিনি ওই ভঙ্গিতে পা মুড়ে সভামঞ্চে উপবিষ্ট। আমাদের অধ্যাপকের বসার ওই ভঙ্গিটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল মনে হয়।

আমাদের আলাপ-পরিচয়েব পালা শুরু হল। কে কোথা থেকে এসেছি, কেন ফিলসফি পড়াব কথা ভেবেছি, এইসব আর কী। বিশেষ করে কৌতূহল সৃষ্টি করল আমাদেব বাজস্থানি বন্ধু সোমনাথ সটক। সে বলতে চাইছিল, জাতে ওরা বাজাজ, বাবার কাপড়ের ব্যবসা চালাতে তাব একেবারেই ভাল লাগে না। তাই তার মনে হয়েছে শান্তিনিকেতনে এসে দর্শন পাঠ করলে তাব মন হয়তো তৃপ্তি পাবে। কিন্তু এই কথা কটি বলতে সে ঘেমে নেয়ে উঠল। কারণ সে ছিল ভীষণ তোতলা। মোটা চশমাব পিছন থেকে বড় বড় চোখে অধ্যাপক আমাদের সব ক'জনার মুখ দু একবার দেখে নিলেন। কারও মুখে আর বিদ্রূপ-হাস্যের লেশমাত্র রইল না। অধ্যাপক ধৈর্য ধবে তার উত্তরটি বার করে আনতে সাহায্য করতে থাকলেন।

পাঠ্য বিষয়ে নিজের বক্তব্য শুরু কবতে গিয়ে বললেন, তোমরা হয়তো ভারতীয় দর্শনচিন্তার সঙ্গে খানিকটা পরিচিত হয়েছ, তাই ভাবতীয় দর্শনভাবনা দিয়েই শুরু করা যাক। এই প্রসঙ্গে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রসঙ্গ তুললেন। সংস্কৃত শব্দ তিনটি বিশেষ করে নিদিধ্যাসন শব্দটি যেন একটু সযত্ন প্রয়াসে শুদ্ধ উচ্চারণ কবলেন, গুরুর মুখ থেকে পাওয়া জ্ঞান কী করে এই ভাবে তিনটি পর্যায়ের সাহায্য শিষ্য আত্তীকরণ করতেন সে কথাই ব্যাখ্যা করে চললেন। শ্রুতি স্মৃতি, আবৃত্তি ও মননের সযত্ন চর্চায় জ্ঞানের পরম্পরা সুরক্ষিত হত।

এরপর নীতিশাস্ত্রের পাঠ শুরু হল সাধারণ আলাপচারীর ভঙ্গিতে। কোন কাজটা নৈতিক আর কোনটা অনৈতিক তার বিচার আমরা কী করে করি? আমাদের মনে কী উদ্দেশ্য আছে তাই দিয়ে? নাকি ওই কাজের কী ফল দাঁড়াল তাই দিয়ে? পড়াশুনোয় ব্যস্ত কোনও বাবুমশাইয়ের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে যে ভিক্ষুক তাঁকে ভিক্ষার জন্য ঘ্যান ঘ্যান করে বিরক্ত করছিল, তাকে যদি উনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর রুপোর দোয়াতদানিটি ছুঁড়ে মারেন, এবং বাবু যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন তা হলে ভিক্ষুকটি নিশ্চয়ই রুপোর দোয়াতদানিটি কুড়িয়ে নিয়ে অত্যন্ত উপকৃত হবে। তা হলে কি বাবুমশাইয়ের কাজটি নৈতিক হল?

এই নিয়ে দশ-বারোজন মিলে বেশ কথাবার্তা আলোচনা জমে উঠেছিল। ঘণ্টা পড়ার পরেও বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তা চলল। সেদিনকার পাঠ শেষ হলে অধ্যাপক আবার বিব্রতভাবে বললেন, আমি তো রেজিস্টার নিয়ে আসিনি। তোমাদের নামগুলো একটু লিখে দেবে।

তখন আমি খাতার শেষ পৃষ্ঠা থেকে খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে, তাতে সব ক'জনের নাম লিখে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি এক পলক দেখে ভাঁজ করে সেটি তাঁব জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিলেন। অনেকদিন পরে সেই পকেট থেকে সেই কাগজখানি বার করে হাসতে হাসতে আমাকে দেখিয়েছিলেন।

সবাই উঠে পড়লে আমি আমার আসনটি ফেরত পেলাম। সেটি শ্রীনিকেতনের তাঁতে বোনা আসন ছিল না। গীতার পরামর্শে আমার মা তাঁর হাতে বোনা একটি কার্পেটের আসন আমাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। আসনটি ফেরত দিতে দিতে অধ্যাপক বলেছিলেন, 'এটি নিশ্চয়ই কিনতে পাওয়া যায় না।' অন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে জেনে নিয়ে শ্রীনিকেতনে বোনা একটি আসন কেনার জন্য শিল্প সদন দোকানটির দিকে চলে গেলেন।

আবু সয়ীদ আইয়ুব নামটি আমি আগে কখনও শুনিনি। এমনকী যেসব মুসলমানী নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, ঠিক সেগুলির মতও নয় এই নামটি। কিন্তু দেখা গেল পুণ্যশ্লোক, অনীশ, নারায়ণ চক্রবর্তীরা শুধু যে নামটির সঙ্গে পরিচিত তাই নয়, তাঁর লেখার সঙ্গেও পরিচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে আবার 'পরিচয়' পত্রিকার নাম শুনলাম। তখন মনে পড়ল পাটনার ক্লাসফ্রেন্ড চয়নিকা বলেছিল, 'পরিচয় পত্রিকা রাখা হয় না এমন শিক্ষিত বাড়ি আছে নাকি?' আমাদের বাড়িতে রাখা হত না, মাত্র 'দেশ' আর 'প্রবাসী' পর্যন্ত দৌড়। তাই চুপ করে গিয়েছিলাম। তবে আবু সয়ীদ আইয়ুবদের 'পরিচয়' আর চয়নিকা পীযূষদাদের 'পরিচয়' যে একই নয় সে কথা জানতে আরও কয়েক মাস লেগেছিল।

শোনা গেল আবু সয়ীদ আইয়ুব মশাই নাকি বাংলা ভাষাতেই কঠিন দুর্বোধ্য সব প্রবন্ধ লেখেন। যদিও তাঁর মাতৃভাষা ছিল উর্দু।

[এই লেখাটি গৌরী আইয়ুবের অসুস্থ অবস্থায় লেখা অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা 'আমাদের দুজনের কথা'-র অংশ।]

অনুলিখন কামাল হোসেন

[সৌজন্যে দেশ ৮ আগস্ট, ১৯৯৭]

গৌরী আইয়ুবের নির্বাচিত

প্রবন্ধ ও গল্প

প্রবন্ধ

গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতার মেয়েরা

বলতে গেলে কলকাতার মেয়েদের চমকপ্রদ কীর্তিগুলি প্রায় বেশির ভাগই ১৯২১-এর আগে ঘটে গেছে। বাকি ছিলো বোধহয় সাহেব গভর্ণরকে গুলী করা, গিরিশৃঙ্গ জয় করা আর উড়ো জাহাজ চালানো। কিন্তু এসবে একালের বাঙালী তত অবাক হয়নি, যতটা হয়েছিল জুতো মোজা পরা মেয়েদের সেকালে বেথুন সাহেবের ইস্কুলে যেতে দেখে। ১৮৭৯ সালে বেথুন স্কুল থেকে দুটি কন্যা প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন। একজন প্রথম বিভাগ পেতে পেতেও পেলেন না মাত্র একটি নম্বর কম পড়ায়। সেই কন্যার অভূতপূর্ব কীর্তিতে কলকাতা থেকে ঢাকা পর্যন্ত তখন কী জয় জয়কার! কত পুরস্কার, কত অভিনন্দন। ইংরেজি-বাংলা কাগজেপত্রে সে কি লেখালেখির ধুম। শুনেছি সেই কাদম্বিনী বসু বি. এ. কিংবা চন্দ্রমুখী বসু এম. এ-রা যখন কারুর বাড়ি বেড়াতে যেতেন তখন কৌতূহলী দর্শকের ভীড় জমে যেত পাড়ায়। কল্পনা দত্ত, বীণা দাস-রাও চমকে দিয়েছিলেন বটে বাংলাদেশকে। কিন্তু এঁদের কিংবা লক্ষ্মী পাল, সুদীপ্তা সেন, দূর্বা ব্যানার্জিদের দেখবার জন্য তেমন লোক জমে বলে তো শুনি না। খবরের কাগজের রিপোর্টারের সঙ্গে এঁদের সাক্ষাৎকারের সরস বিবরণ, এমনকি সুজয়া গুহ, কমলা সাহার মতো বীরাঙ্গনাদের শোচনীয় পরিসমাপ্তির করুণ কাহিনীও ঘরে বসে পড়ে অবলীলাক্রমে ভুলে যেতে পারে আজকের বাঙালী পাঠক-পাঠিকা। প্রতি তুলনায় কি আলোড়নটাই না জাগিয়ে ছিলেন ঠাকুরবাড়ির সেই বধূ যিনি পার্ক স্ট্রীট দিয়ে স্বামীর পাশাপাশি ঘোড়ায় চেপে হাওয়া খেতে যেতেন গড়ের মাঠে। বির্জিতলাও-এর সান্ধ্য আসরের প্রাণস্বরূপা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর শহরজোড়া খ্যাতি ছিল ; কলকাতার বিদগ্ধ সমাজ আকৃষ্ট হতেন সেই আসরে। এদেশের ভদ্র শিক্ষিত সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সহজ-স্বাভাবিক মেলামেশার সেই তো প্রথম সূচনা। আজকাল বাঙালী মেয়ে বিদেশে শ্বশুর-ঘর অথবা স্বামীর-ঘর করতে যাচ্ছে। কিন্তু ১৯০৭ সালে হরিপ্রভা তাগেদা যখন জাপান যাত্রা করেন জাপানী স্বামীর সঙ্গে তখন চমকে উঠবার মতো একটা ঘটনা ঘটেছিল বটে। তাঁর লেখা "বঙ্গ মহিলার জাপান যাত্রা" সেকালের বাঙালী যত আগ্রহে পড়েছেন, আজ কোনো বঙ্গমহিলা যদি দক্ষিণ মেরু কিংবা চন্দ্রেও যাত্রা করেন, তবু তাঁর কাহিনী অত আগ্রহ নিয়ে আজকের বাঙালী পড়বেন কিনা সন্দেহ। আর ঠাকুরবাড়ির কন্যা সরলা দেবীকে তো ক্ষণজন্মা মেয়ে মনে করা হোত। সাহিত্যচর্চা আর রাজনীতি থেকে শুরু করে কি না করেছেন তিনি।

তুলনায় আজকের মেয়েদের কীর্তিগুলি যেন চোখেই পড়ে না—নাড়া দেয় না তেমন করে। কিংবা বলা যায় বিস্ময়বোধ করার জন্য যে অকৃত্রিম সারল্যের প্রয়োজন তাই বোধহয় লোপ পেয়েছে দেশ থেকে। অথচ ভেবে অবাক হই কি যুগান্তরটাই না ঘটে গেছে গত পঞ্চাশ বছরে এই কলকাতার বুকে। প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরটাতেই এই শহরের পথ থেকে পাল্‌কী অপসৃত হয়েছিল ; বড় ঘরের মেয়েদের পাল্‌কী শুদ্ধ চুবিয়ে তুলে গঙ্গাস্নান করানোর নিরাপদ রীতি আরও আগেই উঠে গেছে। তবু দিবালোকে কলকাতার রাজপথে ভদ্রঘরের মেয়েদের

প্রায় দেখাই যেত না। এর সঙ্গে তুলনা করতে হয় বর্তমান যুগের বেলা দশটার ডালহৌসী স্কোয়ারের চেহারা। ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যখন ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (অর্থাৎ সেই কাদম্বিনী বসু) সভাপতি স্যার ফিরোজ শাহ মেহতাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য সভামঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন, তখন সবাই বিস্ময়ে গর্বে অভিভূত। সেদিন তাঁকে দেখে এ্যানি বেসান্টের মনে হয়েছিল এই মহিলা ভারতের নারী জাগরণের মূর্ত প্রতীক। হাঁ তখন পর্যন্ত প্রতীক মাত্র। কারণ স্ত্রীশিক্ষা কিংবা নারী-জাগরণ তখন সীমিত ছিল কলকাতার গোনাগুন্তি কয়েকটি পরিবারে। সে সময়ে যাঁদের নাম বাঙালীর মুখে মুখে ফিরতো তাঁদের মধ্যে ছিলেন লিলিয়ান পালিত, প্রথম মহিলা ইশান স্কলার ; সরলাবালা মিত্র, হিন্দু ঘরের বিধবা যিনি ১৯০৭ সালে শিক্ষণ শিক্ষার জন্য বৃত্তি নিয়ে ইংলন্ড গিয়েছিলেন ; তটিনী গুপ্ত (পরে দাস) যিনি ১৯১২ সালে সম্মিলিত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। তাছাড়া ছিলেন কামিনী রায় বি. এ., কুমুদিনী খাস্তগীর বি. এ., সুজাতা বসু এম এড, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বি এ., প্রিয়ংবদা দেবী বি এ., শান্তা দেবী বি এ., সীতা দেবী বি. এ ইত্যাদি আরও কত বিদূষী। কলকাতার নারী-জাগরণ ইতিহাসের কয়েকটি উজ্জ্বল নাম। কিন্তু তখনও এই নগরের কটি মেয়েই বা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছিলেন? সে ছিল একক কীর্তির যুগ। এঁরা যেন সন্ধ্যার আকাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি মাত্র তারকা। আকাশ ভরা তারার ঐশ্বর্য তখনও দেখা দেয়নি। কলকাতার মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ভালো রকম ব্যাপ্ত হতে আরও এক প্রজন্ম-কাল কেটে গেল। তাছাড়া কলকাতার স্ত্রী-শিক্ষা প্রসঙ্গে তদানীন্তন ডি. পি আই একটি মজার মন্তব্য করেছিলেন ১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে। তাঁর মতে যে সব মেয়েরা সে বছরে পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশেরই আদি নিবাস কলকাতা নয়, পূর্ববঙ্গ। সে যাই হোক, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত শিক্ষায় সমাজ-সংস্কারে রাজনীতিতে সাহিত্য চর্চায় আমরা যে মেয়েদের দেখি তাঁদের গুণ যতোই থাক না কেন, সংখ্যা তাঁদের অতি নগণ্য ছিলো।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমান শতকের বিশ বাইশ বছর পর্যন্ত নারী শিক্ষার একটি শীর্ণ ধারা প্রবহমান ছিল সমাজের উচ্চ গিরিশৃঙ্গে ; এবার তা নেমে এল সাধারণ্যের সমতলে। নারী জাগরণের সেই ক্ষীণতোয়া কয়েক দশকেই এতো বিস্তার লাভ করেছে যে একে প্রায় জোয়ার আসা নদী মনে হয়। আপাতত দু-একটি মাত্র উদাহরণ দিই। ১৯৩২-৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে একটি কেবল মহিলা ছিলেন, রবীন্দ্র ভারতীর বর্তমান উপাচার্যা ডঃ রমা চৌধুরী। আর আজ কলকাতার সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়েরই দর্শন বিভাগে মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে বেশি বলে শুনতে পাই। ১৮৮১ সালে প্রথম যখন দুটি মেয়ে (অবলা দাস ও এলেন দ্যাব্রু) কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন, তখন কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিতে রাজী হননি। তাই চিকিৎসা শাস্ত্র পড়তে তাঁদের মাদ্রাজ যেতে হয়েছিল। কিন্তু দু বছর পরই মেডিকেল কলেজের রুদ্ধদ্বার আন্দোলনের মুখে খুলে গেল। এখন প্রতি বছরে চিকিৎসা বিদ্যায় যাঁরা স্নাতক হন, তাঁদের একটি বড় অংশই মহিলা। তাছাড়া নার্সিং তো বলতে গেলে মেয়েদেরই জীবিকা হয়ে উঠেছে। আইন কিংবা সাংবাদিকতাতে তো মহিলারা আছেনই, তাছাড়া এনজিনিয়ারিং এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, এমনকি পুলিশের চাকরীও আর মেয়েদের অনধিগম্য নয়। তা ছাড়া কিছু চাকরী আছে যা প্রায় মেয়েদেরই একচেটিয়া হয়ে গেছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার

হে বিধাতা?" প্রশ্ন করেছিলেন বটে রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সারা ভারতেই এবং বিশেষ করে এই কলকাতায় নারীকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে পুরুষরাই অনেক বেশি প্রয়াস করেছেন দেখতে পাই। কেবলমাত্র মহিলাদেরই নেতৃত্বে নারীর মুক্তির আন্দোলন (Women's Lib.) তেমন করে এদেশে কোনোকালেই দানা বাঁধেনি মোটে। বলতে গেলে তার দরকারই হয়নি। বরং ইংলন্ডে যে সময়ে মেয়েরা ভোটের অধিকার পাবার জন্য আন্দোলন করছিলেন, সে সময়েই বাঙলাদেশের একটি তেজস্বিনী মেয়ে (সরলা দেবী) নিজের সমাজের ছেলেদের জাগিয়ে তোলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাদের মধ্যে বীর্য আর আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করার জন্য প্রতাপাদিত্য উৎসব, বীরাষ্টমী ব্রত ইত্যাদি প্রবর্তন করেছিলেন। অন্যপক্ষে রামমোহন-বিদ্যাসাগর এদেশের নারীকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই শুরু করেছিলেন মূঢ় সমাজের সঙ্গে। সেই লড়াইকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মনোমোহন ঘোষ, আনন্দ মোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি আরও বহু খ্যাত অখ্যাত মানুষ। নানা সম্প্রদায়ের খৃষ্টান মিশনারীরা এবং ব্রাহ্মরাও দলবদ্ধভাবে ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোভাগে। ভারতের তথা বাঙলার মেয়েরাও পুরুষের হাত থেকে বিনা আয়াসে শেষ যে মহৎ উপহারটি পেয়েছেন সেটি হিন্দু কোড বিল। অবশ্য আমাদের সব সম্প্রদায়ের মেয়েরাই যদি এই অধিকারগুলি পেতেন তবে আরও সুখের হোত।

গত শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই এই শহরের মহিলারা নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান করেছেন নানা উদ্দেশ্যে। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল, ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদন, নারী কর্মমন্দির, সখি সমিতি, বিধবা শিল্পাশ্রম, মহিলা কর্মী সংসদ, মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ, দীপালী সংঘ, সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি—কত আর নাম করবো! পত্রিকা সম্পাদনা হয়ত করেছেন আরও বেশি : বঙ্গবাসিনী, বালক, বিরহিণী, অন্তঃপুর, গৃহলক্ষ্মী, হিন্দু ললনা, বেগম, মুকুল, আন্নেসা, জয়শ্রী, বঙ্গলক্ষ্মী, বুলবুল, মেয়েদের কথা, মহিলা, শ্রীমতী, ঘরে-বাইরে, সখী সংবাদ...এরপরও কত নাম বাদ পড়লো। এর অনেকগুলিই অল্প দিনে লীলা সংবরণ করেছিলো বটে। তবু মেয়েদের আত্মপ্রকাশের এবং আত্মনির্ভরতার কিছু ক্ষেত্র অবশ্যই প্রস্তুত করে দিয়েছিল। কিন্তু এই সব মহিলা-প্রতিষ্ঠান বা মেয়েলী পত্রিকা যে মস্ত বড়ো একটা কিছু করতে পেরেছিলো কিংবা পুরুষশাসিত সমাজের সঙ্গে লড়াই করে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলো এমনতর দাবী হয়ত করা চলে না। বরং আমাদের সৌভাগ্য যে পশ্চিমের অগ্রসরতম দেশের মেয়েদেরও যতখানি যুদ্ধ করতে হয়েছে পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ আর সরকারের সঙ্গে আমাদের তার কিছুই করতে হয়নি। গত দুশো বছর ধরে এদেশে ধর্মান্ধতা, নিষ্ঠুর কু-সংস্কার, নারীদ্বেষ আর নারী-অবমাননার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন প্রধানতঃ কিছু হৃদয়বান পুরুষেই। আমরা তাঁদের হাত থেকে উপহার পেয়েছি শিক্ষা, সম্মান, অধিকার। ফলে আমাদের নারী জাগরণের ইতিহাস কখনোই পুরুষ বনাম নারীর যুদ্ধের ইতিহাস হয়ে ওঠেনি। আমরা কেড়ে নিইনি বলেই সম্ভবত নারীকে দেশের সর্বময়ী কর্ত্রী করে দিতেও পুরুষের পৌরুষে আঘাত লাগেনি এদেশে। ফিলিপ স্প্র্যাট্ হয়ত এর মনোবিকলনগত ব্যাখ্যা দেবেন। বলবেন এ হোল মাতৃ-মনোনিবদ্ধতার (mother fixation) প্রকাশ। এদেশের পুরুষ যে কখনও সাবালক হয় না তার এহেন প্রকাশ ধর্মে, সমাজে, গার্হস্থ্যে অহরহ পাওয়া যাবে! যদি তাই হয় তবে হোক। কিন্তু আমাদের প্রাচ্য সমাজে অসুখী নিঃসঙ্গ মানুষ হয়ত আজও অনেক কম। আশা করা যাক শিল্পায়নে আরও উন্নতি হলেও আমাদের জীবনবোধে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আসবে না।

॥

পঞ্চাশ বছর আগেকার তুলনায় এই নগরের জমি ও বাসস্থানের উপর, তাছাড়া নাগরিক সুখসুবিধার উপরও চাপ অন্তত হাজার গুণ বেড়েছে। ১৯২০-২১-এর পর থেকে বহুলোক এসেছেন জীবিকার টানে কারণ এই নগরে ও নগরের আশে-পাশে বহু শিল্পসংস্থা গড়ে উঠেছে। আর ছিলো শিক্ষাদীক্ষার সুবিধা। তাছাড়া নাগরিক জীবনের কিছু স্বাচ্ছন্দ্যও আছে। তাই ক্রমাগত কলকাতা মানুষকে টানছে ; ১৯২১ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছিল, তা এই সব স্বাভাবিক কারণেই। তারপরের ৬।৭ বছরে এক অস্বাভাবিক জন বৃদ্ধি হোল দেশ বিভাগের ফলে। তারপর আবার ১৯৫২ সালের পর থেকে বৃদ্ধির হার নাকি অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় কমই। তাছাড়া গত ৩।৪ বছরের রাজনৈতিক অশান্তি এবং শিল্পসংস্থাগুলিতে অস্থিরতার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নাকি আরও কমেছে বলে অনুমান করা হয়।

যাই হোক যেভাবে বন্যার মতো দেশ বিভাগের পর লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এসে পড়লেন তাঁদের সঙ্গে তাল রেখে বাড়ি-ঘর তৈরী করা শহরের সুখ সুবিধাকে আশে-পাশের অঞ্চলে প্রসারিত করা এবং কর্মসংস্থান করা সম্ভব হয়নি এই দরিদ্র দেশে। বৃহত্তর কলকাতার বহু অংশেই এখনও খোলা নর্দমা বয়ে গেছে, পানীয় জল আসে টিউবওয়েল থেকে এবং তাছাড়া সেপটিক ট্যাঙ্ক নেই। ফলে আবাসযোগ্য বস্তীর ঘরে মাথা গুঁজতে হয়েছে অসংখ্য মানুষকে। C M D A যা হিসেব দিয়েছে, তাতে দেখি গড়পড়তা কলকাতার এক একটি ছোটো ঘরে তিনজনেরও বেশি বাস করে। শতকরা ৩০টি বাড়িতে কোনো কল নেই। শতকরা ১২টি বাড়িতে কোনো নিজস্ব পায়খানা নেই। আলাদা বাথরুম আর রান্নাঘর যে কত বাড়িতে নেই, সে হিসেব আর নাই দিলাম, কারণ কলকাতার ১/৪ মানুষ যে বস্তীর মধ্যে বাস করেন এতো সবাই জানেন। এর বেশির ভাগ চাপটা পড়ে গৃহবদ্ধ মেয়েদের উপর।

তাছাড়া আরও একটি বিরাট সংখ্যক ভাসমান নাগরিক আছেন এই শহরে যাঁদের জন্য বস্তীর চালাও জোটে না। এঁরা ফুটপাথে বাস করেন। এমনটা পৃথিবীর আর কোনো শহরে আছে কিনা সন্দেহ। এঁদের উপজীবিকা দিনমজুরী, রিকশা কিংবা ঠেলা গাড়ি টানা, ছোটোখাটো জিনিষ ফেরী করা, ভিক্ষা করা। কয়েকটি গরু, খাটিয়া আর হাঁড়ি এবং উনুন নিয়ে পশ্চিম থেকে আগত কিছু দুগ্ধ ব্যবসায়ীও ফুটপাথে বাস করেন শোনা যায়। এই বস্তীবাসী এবং ফুটপাথবাসীদের অধিকাংশই তাঁদের পরিবার-পরিজনকে গ্রামে বা মফঃস্বলে রেখে এসেছেন। এখানে জীবিকা অর্জন করে যথাসাধ্য দেশে পাঠান। প্রধানত এদের উপস্থিতির ফলেই এই শহরবাসীদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। সারা পশ্চিম বাংলাতেই পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। কলকাতায় এই বৈষম্যটা আরও প্রকট। প্রতি হাজারজন পুরুষে ৭০০জন মেয়ে আছে কিনা সন্দেহ। তার ফলে কিছু সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে।

বাঁশবেড়িয়া থেকে উলুবেড়িয়া আর অন্যদিকে কল্যাণী থেকে কল্যাণপুর পর্যন্ত অঞ্চলকে কেউ কেউ বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ফেলেন। এই বিস্তৃত অঞ্চলের লোকসংখ্যার একটি বিরাট অংশ পূর্ব বাংলা থেকে দেশ বিভাগের পরে এসেছেন। সরকারী, বেসরকারী প্রচেষ্টায় এবং বিশেষত ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের উদ্যোগে গত কুড়ি বছরে বেশ কিছু বাড়ি তৈরী হয়েছে। এতে উচ্চবিত্ত এবং মধ্য-বিত্তের গৃহ সমস্যার যদি বা কিছু সুরাহা হয়েছে, বস্তীবাসীদের দুঃখের শেষ অবিলম্বে হবে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে কলকাতার পথে গাড়িও

বেড়েছে হাজার গুণ, ঘোড়া কমলে কি হবে! ফলে রাস্তাঘাটে গাড়ির ভীড় যেমন বেড়েছে অসম্ভব রকম, তেমনি মবিলের ধোঁয়ায় এই শহরের হাওয়া এতদূর দূষিত হয়েছে যে সেইদিক থেকে পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলির সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতে পারি।

অর্থাৎ এই শহরে কয়েক পুরুষ যাবৎ যে মধ্যবিত্ত পরিবার বাস করছেন, সে পরিবারের ঠাকুরমা কলেজে পড়া নাতনীকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে পারবেন, তাঁদের কাল কতো ভালো ছিলো। জিনিষপত্রের তখন আজকের তুলনায় জলের দাম ; কলকাতার পথঘাট ঝকঝকে তকতকে ছিলো, দুবেলা জল ঢেলে ধোয়া হোত , গঙ্গার ধারে সন্ধ্যায় হাওয়া খেতে যাওয়া যেতো—অর্থাৎ গঙ্গার ধার বলতে এখনকার মতো ঐ ম্যান অব-ওয়ার জেটির কাছে কয়েক গজ মাত্র রাস্তা বোঝাতো না! কলকাতার পার্কগুলি এমন ন্যাড়া ছিলো না। অনেকেরই নিজের বাড়ি ছিলো. সেই সঙ্গে এক চিলতে বাগানও ছিলো, নারকেল, লেবু কি কলা গাছের। ভাড়া বাড়িতে যারা থাকতো—অর্থাৎ যাদের "চালচুলো ছিলো না" তাদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতেও লোকের দ্বিধা হোত তখন. আজ গড়ের মাঠকে দেখলে কে বুঝবে কি গর্ব করার মতো বস্তু ছিল ঐ মাঠ! ইডেন গার্ডেনের কি দুর্দশা হয়েছে, সে আর তিনি স্বচক্ষে দেখেননি আশা করা যায়, কারণ ক্রিকেটে তাঁর অভিরুচি থাকার কথা নয়। এত শুনে তবু কি নাতনী ঠাকুরমার সঙ্গে কাল-বদল করতে রাজী হবে? রাজী হলে কি তাকে বুদ্ধিমতী বলবো আমরা? নাতনীর বাসস্থানের পরিসর কমেছে, সারা দিনের অবসরও কমেছে, কিন্তু তার পায়ের শিকল কেটেছে। নাতনীর কালে এই শহরের পথঘাট আর আকাশ অনেক বেশি অপরিচ্ছন্ন হয়েছে বটে—কিন্তু নাতনীর মন অন্য যে এক নতুন আকাশে উড়বার অধিকার পেয়েছে সে আকাশের খবর জানা ছিলো না ঠাকুরমার। ঠাকুরমার ঘোমটা-টানা শাসন মানা জীবন আজ কত দূরে মনে হয়—নাতনী পেয়েছে শিক্ষার অধিকার, স্বাধীন উপার্জনের অধিকার, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার, নিরঙ্কুশ দাম্পত্য ও তার অভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার আর পরিবার পরিকল্পনার উপায়। বলতে গেলে এই পঞ্চশীলের উপর আজকের মেয়েদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত। অতএব আজকের নাগরিকারা কি পঞ্চাশ বছর আগেকার মেয়েদের তুলনায় বেশি সুখী? জীবন যত জটিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা যত প্রবল হচ্ছে ততই স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জীবন থেকেই "সরল সহজ সুখ" দ্রুত অপসৃত হচ্ছে। তাই বর্তমান কলকাতার মেয়েরা বেশি সুখী কিনা বলা কঠিন। তবে নিঃসংশয়ে বলা যায় আজকের মেয়েরা স্বমর্যাদায় বেশি প্রতিষ্ঠিত। শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্রের নিশ্চিন্ত (?) আশ্রয় থেকে ক্রমে তারা চ্যুত হচ্ছে। আর এই স্বাধীনতার আবশ্যিক অনুষঙ্গ যে ঝড়-ঝাপটা তাতে পড়ে নাকানি-চোবানিও তাকে যথেষ্ট খেতে হচ্ছে। কিন্তু আমৃত্যু নাবালিকা হয়ে থাকার অমর্যাদার পরিবর্তে তারা পাচ্ছে যথাসময়ে সাবালিকা হবার দুঃখ। মানুষ্যধর্মের বিবেচনায় একেই আমি শ্রেয়তর জ্ঞান করি।

শাস্ত্রে বলেছে কন্যাপোবম্ পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। ঐ অপি-টুকু লক্ষ্য করবার মতো! এতকাল অভিভাবকেরা করেও ছিলেন বটে। অর্থাৎ ছেলেদের পড়িয়ে-শিখিয়ে যদি সঙ্গতি অবশিষ্ট থাকতো তাহলে মেয়েদের ভাগো শিক্ষার উদ্বৃত্ত ছিটেফোঁটা এসে পড়তো। তারপর হঠাৎ এক সময়ে এই শহর কলকাতায় পশ্চিমী হাওয়া বইতে শুরু করায় অভিভাবকেরা শাস্ত্রের ঐ নির্দেশ থেকে এক পা এগিয়ে গেলেন। তাতে আবার বিদেশী শাসকের আনুকূল্য পাওয়া গেল, বিদেশী মিশনারীদের উৎসাহ তো ছিল। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুলের পত্তন। তারপর দেখতে দেখতে কত রকমের কত ইস্কুলে গড়ে উঠলো। একদিকে লা মার্টিনিয়ের, লরেটো, ডায়োসীজান—অন্যদিকে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, এমনকি মহাকালী পাঠশালা পর্যন্ত! তবে

মেয়েদের শিক্ষার আরও বড় ঢেউটা বোধহয় এলো নন-কো-অপারেশানের পর পরই।

১৯১৯ সালের আইনে শিক্ষার ভার পড়ল প্রাদেশিক সরকার এবং নির্বাচিত মন্ত্রীর উপর। ফলে এবপর থেকে কলকাতার মুসলিম মেয়েদেরও শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। বেথুন সাহেবের 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' তৈরী হয়েছিল হিন্দু মেয়েদের জন্যই—প্রথম প্রথম সেখানে অহিন্দু ছাত্রীদেব নেওয়া হোত না। কিন্তু ১৮৭৯ সালে যখন একই বাড়িতে কলেজও শুরু হয়, তখন কলেজে অহিন্দু ছাত্রীদের নেওয়ায় বাধা হয়নি। কলেজের প্রথম অহিন্দু ছাত্রী মিস এলেন দ্যাব্রু ভর্তি হয়েছিল ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। অবশ্য খৃষ্টান মেয়েদের স্কুল-কলেজের অভাব প্রথম থেকেই ছিল না। অভাব ছিল বরং মুসলমান মেয়েদেব জন্য। খৃষ্টান মিশনারী-পরিচালিত ইস্কুলে মুসলিম মেয়েদের নিতে বাধা ছিল না। কিন্তু সেসব ইস্কুলে পড়ে মেয়ে 'মেমসাহেব হয়ে যাবে' এবকম ভয় বক্ষণশীল মুসলমান পরিবারেও ছিল। তাছাড়া মুসলমান মেয়েদের পক্ষে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করার বাধা তো আরও প্রবলই ছিল। তাই যে স্কুলে পুরোপুরি ভারতীয় আবহাওয়া আছে, কিছুটা পর্দা আছে সেখানে তবু মুসলমান মেয়েরা যেতে পারতেন, কিন্তু সে বকম কোনো কোনো স্কুলে আবার তাঁদের প্রবেশলাভ সহজ ছিল না। মুসলিম মেয়েদের এই বাধা দূর করতে এগিয়ে আসেন বেগম রোকেয়া শাখাওয়াৎ হোসেন। প্রায় একক প্রয়াসে ১৯১১ সালে একটি স্কুল গড়ে তোলেন এই মহিলা। প্রথম এ স্কুল শুরু হয় ওয়েলেসলী অঞ্চলে মুসলমান বসতির মাঝখানে। তখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধাসাধি কবে মেয়েদের নিয়ে এসেছেন তিনি। আজ তাঁর সেই বিদ্যালযে ভর্তি হবার জন্যই অভিভাবকদের সাধাসাধি কবতে হয়। শাখাওযাৎ মেমোরিয়াল স্কুল শুরু করবাব দু বছর আগেই ১৯০৯ সালে মুসলিম মেয়েদের জন্য আর একটি স্কুল শুরু হয়—আঞ্জুমান গার্লস স্কুল। প্রায় ৩০ বছর পর বিশেষ কবে মুসলিম মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্যই পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ। অবশ্য ইতিপূর্বেই বেথুন কলেজ থেকে মুসলিম মেয়েরা অনেকেই পাশ করেছেন। ১৯৩৮ সালে কাজি আখতার বানু বেথুন থেকে দর্শনে অনার্স নিয়ে পাশ করেছিলেন, তিনি সেবার মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন।

যাই হোক ১৯২২-২৭ এর সরকারী বিবৃতিতে (The Ninth Quinquennial Review) দেখি মন্তব্য রয়েছে : 'এবার বালিকা বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ১৯২৭-৩২ সালের পরিক্রমায় দেখি রয়েছে . 'a burst of enthusiasm swept girls into schools with unparalleled repidity. .Government with the full concurrence of Legislative councills poured out large sums of money on women's education which would have been regarded as beyond the realm of practical politics ten years previously.' শিক্ষার জন্য এই নবজাগ্রত আগ্রহ আপন বেগেই কলকাতা নগরীর ঘরে ঘরে এসে পৌঁছলো। পনের বছর পর অর্থাৎ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আরও দ্রুত এবং অভূতপূর্ব বিস্তার হোল স্ত্রীশিক্ষার। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু মধ্যবিত্তরা প্রায় সবাই এসে পৌঁছলেন প্রধানত কলকাতা শহরে ও শহরতলীতে—যা নিয়ে আজকের বৃহত্তর কলকাতা। কলকাতার চেয়ে কয়েক বছর দেরীতে ইস্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা হলে কি হবে ঢাকায় স্ত্রী শিক্ষার প্রসার কলকাতার চেয়ে বেশিই ছিল। শুধু কলকাতার ইস্কুল-কলেজ নয়, প্রায় সমগ্র পূর্ব ভারতেরই স্ত্রী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষকতার কাজে পূর্ব বাংলাব মেয়েরাই বেশি সংখ্যায় যোগ দিয়েছেন প্রথম থেকেই। দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলা-আগত মধ্যবিত্তদের উৎসাহে এবং প্রভাবে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার চলন আরও বাড়লো।

তাছাড়া অর্থনৈতিক প্রয়োজনও ছিল। উদ্বাস্তু পিতারা কন্যাকেও উপার্জনক্ষম করে তুলতে সঙ্কোচ করেননি। এর প্রভাবও অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল পশ্চিম বাংলাব মধ্যবিত্তদের উপরে পড়লো।

সাধারণ্যে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য আগ্রহ আজ যতখানি বেড়েছে আয়োজন সে পরিমাণে করে ওঠা সম্ভব হয়নি। পরিসংখ্যান বলছে ক্রমেই এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়ছে। ১৯৫১ সালে শিক্ষা বিস্তারে এ রাজ্য ছিল চতুর্থ। ১৯৬১ সালে পশ্চিম বাংলাব স্থান নেমে গিয়ে হয়েছে সপ্তম। ১৯৭১ সালের হিসেব আমাদেব হাতে নেই। কিন্তু সবাই জানেন ইতিমধ্যে পশ্চিম বাংলার বিশেষত কলকাতার শিক্ষা বিস্তারে উন্নতি তো দূরে থাক, বনেদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিরও স্পষ্ট অবনতি হয়েছে। তাই আমরা গত দশ বছরে নামতে নামতে সর্বভারতীয় পবিপ্রেক্ষিতে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি, সে খবব বোধহয় না জানাই ভালো। ১৯৬১ সালের আদমসুমারির হিসাব অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার শতকরা মাত্র ৪০জন পুরুষ এবং শতকরা ১৭জন মাত্র স্ত্রীলোক সাক্ষব। বলাবাহুল্য কেবল কলকাতাব হিসাব নিলে সাক্ষবতার হার আরও একটু উঁচু হবে—কিন্তু তা সত্ত্বেও কলকাতা ভাবতবর্ষের অনেক কটি শহরেব চেয়ে এ বিষয়ে পিছিয়ে আছে।

এ রাজ্যে আটত্রিশ হাজাব গ্রামের মধ্যে দুই হাজাব সাতশো গ্রামে নাকি পাঠশালা বলতেও কিছু নেই। তবু শতকবা যতগুলি ছেলেমেয়ে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায় (৮৪%) সমসংখ্যক ছেলেমেয়ে (৬৫%) কলকাতায় সে সুযোগ পায় না। ১৯৬৩ সালে আইন করে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। যদিও কলকাতা কর্পোরেশন এই অবৈতনিক শিক্ষাব সুযোগ খুব কম ছেলেমেয়েকেই দিতে পাবছে তবু দেখা যায় কলকাতায় ৬৯% জন মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পায় আর গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৬৫% জন মেয়ে। তবে ছেলেদের বেলা এই হাব উল্টে যায়। ১৯৫৮ সালে গ্রামীণ ছাত্রীদের ক্লাস v থেকে viii পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক কবে দেওয়ার ৫ বছরের মধ্যে নাকি ছাত্রী সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়ে যায়। কিন্তু ঐ পর্যায়ের ছাত্রীরা কলকাতায় এ সুবিধা যদি তখনই পেত, তাহলে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাব আবও বেশি প্রসার হোত বই কি। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার বেলায় দেখি যে এই পর্যায়েব শিক্ষাকে মুদালিয়ব কমিশনেব সুপারিশ অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে গিয়ে মহা অব্যবস্থাব সৃষ্টি হয়ে আছে। আগেকাব ধাঁচের এক ধারার (one stream) স্কুল সবগুলিকেই রূপান্তরিত কবা যায়নি। আবার বহু ধাবার স্কুলও (multipurose) সার্থকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। কার্যতঃ ২।৩টিব বেশি ধাবার (stream) আয়োজন প্রায় কোনো বালিকা বিদ্যালয়েই করা যায়নি অনেকটা উপযুক্ত মহিলা শিক্ষিকার অভাবেও। এতে করে কলকাতার মেয়েদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। তাছাড়া অন্তত মেয়েদের জন্য এখনও ঘরে পড়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা দবকার।

স্বাধীনতা-উত্তব কালে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মেয়েদের হারও অভাবিত রকম বেড়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে এঁদের সংখ্যা ছিল ১২% সমগ্র ছাত্র সমাজের তুলনায়। ১৯৬২-৬৩ সালে দেখি ২৫% জনই ছাত্রী। উচ্চশিক্ষার জন্য চাহিদা কলকাতার মেয়েদের মধ্যে যত দেখা যায় তেমন আর অন্য শহরে দেখা যায় না। সারা ভারতবর্ষে নাকি ১৯৬৪-৬৫ সালে যতজন উচ্চাশিক্ষার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ২০ জন মেয়ে, কলকাতায় এদের সংখ্যা ২৫। অবশ্য অর্থকরী শিক্ষা—যেমন চিকিৎসা বিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, কমার্স, চার্টার্ড একাউন্টেন্সী ইত্যাদিতে শতকরা হার মাত্র ৫জন।

মেয়েদের শিক্ষার প্রথম যুগে যদিও উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত চিত্তের উন্মেষ, তবু বড় ঘরের

কিছু মেয়েও সামাজিক বাধা অগ্রাহ্য করে অর্থকরী শিক্ষার দিকে গিয়েছিলেন। সমাজ সেবার আদর্শ ছিল তাঁদের সামনে। মেডিকেল কলেজে ১৮৮৩ সালের পর থেকেই মেয়েদের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকে। কিছুদিন পর ক্যাম্পবেল স্কুল খোলা হলে সেখানেও মেয়েরা প্রবেশাধিকার পেলেন। এছাড়া নার্সিং এবং শিক্ষকতাই ছিল তখন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের উপার্জনের উপায়। গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতার মেয়েদের সামনে উপার্জনের কত পথই যে খুলে গেছে তার পুরো হিসেব দেওয়া সহজ নয়। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল-এডভোকেট থেকে শুরু করে অফিসের স্টেনোগ্রাফার, ফার্মের রিসেপশানিস্ট, বিমানের সেবিকা, দোকানের পসারিণী সবেতেই শিক্ষিতা মেয়েরা আছেন। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস আর টেলিফোনের চাকরী তো আছেই। বরং গরীব ঘরের নিরক্ষরা মেয়ের জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রই অনেকটা সীমিত। গ্রামের দিকে চাষবাসের কাজ আর খনি অঞ্চলে খনি মজুরী তারা করতে পারে বটে তবে কলকাতার মত শহরে পরিচারিকার কাজ ছাড়া খুব আর কিছু খোলা নেই তাদের সামনে। বিড়ি বাঁধা, ঠোঙা বানানো, ফেরী করা ইত্যাদিও তারা জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করে বটে। কোনো কোনো ফ্যাক্টরীতে আজকাল মেয়েদের নেওয়া হয়। কিন্তু রেডিও, টেলিফোন-যন্ত্র কিংবা শেলাই কল তৈরীর কারখানায় চাকরী পাওয়ার জন্যও কিছু পড়াশোনা জানা দরকার হয়।

এই শহরের মেয়েরা এখন বিপুল সংখ্যায় উপার্জন করতে যাচ্ছেন বলে সংসারের চেহারাও ক্রমে পালটাচ্ছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংসারে মেয়েদের নতুন মর্যাদা এনে দিয়েছে। যে মেয়ে রোজগার করেন কিংবা না করলেও করতে পারেন প্রয়োজন হলেই, সে মেয়ের মতামত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে মূল্য না দিয়ে উপায় নেই। এর ফলে মেয়েদেরও নিজের উপর আস্থা বেড়েছে। নিরুপায় আশ্রিত চিরকালই অবজ্ঞেয়। কয়েক বছর আগে শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী স্টেটসম্যান পত্রিকায় চাকুরীজীবিনীদের নিয়ে একটি প্রবন্ধ ফেঁদেছিলেন। তার বক্তব্য ছিল : যারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মোহে চাকুরী করতে ছোটেন তাঁরা তাদের শখ মেটাতে গিয়ে সংসারকে করেন বিপর্যস্ত, স্বামীকে অসুখী ; আর নিজের জন্য ডেকে আনেন অপমান আর লাঞ্ছনা। কেনা-বেচার নির্মম জগতের সংস্পর্শে এসে স্বভাব হয় রুক্ষ ; পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে দেহের স্বাস্থ্য, মনের মাধুর্য সবই হারাতে হয়। স্বামীর সর্বময় কর্তৃত্ব অসহনীয় হয় বলে যাঁরা উপার্জন করতে বার হন তাঁরা ভুলে যান যে, স্বামী যদি কোনো কারণে ভর্ৎসনাও করেন তবু আবার গলা জড়িয়ে ধরে স্ত্রীর মান ভাঙান, কিন্তু অফিসের কর্তৃপক্ষের তিরস্কার তো নির্জলা অপমান! বিবাহের জন্য অপেক্ষা করার কালটা যে কুমারী কন্যা চাকুরী করেন, তাঁরও অবস্থা কিছু ভালো নয়। তিনি আর নাকি মোটেই অনাঘ্রাত পুষ্পটি থাকেন না। বহু পুরুষ বন্ধুর করপীড়নে করপল্লব হয় কর্কশ!...তবে মনে হয় বাঙলাদেশের বিবাহার্থী যুবকেরা এবং এঁদের পিতামাতারা নীরদবাবুর সঙ্গে একমত নন। বিয়ের বাজারে চাকুরী করা মেয়েদের চাহিদা ক্রমে কি পরিমাণ বাড়ছে তার একটা প্রমাণ পাওয়া যাবে সংবাদপত্রের পাত্র-পাত্রী স্তম্ভে। রাঢ়ী বারেন্দ্র সদ্‌গোপ শাণ্ডিল্যের অরণ্যে বেশি খুঁজতে হবে না, সহজেই চোখে পড়বে 'বয়স্থা উপার্জনক্ষমা'-র জন্য আবেদন। মেয়েদের উপার্জন করতে যেতে হয়, শুধু যে শখ আর জেদ মেটাবার জন্য নয়, মধ্যবিত্ত সংসারের অভাব মেটাতেই যে বহু স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই রোজগারে বার হতে হয় একথাটা নীরদবাবুর মতই আরও কেউ কেউ বুঝতে চান না। তাই মেয়েদের চাকুরী করাটা এঁদের চোখে প্রায় অপরাধ, বলতে গেলে স্বামী-সন্তানের প্রতি প্রায় যেন অবিচারের পর্যায়ে পড়ে! চাকুরী করা কোন্ মেয়ে সংসারকে কতখানি অবহেলা করেন, তার মুখরোচক বর্ণনা

কখন কখনও অনুদার প্রতিবেশিনীর মুখে শোনা যাবে। অবশ্য প্রশংসারও অভাব হয় না। ঘরে বাইরে যে মেয়ে সমানভাবে সামলান অনেক সময়ই তা সবিস্ময় সাধুভাষণও লাভ করে।

চাকুরীজীবিনীকে মাঝে মাঝে কর্মক্ষেত্রে এবং ঘরে নানা জাতীয় কিছু মেয়েলী সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়। কোনো কোনো চাকুরীতে আজকাল কর্তৃপক্ষ মহিলা কর্মীদের সুখ-সুবিধা বিষয়ে আগের চেয়ে সচেতন হয়েছেন, কিছু বিশেষ ব্যবস্থাও করেন তাঁদের জন্য; বিশেষ করে যে সব মেয়েরা হাতের কাজ করেন, কি গতর খাটিয়ে রোজগার করেন, তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্য কিছু আইনও আছে। তবে একটি সমস্যায় প্রায় সব চাকুরীজীবিনী মাকেই পড়তে হয়। সন্তান যখন ছোটো থাকে, তখন তাকে ভালোভাবে দেখা-শোনা করা এবং সেই সঙ্গে চাকুরীকেও অবহেলা না করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। মায়ের শরীর ও মনের উপরও খুব চাপ পড়ে। শিশুকে মানুষ করে মা যে সমাজের এক মস্ত সেবা করছেন, সেকথা আমাদের প্রায় মনেই থাকে না। এই দরকারী কথাটা মনে রেখে মাকে আরও একটু সাহায্য করা উচিত সমাজের। আংশিক মাইনের, এমনকি বিনা মাইনেতেও দীর্ঘ ছুটি দেওয়া, কাজের সময় কমিয়ে দেওয়া—ইত্যাদি কি করা যায় না? তাছাড়া কলকাতা শহরে creche জাতীয় তো কিছু নেই বললেই চলে। কোনো কোনো factory-র সঙ্গে এখন এ জাতীয় শিশু পালনাগার তৈরী করা হচ্ছে। টালা পার্কে অস্ট্রেলিয়ার অর্থানুকূল্যে এমন একটি তৈরী হয়েছিল, জানি না এখনও তা চলছে কিনা। সব রকম চাকুরী করা মায়েদের জন্যই অসংখ্য শিশু পালনাগার প্রয়োজন সারা কলকাতা জুড়ে। নয়ত মন দিয়ে বাইরের কাজ করা মায়ের পক্ষে কঠিন হয়। সর্বক্ষণের জন্য ভৃত্য রাখার সামর্থ্যই বা ক'টি মধ্যবিত্ত মা-বাপের আছে?

শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে সত্যিই নারীর মর্যাদা আজ বেড়েছে কিনা এ প্রসঙ্গে একটি অস্বস্তিকর বিতর্ক প্রায়ই ওঠে দেখি। সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে অনেক মেয়ে আজ যে ধরনের আচরণ করেন কিংবা বিজ্ঞাপনে অথবা চলচ্চিত্রে যেভাবে নিজেদের পণ্য করেন, তাতে কি মেয়েদের প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধা বাড়ে? এই বিজ্ঞাপন-পরিচালিত যুগে নানা চিত্তহারী বিজ্ঞাপনে নিজের দেহকে নানাভাবে দান করে উপার্জন করেন অনেকে। এসব দেখে মনে হয় আজও বুঝি রমণী জীবনের চরম সার্থকতা পুরুষের চিত্তহরণ করাতেই। প্রাচীনারা সক্ষোভে প্রশ্ন করেন, এতে কি আধুনিকাদের আত্মসম্মানে লাগে না? এ প্রশ্নের চট করে দু কথায় উত্তর দেওয়া যায় না। তাই বরং ২।৩টি প্রতি-প্রশ্ন করেই ক্ষান্ত হব আপাতত। মেয়েদের জৈব প্রেরণাকে যে সমাজ ব্যবসায়ের মূল ধন করে সে সমাজের বিরুদ্ধে কি কিছু বলার নেই? নারীদেহের উপর যেমন বিজ্ঞাপনের ঝোঁক আছে, তেমনি একটা উলটো ঝোঁকও কি নেই আর এক শ্রেণীর বিজ্ঞাপনে?—যা দেখে হঠাৎ মনে হয় পুরুষের জীবনেরও একমাত্র লক্ষ্য রমণীর হৃদয়-মন-চক্ষুকে আকর্ষণ করা। তাছাড়া পৃথিবীর যাবতীয় কুকর্ম যে পুরুষরা করে তাদের জন্য যদি পুরুষ-মাত্রেরই মাথা হেঁট না হয়, তাহলে এই বৈশ্য যুগের প্ররোচনায় কিছু মেয়ে তাঁদের রূপ-যৌবনকে পণ্য করলেই ততে সমস্ত নারী জাতির লজ্জিত হবার কি আছে জানি না। পুরুষকে বিচার করবার সময় যেমন পুরুষমাত্রকেই পুরুষ জাতির প্রতিনিধি হিসাবে দেখি না, একটি বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে দেখি—নারীর বেলায়ও সে অভ্যাস আয়ত্ত করতে হবে। যাদের আমরা কম জানি তাদের বেলাতেই ব্যক্তিবিশেষকে গোষ্ঠীর প্রতিভূ মনে করে থাকি। প্রত্যেকটি নারীর একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে, যেমন প্রত্যেকটি পুরুষেরও আছে—আমরা প্রত্যেকে শুধু নিজের ব্যবহারের জন্যই দায়ী হতে পারি, আর কারুর ব্যবহারের জন্য নয়। যদি গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতার ঘর থেকে পথে বেরিয়ে আসা মেয়েরা কিছু অর্জন করে থাকেন, তা হয়ত

এই যে এখন আর দূর থেকে আবছা দেখে তাঁদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট ব্যক্তি সত্তাকে অগ্রাহ্য করা যাবে না।

মেয়েদের জীবিকার কথা আগেই যখন উঠেছে, তখন তাঁদের আদিমতম ব্যবসা সম্বন্ধেও দু কথা বলা দরকার। আমরা অবশ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছইনি যাতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারব যে, সমাজের রীতিনীতি নারীর প্রতি যতই উদার ও সহানুভূতিশীল হোক, অসহায়া সব নারীরই ভরণপোষণের দায়িত্ব যদি রাষ্ট্র নেয়ও তবু মানুষের সমাজ থেকে দেহোপজীবিকা নির্মূল করে দেওয়া যাবে না কোনোদিন। পশ্চিমের অত্যন্ত ধনী এবং শিথিলতম (permissive society) সমাজেও তো এই বৃত্তিধারিণীদের সংখ্যা কমছে না? আইন করে এই ব্যবসায়কে জনসাধারণের পক্ষে কম বিপজ্জনক কিংবা কম বিরক্তিকর করা যায়, কিন্তু তুলে দেওয়া যায় না। গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের এই শহরে এবং শহরতলীতে অবশ্য শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন বেড়েছে, গ্রামীণ সমাজের নীতিবোধ শহরে এসে যত শিথিল হয়েছে, নিসঙ্গ পুরুষের সংখ্যা যে পরিমাণে বহুগুণিত হয়েছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবসায়েরও প্রসার হয়েছে। শুধু লাইসেন্স নেওয়া নির্দিষ্ট পাড়াতেই নয়—অন্যত্রও। তবে আমাদের সমাজে, কেন এই বারাঙ্গনারা একাজে এসেছে এ প্রশ্ন করলে, আজও সেই সনাতন উত্তরগুলিই শুনতে হবে। সেই দারিদ্র্য, সেই সংসারের অবিচার, সেই নীতিহীন হৃদয়হীন কোনো পুরুষের টানে ঘর ছাড়া! অর্থাৎ ব্যাপারটা নিতান্তই সোজাসুজি। আমাদের সামাজিক জটিলতা এখনও তত বাড়েনি যে মনোবিজ্ঞানী বারাঙ্গনাদের এই ব্যবসায় গ্রহণ করার কারণ হিসাবে তেমন interesting মনোবিকার খুঁজে পাবেন কিছু। সম্প্রতি কয়েকটি ছোটো-খাটো অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে যে এদের অধিকাংশই নিরক্ষরা, চাষীর ঘরের মেয়ে, এদের মধ্যে বড একটি সংখ্যাকে নানা প্রত্যাশা দিয়ে যাকে বলে 'ফুসলিয়া আনা' হয়েছে। আর কেউ কেউ হয়ত শুনে অবাক হবেন যে কুমারী কিংবা বিধবার তুলনায় সধবার সংখ্যা কম নয় এ ব্যবসায়ে। নারী-হিতৈষী কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সরকারের সাহায্যে মাঝে মাঝে এদের কয়েকজনকে উদ্ধার করে সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে হয়তো। কিন্তু ফল তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু হয় না। যে সমাজে নিরপরাধা ধর্ষিতা হতভাগিনীরা ঘর পায় না আজও সে সমাজে বারাঙ্গনারা ঘর পাবে এ কি সম্ভব? আমাদেব স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসে জড়িয়ে আছে নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা এবং অবিচারের এমনি এক করুণ কাহিনী। আর এই বিংশ-শতাব্দীর মধ্যকালে সুস্থ মাথায় এই দুর্ভাগিনীদের সৎ পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল আত্মহত্যা করার জন্য। আজও আমাদের সমাজ "নারীর অপরাধ" বিচারের বেলায় মোটামুটি অগ্নিপরীক্ষার যুগেই রয়ে গেছে।

তবু ভারতের সংবিধান, ভারতের আইন সামনের দিকেই হাঁটছে। তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে হয় গুটিকয়েক মহানুভব দেশ-নেতাকে। কি ভাগ্য তাঁরা দেশের মানুষের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন! মুসলমান মেয়েরা চিরকালই পৈতৃক সম্পত্তির এবং মায়ের সম্পত্তিরও অধিকারিণী, ভাইয়েব সমান অধিকার না থাকলেও। কিন্তু দায়ভাগ-মিতাক্ষরা-শাসিত সমাজ নারীকে পিতার সম্পত্তিতে অধিকার দেয়নি। সনাতন হিন্দু শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করে নতুন আইনে মেয়েরাও আজ ছেলেদের মতোই পিতাব সম্পত্তিতে সমান অধিকারিণী। অবশ্য আইনকে ফাঁকি দেবাব উপায়ও বার হযে গেছে। কিন্তু সব সময়ে সেজন্য বাপ-মাকেও দোষী করা যায় না। লক্ষ্য করলেই চোখে পড়বে যে, দেশের যে-অংশ শিক্ষায় সংস্কৃতিতে পিছিয়ে আছে তার তুলনায় কলকাতা শহরেই কন্যার বিবাহে খরচ উত্তরোত্তর বাড়ছে। পণ নেওয়াও বেআইনী বটে, কিন্তু

পণ নেওয়ার ঝোঁক ইদানীং বেড়েছে বই কমেনি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যুগে এই শহরের যুবকদেব মধ্যে এক অদ্ভুতপূর্ব আত্মসম্মানবোধ জেগেছিল। তখন অনেকেই পণ এবং যৌতুক নিতে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এখন বহু উচ্চ-শিক্ষিত জামাতাও শ্বশুরের কাছ থেকে পণ নিতে, বিদেশ-যাত্রার খরচ নিতে কিংবা অপরিমিত যৌতুক নিতে লজ্জা পান না। বরং বাড়ি-গাড়ি-ফ্রিজিডেয়ার-রেডিওগ্রামের মূল্যে নিজের মূল্যের পরিমাপ করে শ্বশুর-প্রদত্ত যৌতুককে জাহির করতেও ভালবাসেন দেখি। যৌতুক দেওয়া নেওয়ায় এক অসম্ভব বাড়াবাড়ি, ঘরে ঘরে প্রায় রেষারেষি শুরু হয়েছে মনে হয়। তার চেয়েও যা দুঃখের এবং লজ্জার সে হোল এ বিষয়ে কন্যাদের চেতনার অভাব এমনকি লোভও দেখেছি কোনো কোনো পাত্রীর। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী পাওয়া মেয়েও তো দেখি অপমানিতা হন না, প্রতিবাদ করেন না তাঁর জন্য পণ দিতে হলে কিংবা অপরিমিত যৌতুক দাবী করলে। তাঁদের আত্মসম্মানে তো লাগেই না বরং যৌতুক যথোপযুক্ত না হলে পিতার কাছে কোনো কোনো কন্যা অনুযোগ জানান এমনও দেখেছি। অতএব একবাব বিবাহেব সময় সর্বস্বান্ত হয়ে অর্থ ঢালবার পব আবার পিতা ও ভ্রাতা যদি কন্যাকে সম্পত্তিরও অংশ না দিতে চান, তবে দোষ দেওয়া যায় না। তবে যে দেশে নারীকে সম্পত্তির অধিকাব দেওয়ার চেয়ে চিতায় তুলে দেওয়া সহজ মনে হোত সে দেশে যে সমান-অধিকাব প্রতিষ্ঠার জন্য আইন হয়েছে এবং আইন মেনেও চলেছেন অনেকে এতো কমখানি উন্নতি নয়!

বিবাহ-বিচ্ছেদের বৈধতা স্বীকার কবেও সনাতন শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। যা ছিল জন্মজন্মান্তরের বন্ধন তা যদি গলাব ফাঁস হয়ে ওঠে তবে তাকে এক জন্মেই ছিন্ন করা যায় আজ। হিন্দু কোড বিল গৃহীত হবার পরই এত বিরাট সংখ্যায় বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য রাজদ্বারে আবেদন এসেছিল এই শহরেই যে তাতে করে একটি সযত্ন-লালিত বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছিল। এই আইন যখন প্রণীত হচ্ছিল, তখন অনেকেই বলেছেন এবং লিখেছেন যে হিন্দু মেয়েরা যেহেতু স্বামীকে দেবতা এবং বিবাহকে অচ্ছেদ্য জ্ঞান কবতে অভ্যস্ত যুগ যুগান্তর হতে, তাই বিবাহ বিচ্ছেদেব আইন তো অপ্রয়োজনীয় বটেই তদুপরি এই আইন চালু হয়ে গেলে তাদের সামনে একটা মন্দ পথই খুলে দেওয়া হবে। বছর কুড়ি আগেই এই নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়েছে যাঁরা ভেবেছিলেন হিন্দু সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রয়োজন হয় না বলেই শাস্ত্রে এর বিধান নেই তাঁদের বিশ্বাস ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে, আবার যাঁরা ভেবেছিলেন, এই কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করলে আধুনিকাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের ধুম পড়ে যাবে তাঁদেরও ভুল ভেঙেছে। বরং যে অবস্থায় ঘর ভাঙতে না দেওয়াই নিষ্ঠুরতা তেমন অসহনীয় অবস্থাকে মাথা পেতে নিতে কেউ আব বাধ্য নয়। কিন্তু মুসলমান ও ক্যাথলিক সমাজের মেয়েরা আজও এ ব্যাপারে সুবিচার পান না। অবশ্য এই দুই ধর্মের বিধান মোটেই এক নয়। ক্যাথলিক পুরুষও বিবাহ-বিচ্ছেদ কিংবা একাধিক বিবাহ করতে পারেন না। মুসলমান স্বামী যদি একাধিক বিবাহ করেন এবং কোনো স্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহারও করেন, তবু (শাস্ত্র যাই বলুক) সেই মেয়ে নিরুপায়। যদিও অন্যপক্ষে বিনা অপরাধেই, এমনকি ঝোঁকের বশেও স্ত্রীকে ত্যাগ করা সহজ। যদিও বহু মুসলিম দেশেই এই অবিচারের সম্ভাবনাকে আইন করে খর্ব কবা হয়েছে, তবু বহু মুসলমানের দেশ এই ভারতবর্ষে এখনও মুসলিম মেয়েরা ও জাতীয় অবিচার মেনে নিতে বাধ্য। হয়ত 'বাংলাদেশের' সৎ প্রভাবে উৎসাহিত হয়ে কলকাতার শিক্ষিতা মুসলিম মেয়েবাও অদূর-ভবিষ্যতে এমনতর দাবী করবেন। দুপক্ষ থেকেই সঙ্গত কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব হলে তবেই নিরঙ্কুশ ও সসম্মান দাম্পত্যেরও সম্ভাবনা বাড়ে। অবশ্য ভাঙা-ঘরেব সন্তানরা সমাজের পক্ষে মস্ত এক সমস্যা একথা অস্বীকার

করা যায় না। তবে অসুখী মা-বাপের সঙ্গে বাস করে যে সন্তান সেও কম অসুখী হয় না। আর পৃথিবীতে আজও এমন কোনো বিবাহ-ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি যাতে দম্পতি-মাত্রেই সুখী হবে। তাই সংসার ভাঙবার আইন না থাকলেই এ সব সমস্যাও থাকবে না একথা কেউ বিশ্বাস করেন কি?

আধুনিকা মেয়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার আর এক মস্ত সহায় বিজ্ঞান। অসময়ে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব তার সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ আজ আর ব্যাহত করতে পারে না। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়ে যে সমাজ ও ব্যক্তির জীবন অনেকখানি ভারমুক্ত হয়েছে সে বিষয়ে বোধহয় মতান্তর হবে না। ষষ্ঠীর অকৃপণ আশীর্বাদ এক সময়ে মেয়েদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে জৈবিক চাহিদা মেটাতেই সমস্ত মন সমস্তক্ষণ চলে যেত। এমনকি মাতৃত্বের যে পরমসুন্দর অভিজ্ঞতা তাও প্রায় বিভীষিকা হয়ে উঠতো অনেকের পক্ষে—আজও তেমন অবস্থার সৃষ্টি হয় না তা নয়। কিন্তু এ অবস্থাকে ঠেকানো এবং মাতৃত্বকে অত্যন্ত বাঞ্ছিত ও সুখজনক করার উপায় আজ আছে। হয়ত কয়েক শতাব্দী ধরে মেয়েরাও যদি সংসারভারে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে না থাকেন, তাহলে তাঁদেরও সৃষ্টিশীলতার উদ্‌গতি (sublimation) হবে এবং একদিন মেয়েদের মধ্যেও অসামান্য প্রতিভার (genius) এমন অভাব আর থাকবে না।

সৃষ্টিশীল কর্মে কলকাতার মহিলারা গত দুই প্রজন্মে যে যথেষ্ট অভিরুচি ও অভূতপূর্ব উৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন এ হয়ত অসংকোচে বলা যায়। কথা সাহিত্যে, কাব্যে তাঁদের একটি বিশিষ্ট দান আছে এবং তাঁদের সাহিত্যকর্মে এই মেয়েলি ছাপ থাকায় অধিকাংশ মহিলা লেখিকা হয়ত লজ্জিত নন যদিও কেউ কেউ হয়ত "মহিলা-লেখিকা" বলে উল্লেখিত হতেও অপমানিতা বোধ করেন। বিজ্ঞানে যদিও মহিলারা সম্প্রতি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তবু মননধর্মী সাহিত্যে মহিলারা খুব কিছু আজও দিতে পারেননি, চার প্রজন্মকাল কালেজী শিক্ষার মধ্যে থেকেও। অবশ্য সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে পিছিয়ে না থাকলেও কলকাতার পুরুষ সমাজই বা এমনকি ভূরি ভূরি মননধর্মী সাহিত্য রচনা করে যাচ্ছেন?

সম্প্রতিকালে কলকাতার মঞ্চে, কলকাতার চলচ্চিত্রে যে সব মহিলারা খ্যাতি অর্জন করেছেন, গর্ব করে বলা যায় যে তাঁরা অধিকাংশই রূপ আর জৌলুষ-সর্বস্ব নন। শিল্পবোধ, অভিনয়-কুশলতা আর আঙ্গিক নিষ্ঠা নিশ্চয়ই কলকাতার অভিনেত্রী সমাজকে একটি শীর্ষস্থানের অধিকার দিয়েছে। চলচ্চিত্র-পরিচালনাতেও মহিলারা শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের অন্য রাজ্যে আজও বাঙালীর সুনাম আছে কলা সচেতনতার জন্য। কলকাতায় চলচ্চিত্র, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, ছবি ইত্যাদি নিয়ে যা মাতামাতি হয় মহিলারা তার নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র নন। নৃত্যের কোনো যুগাগত ঐতিহ্য না থাকলেও এই পঞ্চাশ বছরে কলকাতায় ভদ্রঘরের মেয়েদের মধ্যে নৃত্যের রুচি ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত শান্তিনিকেতনের প্রভাবে। এই ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষেরই আদর্শ হয়েছিলেন কলকাতার মেয়েরা। ছবি আঁকায়, মূর্তি গড়ায় এখনও তেমন উল্লেখযোগ্য প্রতিভার পরিচয় না দিলেও ঐ শিল্পেও মহিলারা বিরল নন। তবে শান্তিনিকেতনের প্রভাবেই আবার মহিলা-জনোচিত কিছু শিল্পকর্ম প্রথমত কলকাতায় এবং কলকাতার আদর্শে পরে সারা ভারতেই প্রসার পেয়েছে। এই সব প্রসঙ্গে নাম উল্লেখে বিরত রইলাম, নয়ত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ একটি নামাবলী হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া মহিলাবিশেষের কৃতিত্বের চেয়েও পঞ্চাশ বছরে এই শহরের নারী সমাজের বিবর্তনই আমার বিচার্য।

উপসংহারে একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই। ইংরিজি শিক্ষা বনাম সংস্কৃত শিক্ষা

অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রচলন না প্রাচ্যশিক্ষার প্রসার এই নিয়ে যে তীব্র বিতর্ক জমে উঠেছিল প্রায় দেড়শ বছর আগের কলকাতায় তার একটি মূল প্রশ্ন ছিল উল্লিখিত কোন্ শিক্ষাধারাটি আমাদের সমাজকে সনাতন ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবে এবং ব্যক্তি মানুষকে উন্মূল করবে না। তারপর যখন মেয়েদের পশ্চিমী ধারায় শিক্ষা দেবার চেষ্টা হোল তখন স্বভাবতই এই দুর্ভাবনাটা আরও প্রবল হোল। জুতো পায়ে ইস্কুল-কলেজে গিয়ে এবং দু পাতা ইংরিজি পড়ে মেয়েরা যে মেমসাহেব হয়ে উঠবে, ("বিবিজান চলে যান লবেজান করে"), দেবদ্বিজে ভক্তি, গুরুজনের সেবা, সংসার ধর্ম পালন করা, স্বামীর প্রতি বাধ্যতা সবই ভুলে যাবে এ বিষয়ে অনেকেই নিশ্চিত ছিলেন এবং নারী শিক্ষার প্রবক্তারাও যে সকলে নিশ্চিন্ত ছিলেন তা নয়। এ শহরে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন হবার পর একশ বছরেরও বেশি পার হয়ে গেছে। কলকাতার মেয়েরা যে সাধারণভাবে বিশেষ উন্মূল হননি একথায় নিশ্চয়ই কেউ তেমন আপত্তি করবেন না, শুধু সেই দু একজন ছাড়া যাঁরা আজও প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, হিন্দু-ললনারা স্বেচ্ছায় সাগ্রহে স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিতেন। ভারতের অন্যান্য শহরের সঙ্গে তুলনা করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে এই শহরের মেয়েদের মূল ভারতীয়তায় আজও যথেষ্ট প্রোথিত রয়েছে। এমনকি বাহিরঙ্গে যাঁদের তীব্র পশ্চিমী ছাপ, মাঝে মাঝে দেখে প্রায় হতাশ লাগে যে তেমন মেয়েরাও মানৎ করেন, তাগাতাবিজ বাঁধেন, সাবেককালের না হলেও নব্য ধাঁচের গুরুর কাছে দীক্ষা নেন। অর্থাৎ মনে মনে ঠাকুমার মনের সঙ্গে মিল প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশিই আছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির একটা বৈশিষ্ট্য হোল বিজাতীয় প্রভাবকে আত্মসাৎ করে তার ধার ক্ষইয়ে দেওয়া। আর এই বৈশিষ্ট্য সম্ভবত ভারতীয় মেয়েদের চরিত্রে পুরুষদের চেয়েও বেশি। কলকাতার সৃষ্টিকাল থেকে বিদেশী প্রভাব খুব প্রবলভাবে পড়েছে এই শহরের মানুষের জীবনে। তার ফলে কলকাতার স্ত্রী পুরুষ অনেকে এক সময়ে টাল সামলাতে না পেরে একটু টলোমলো হয়েছিলেন হয়ত। কিন্তু শিক্ষা যত বাহির থেকে অন্তরে প্রবেশ করেছে, ততই তাঁরা স্ব-সমাজের ঐতিহ্যেও আত্মস্থ হয়েছেন। তাছাড়া এই শতাব্দীর গোড়া থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সুবাতাসও বইছিল। এতদিন পরে যুগের হাওয়ায় আজ যদি বা এই শহরের পুরুষ সমাজের কেউ কেউ বিবিক্ত সত্তার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছেন মহিলাদের মধ্যে সে ধরণের alienation-এর বোধ বলতে গেলে দুর্লভ। হয়ত মহিলাদের স্বাভাবিক সংরক্ষণশীলতাই আছে এর মূলে, তাছাড়া আছে স্ব সংস্কৃতিতে আস্থা— কিংবা আস্থার চেয়েও কিছু বেশি, প্রায় গর্ব। তাই বিলিতিয়ানা যে কালে ভারতবর্ষের আর সব বড় বড় শহরের মেয়েদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে, তখনও কলকাতার মেয়েরা পোষাকে-আশাকে, চলনে-বলনে, বিশ্বাসে-ভাবনায় তাঁদের ভারতীয়তা মোটামুটি বজায় রাখতে পেরেছেন। ব্যতিক্রম যা আছে তা নগণ্য।

পুরনো ধরণের পরিবার হয়ত ভেঙে গেছে তবু সেই পারিবারিক দায়দায়িত্ব আধুনিকারাও ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি পেয়ে, উপার্জনক্ষম হয়েও বিবাহের ব্যাপারে পিতামাতার নির্দেশ বিনাদ্বিধায় মেনে যাঁরা নিতে পারেন, তাঁদের সংখ্যা কম নয়, শতকরা পঁচাত্তরজন আধুনিকাই এ ব্যাপারে অভিভাবকের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য প্রণয়জ বিবাহ এবং অনুলোম, প্রতিলোম বিবাহের সংখ্যা বাড়ছে। তবে সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে উপার্জনক্ষম কন্যা যদি জ্যেষ্ঠাসন্তান হন এবং সাংসারিক দায়িত্ব গ্রহণ করার দরকার হয়, তাহলে অনেক সময়েই ছোট ভাইবোনেরা মানুষ না হওয়া পর্যন্ত নিজে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকেন। এমনটা পাশ্চাত্ত্য সমাজে নিশ্চয়ই বিরল। সনাতন মূল্যবোধ কিছুটা অবশিষ্ট না থাকলে এই আত্মত্যাগ হয়ত আর সম্ভব হোত না। আমাদের দেশের শিক্ষিতা মেয়েরা যদি কিছুটা

সচেতন থাকেন, তাহলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য শিল্পায়ণ এদেশে আমদানী করা সত্ত্বেও ঐ সমাজের কতগুলি দুঃখ-জনক সামাজিক পরিস্থিতির পুনরাবর্তন হয়ত সময়ে ঠেকাতে পারবেন। বৃদ্ধ মা-বাপ সম্বন্ধে সনাতন সহিষ্ণুতার কিছুটা চর্চা করা, বৃদ্ধ বলেই সমাজ থেকে বাতিল না করে দেওয়া, সংসারে তাঁদের ঠাঁই দেওয়া—এসব ব্যাপারে আধুনিকারা যদি সনাতন মূল্যবোধ ধরে রাখেন, তাহলে হয়ত নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অনিশ্চয়তা, অতঃপর বিষণ্ণতায় ভুগবেন না।

যাই হোক সনাতন ঐতিহ্যে ও আধুনিক শিক্ষায় গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতার মেয়েরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন সেটা শক্ত মাটিই এবং সমসাময়িক যুগের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও নিজেদের স্থৈর্য এবং মহিমা একেবারে হারাননি।

[*সৌজন্যে-আনন্দবাজার পত্রিকা* : (সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা), ১৩৭]

জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধ

একটা রাজনৈতিক 'চক্রান্ত' অনুযায়ী বিদায়ী শাসকরা যে মানচিত্র ধরে জনসংখ্যার জেলাওয়ারী হিসেব করে ১৯৪৭ সালে দেশটাকে লাল পেন্সিল দিয়ে ফেড়ে ফেলেছিল সে কথা সবাই জানে। কিন্তু এবার যে দেশটা ভিতর থেকেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে এ বিষয়েও তো দ্বিমত নেই। ভারতরাষ্ট্রের রাজ্যে রাজ্যে জমির ভাগ নিয়ে, জলের বাঁটোয়ারা নিয়ে যে প্রবল মতবিরোধ এবং পরস্পর বিরোধী আন্দোলনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাতে বিদ্বেষের প্রকাশ সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীদের বিরুদ্ধে যতখানি ছিল তার চেয়ে খুব কম নয়; বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি পৌঁনে দুশ' বছরে যত হিংসার প্রকাশ ঘটেছিল তার অনেক গুণ বেশি ঘটেছে গত পঁয়তাল্লিশ বছরে, স্বদেশী বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর প্রতি। এক রাজ্যের বাসিন্দারা অন্য রাজ্যে নিগৃহীত হচ্ছে— যেন সবটুকু ভারতবর্ষ সব ভারতবাসীরই স্বদেশ নয়। উত্তর ভারতের 'সাংস্কৃতিক আধিপত্য' দক্ষিণ ভারতের অসহ্য মনে হচ্ছে।

কখনও বা একই রাজ্যের ভিতরে ভাষা নিয়ে, জাতপাত নিয়ে, আঞ্চলিক আনুগত্য নিয়ে, চাকুরীর ভাগ নিয়ে শুধু নয়, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনের ভাগাভাগি নিয়েও রক্তপাত ঘটছে। এই পশ্চিম বাংলাতেই কেবল গোর্খারা কি ঝাড়খণ্ডীরাই যে নিজেদের শোষিত মনে করেন তাই নয়, উত্তরবঙ্গের বাঙালির মনেও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির বিরুদ্ধে শোষণের অভিযোগ ধোঁয়াতে শুরু করেছে। অর্থাৎ জাতীয় দেহের সর্বপ্রত্যঙ্গে ধ্বসা রোগ দেখা দিয়েছে।

দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পরে অন্তর্বিরোধের এই সব উপসর্গ যে দেখা দেবে তার লক্ষণ আগেও চোখে পড়েনি এমন নয়। কোনো কোনো নৈরাশ্যবাদী পূর্বাহ্নেই আমাদের সাবধান করবার চেষ্টাও করেছিলেন যে বিদেশী শাসকদের দূর করে দিলে অরাজকতার সৃষ্টি হবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন, "বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইবে তাহা নহে"। কারণ, "যাহারা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি

যাহাদের বেশি, দৈন্য অপমান ও অধীনতার হাত হইতে তাহারা কোন দিন নিষ্কৃতি পাইবে না।" তবে স্বভাবতই স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারে সে সব ভয়-ভাবনা তখন ভেসে গিয়েছিল এবং মনে হয়েছিল বিদেশী শাসনের চেয়ে মন্দতো আর কিছু হতে পারে না। অতএব ওটাকে প্রথমে দূর করা যাক। তারপরে ছোট ছোট ভেদ-বিভেদগুলিকে দূর করা যাবে। বাইরের শত্রুরা বিদায় হবার পবে ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখা গেল যে গৃহশত্রুরও অভাব নেই। বলতে গেলে এখন আমরা সবাই সবার গৃহশত্রু। ফলে কার কাছ থেকে কতটা ছিনিয়ে নিতে পারি তারই রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ চলছে দেশজুড়ে। প্রায়ই সেটা খুনোখুনির পর্যায়েও নেমে আসছে। এই পরিস্থিতিতে কি ভাবে কাদের কতটুকু পাইয়ে দিতে পারলে কত দিন ঠাণ্ডা রাখা যাবে তার হিসাব-নিকাশ রাজনীতি ব্যবসায়ীরা করতে থাকুন।

সাধারণ নাগরিকদের এখন ভেবে দেখতেই হবে, এই বিদ্বেষ-রোগের চিকিৎসা কী, এব মূলেই বা কী বিষ আছে। কারণ এটা সবারই অস্তিত্বের প্রশ্ন। গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকরা এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা, বিচার-বিবেচনা করতে না শিখলে কী করে স্বাধীনভাবে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে মত দান করবে? আবার এত বড় দেশে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পূণ ঐকমত্যও আশা করা যায় না।

কিন্তু কতগুলি মূলগত নীতিব ব্যাপারে অনেকখানি সহমত হবাব প্রয়োজন আছে। ক্রমাগত আমাদের চিন্তাভাবনা-গুলিকে পরস্পবেব মধ্যে আলাপ আলোচনার সাহায্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকাব। পার্থক্য ও বিরোধগুলিকে যথাসম্ভব আপোষে মিলিয়ে আনার চেষ্টাও দবকার। যেমন কিনা আমরা যাবা মনে করি যে ভারতবর্ষের অখণ্ডতা বক্ষা করার পূর্বশর্ত হল-গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতা, তারাও হয়ত গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার চরিত্র বিষয়ে সবাই একমত নই। আবার আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতাকেই যাবা মেকি ঘোষণা করে সংখ্যাগুরুব ধর্মনিরপেক্ষতাকে সবার উপর চাপাতে বদ্ধপবিকব, কিংবা এই গণতন্ত্রকেই যারা নানা ভাবে গণতন্ত্রের পরিহাসে পরিণত করে চলেছে তাদেরও সবার সঙ্গেই তো আমাদের তর্কবিতর্ক চালিয়ে যেতে হবে। কারণ ওটাই মতবিরোধ নিষ্পত্তির একমাত্র সত্য উপায়।

যাইহোক এই আলোচনা শুরু করতে গিয়ে প্রথমেই তিনটি স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করি

(১) জাতীয়তাবাদ কি ভারতীয় সংহতির পথে অন্তরায় হতে বাধ্য?

(২) ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কি অনিবার্যত জঙ্গী হিন্দুবাদ হয়ে উঠবেই?

(৩) জাতীয়তাবাদের আত্মঘাতী সর্বনাশ ঠেকাবার জন্য আজই আমাদের দেশে আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমানবিকতার ব্যাপক চর্চা কতখানি সম্ভব?

এই প্রশ্নগুলির একটা প্রেক্ষিত আছে। এই পত্রিকার গত মার্চ মাসের সংখ্যায় গৌরকিশোব ঘোষ অত্যন্ত দুঃসাহসী বলা উচিৎ সৎসাহসী-সুবিশ্লেষিত একটি প্রবন্ধে ('ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বনাম সংঘ পরিবার') পরামর্শ দিয়েছিলেন, "জনমনে কসমোপলিট্যান বা বিশ্বমানবিক চেতনার উন্মেষ এবং প্রসার ক্রমাগত না ঘটাতে পারলে সেকুলার গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবই নয়।" হিন্দুবাদীরা আজ জাতীয়তাবাদের নামে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে তুলে ধর্মনিরপেক্ষতাব উপর যে প্রবল আক্রমণ চালিয়েছে তারই সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াইয়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রবাদীদের একত্র করার তাড়নায় লেখা এই প্রবন্ধটি আরও অনেকের মতো আমাকেও উদ্দীপ্ত করেছে ঠিকই। তবু জাতীয়তাবাদেব প্রতি আমার আবাল্যের আসক্তি অতিক্রম করতে পারছি না বলেই উপরের প্রশ্ন তিনটি আমার মনে জেগেছে এবং আমাকে নিরন্তর ভাবাচ্ছে। আজ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদকে যখন সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করবার সময় এসেছে তখন জাতীয়তাবাদের প্রতি

এই দুর্বলতা হয়ত খুবই ক্ষতিকর, তা সত্ত্বেও এই ভাবনাগুলিকে আমি কাটিয়ে উঠতে পারছি না।

আমি শেষ প্রশ্নটিই প্রথমে আপনাদের সামনে পেশ করছি। কেন, তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না। রবীন্দ্রনাথ কিংবা মানবেন্দ্রনাথের অনুসারীদের কাছে আন্তর্জাতিকতা কিংবা বিশ্বমানবিকতার ধারণা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো সহজ হয়ে গিয়ে থাকলেও এই শব্দ দুটির অভিধানিক অর্থটি যে ক'জন বোঝেন সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে মহিলা প্রার্থিনীদের ভাবনাচিন্তা পর্যবেক্ষণ করার একটি সৎপ্রয়াস দেখেছিলাম খবরের কাগজের প্রতিবেদকদের মধ্যে। হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচন প্রার্থিনী জনৈকা মুসলিম মহিলাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বাবরি মসজিদ যে এঁরা ধ্বংস করলেন এ বিষয়ে তাঁর মত কি? তিনি নাকি জবাব দিয়েছিলেন, "ও তো অন্য দেশে হয়েছে। ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে?" প্রতিবেদক অবশ্য জানাননি যে এর পরে তিনি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন কি না যে অন্য দেশ বলতে উনি কী বোঝেন। অযোধ্যাটা আমাদের বাংলাদেশ নয় এই কি তার বক্তব্য? কিংবা ভারতবর্ষের অন্য কোথায় ভারতীয় জনতা পার্টিরা কী করছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। অথবা ভারতবর্ষ বলতে কী বোঝায় তাই তিনি জানেন না। তাঁর ধারণাটা সেদিন ঠিক মতো ধরতে না পারলেও একথা আমাদের অজানা নেই যে শতকরা পঁচাত্তর জন ভারতবাসী তাঁর দেশের মানচিত্রটাও ঠিকমতো চেনেন না। অবশ্য ইদানীং দূরদর্শনের আবহাওয়া সংক্রান্ত সংবাদের কল্যাণে দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ কলকাতার অবস্থান বিষয়ে সম্ভবত একটা ধারণা হয়েছে অনেকেরই এবং ঐ চারটি শহরই যে আমাদের দেশ এটাও মনে হয় তাঁরা বুঝতে পারেন। তবু অযোধ্যাটা আমাদের দেশ কিনা, ঢাকা অমৃতসর তক্ষশীলা রাওয়ালপিণ্ডি আমাদের দেশ কিনা এ বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকতেই পারে।

অতদূরেই বা যাবার দরকার কী? উলুবেড়িয়ায় কোনো কোনো নির্বাচন প্রার্থিনী হয়ত জানেন না যে কুচবিহার অথবা মজঃফরপুর তাঁর দেশ না পাকিস্তান না বাংলাদেশ। আর প্রার্থিনীর কথাই বা ধরছি কেন? ক'জন পঞ্চায়েত নির্বাচন-প্রার্থী পুরুষ শুধু নয়, ক'জন পঞ্চায়েত প্রধানই বা নিজের দেশের চৌহদ্দীর খবর রাখেন? অথবা তাঁর জেলার বাইরে পা দেবার সুযোগ কতবার পেয়েছেন? বাস্তব পরিস্থিতিটাই যখন এই রকম তখন এদেশের সব উঠতি নাগরিকদের মনে তার রাজ্য, তার রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটা আত্মপ্রসারী চেতনা, একটা আপনকরা আবেগ জাগানোটাই কি প্রাথমিক দায়িত্ব নয়? ছোট ছোট আঞ্চলিক স্বার্থ নিয়ে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি আমরা কি করে ঠেকাব যদি না বৃহত্তর দেশটার প্রতি একটা ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারি? এই মস্ত বড় দেশটার ভালমন্দ, ভাঙাগড়া, ওঠাপড়ার সঙ্গে প্রত্যেকটি নাগরিকের ভালমন্দের যে একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ রয়েছে সেটি অনুভব করাতে যদি না পারি তবে প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে বিরোধই বা কী করে ঠেকানো যাবে?

তাই আমার মনে হয় একটা দেশাত্মবোধ, একটা জাতীয় চেতনা ভারত রাষ্ট্রের অখণ্ডিত অস্তিত্বের পূর্বশর্ত। ন্যাশনালিজম-এর এত যে বিরোধী রবীন্দ্রনাথ, তাঁরও মনে হয়েছিল, "যাহা হউক, আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে—কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে নিত্য পদার্থটি আছে যে প্রাণ পদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে—আমাদের চিত্তকে, আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে।" এই উপমহাদেশতুল্য দেশের বিরাট জন-সমাজকে মেলাবার জন্য দেশটার ভূগোল ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহল, এর বহু বিচিত্র ঐতিহ্যের সঙ্গে আত্মীয়তা, এই দেশের প্রতি

একটু মমতা (অহঙ্কার নয়)—এই সদর্থক ভাবগুলি জাগানোর চেষ্টা করলেও কি অবধারিত ভাবে তা জঙ্গী জাতীয়তাবাদে পরিণত হবেই? "অহঙ্কার ছাড়া জাতীয়তাবাদ দাঁড়াতে পারে না"—একথা নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু জাতীয়তাবোধ? তার জন্য দেশের প্রতি অল্প একটু মমতাই কি যথেষ্ট নয়?

আমাদের অনেকের মনেইতো ভারত নামে দেশটার প্রতি গভীর মমতা আছে, তার নিন্দায় বা তার ক্ষয়ক্ষতিতে প্রাণ কাঁদে—তাই বলে কি দেশকে সমস্ত বিচারবুদ্ধি কিংবা ন্যায়অন্যায় বোধের উপরে তুলে রাখছি? "যদি সত্যকে ন্যায়কে ধর্মকে ন্যাশনালত্বের অপেক্ষাও বড়ো বলিয়া জানি" তাহলে আমরা কখনোই "ন্যাশনাল স্বার্থের আদর্শকে বিরোধের আদর্শকে খাড়া" করব না। এই রাবীন্দ্রিক শিক্ষা কি গ্রহণ করা সম্ভব নয়? My country right or wrong —এটা নির্বোধ অদূরদর্শীর উক্তি। ঠিক যেমন my family—right or wrong কিংবা my community—right or wrong এই দুটিও অশ্রদ্ধেয় উক্তি।

শ্রীলঙ্কা কি নেপাল কি বাংলাদেশ অথবা অন্য কোনো দেশের সঙ্গে যদি আমাদের সরকার কিংবা দেশের নাগরিকদেরও একাংশ অন্যায় আচরণ করে তবে কি আমরা তার নিন্দা করব না? চোখ বুঁজে সমর্থন করব? অবশ্য অনেক সময়েই এজাতীয় দুর্ব্যবহারের সপক্ষে আগে থেকেই এত (কু) যুক্তি আর (মিথ্যা) তথ্যও দেওয়া হতে থাকে যে বহু সৎ ভাবতীয় নাগরিকদের কাছেও শ্রীলঙ্কায় আমাদের সৈন্য নামানো কিংবা নেপালের সীমান্ত ঘিরে বাণিজ্যিক অবরোধকেও আর অসঙ্গত মনে হয় না। তবু যদি আমরা সতর্ক থাকি তাহলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে দাবিয়ে রাখার জন্য, কিংবা নিজের দেশের আর্থিক-রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকার যখনই অন্যায় আচরণ করবে আমরা তার নিন্দা করতে পারব মুক্ত কণ্ঠে। আমাদের দেশপ্রেমকে সন্দেহ করলেও, দেশদ্রোহী বলে নিন্দা করলেও মানবধর্মকে তার ঊর্ধ্বে তুলে রাখতে শেষ পর্যন্ত সাহসী হব কিনা জানি না, কিন্তু সেটাই যে আমাদের কর্তব্য সে বিষয়েতো কোনো সন্দেহ নেই। দেশপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বজনীন নীতি বোধেরও যদি চর্চা করা হয় তবে নিশ্চয়ই জঙ্গী জাতীয়তাবাদ শিকড় গাড়তে পারবে না। কিন্তু আগ্রাসী জাতীয়তাবাদে পরিণত হতে পারে এই আশঙ্কায় জাতীয়তার আবেগকেই অঙ্কুরে বিনাশ করতে হবে—এটা কি কোনো কাজের কথা হোল? এটা বাস্তবে সম্ভব কিনা তাও ভেবে দেখা দরকার।

উগ্র জাতীয়তাবাদের এবং সেই সঙ্গে ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্রেরও প্রতিষেধক হিসেবে গণতন্ত্রকে এদেশে তৃণমূলে ছড়িয়ে দেবার কথা অনেকেই বলছেন। তার উপায় হিসেবে গ্রামস্বরাজ অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির গ্রামভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণের তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করার কথাও ভাবছেন। আশাকরি তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে গ্রামজীবনেও কতখানি অশান্তি আর নৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে। পঞ্চায়েত গ্রামের কতখানি উপকার করছে তা গ্রামীণ মানুষই বলতে পারবেন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টাকা পয়সা ক্ষমতা প্রতিপত্তি নিয়ে গ্রাম পর্যায়েও যে দুর্নীতি আর হিংসবিদ্বেষের বিস্ফোরণ ঘটেছে তা অভূতপূর্ব। তাই মনে সন্দেহ জাগছে, সাধারণ মানুষকে গণতান্ত্রিক কর্তব্য আর অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার প্রকৃষ্ট উপায় কি এই ভাবে গ্রামে দলবাজি, খুনোখুনি, করদাতার অর্থে স্বজনপোষণ আর 'নির্বাচিত' প্রতিনিধির শ্রীবৃদ্ধি? এর বিকল্প কী তা নিয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ যেসব ভাবনাচিন্তা করছিলেন তাকে আমরা বিশেষ আমল দিইনি। কিন্তু নিজেরাও তো অন্যকিছু ভেবে বার করতে পারিনি।

এদিকে 'গণতন্ত্র' যে ভাবে শুকনো 'তৃণমূলে' ছড়িয়ে চলেছে তাতে সত্যিকার স্বায়ত্ত শাসন

আর ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটছে কি? অথবা গ্রামীণ মানুষকে পীড়নের এই নতুন যন্ত্র গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলেছে? বিষয়ান্তরে যাবার আগে ১৩১২ বঙ্গাব্দে লেখা রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেই একটি উদ্ধৃতি উপহার দিই : "এক সময় পঞ্চায়েত আমাদের দেশের জিনিস ছিল, এখন গবর্মেন্টের আপিসে-গড়া জিনিষ হইতে চলিল।...যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বতঃপ্রদত্ত নহে, যাহা গবর্মেন্টের দত্ত, তাহা বাহিরের জিনিষ হওয়াতেই গ্রামের বক্ষে একটা অশান্তির মতো চাপিযা বসিবে—তাহা ঈর্ষার সৃষ্টি করিবে—এই পঞ্চায়েতের পদ লাভ করিবার জন্য অযোগ্য লোকে এমন সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে যাহাতে বিরোধ জন্মিতে থাকিবে।"..শতাব্দীর শেষ বর্ষে পা দিয়ে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?

মেকি স্বায়ত্ত শাসনে দুর্নীতি একেবারে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর দুর্নীতি, অরাজকতা, প্রশাসনের প্রতি সর্বব্যাপী অনাস্থা, আত্মঅবিশ্বাস, সর্বমঙ্গলদাতা এক নেতৃত্বের জন্য আকুলতা এবং অবশেষে সেই-প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন নেতা ও তার দলেব উপর বিচারহীন আস্থা—এই ভাবে ধাপে ধাপেই স্বৈরতন্ত্র এসে কাঁধে চড়ে বসে..ধর্মসংস্থাপনার্থ! তাই রাজনীতি ব্যবসায়ীরা যখন ধর্মেব কথা বলে তখনই আমাদের সাবধান হওয়া দরকাব। কিন্তু এই ইতিহাস যারা জানে তারাও যথাসময়ে বিপদের লক্ষণগুলি চিনে উঠতে পারে না প্রায়ই।

যাই হোক আন্তর্জাতিকতাব প্রশ্নে ফিরে যাই। নিতান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠবার জন্য পরিবারের প্রতি আনুগত্যের চর্চা করতে হয়, আবার পারিবারিক স্বার্থকে কিছুটা খর্ব করে পল্লীর প্রতি সৌহার্দের চর্চা করতে হয়। তারপরেও পল্লীর প্রতি আনুগত্যেরও ঊর্ধ্বে উঠে বৃহত্তম দেশ বা রাজ্যকে ভালবাসতে এবং তার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে শিখতে হয়। এসব তো পুরানো কথা। বহু আধুনিক দেশের মানুষই এইভাবে বৃহত্তম গোষ্ঠীর দিকে ক্রমে অগ্রসর হতে শিখেছে। যা এখনও ভালো করে শেখা হয়নি সে হল জাতীয় স্বার্থেব ঊর্ধ্বে উঠে যথেষ্ট পরিমাণে আন্তর্জাতিকতার চর্চা করা। উন্নত চিন্তাভাবনায় সক্ষম সব মানুষই জানেন যে এই ভাবে ক্রমে ক্রমে আমাদের ব্যক্তিসত্তা প্রসারিত ও পরিণত হয়। ব্যক্তিগত ছোট ছোট স্বার্থকে, এমন কি স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি আনুগত্যকেও যে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য বলি দিতে শেখা দরকার, এটাও কিছু আর নতুন কথা নয়।

অথচ এত সব জেনে শুনেও অত্যন্ত অগ্রসর দেশেব মানুষও এখন পর্যন্ত পুরানো অভ্যাস, পুরানো চিন্তাকে কাটিয়ে উঠে বিশ্বের মানুষেব প্রতি শুভকামনার প্রমাণ যে প্রতিদিন দিচ্ছে না, বরং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে, কখনও বা কোনো দূর দেশের সঙ্গেও স্বার্থের সংঘাতকে জিইয়েই রেখেছে একথা অস্বীকার করা যায় না। ইরাকে আমেরিকার সাম্প্রতিক আচরণ বিশ্বভ্রাতৃত্বের সম্ভাবনাকে অত্যন্ত নীতিহীনভাবে আঘাত করেছে। জোর যার মুল্লুক তার—বর্বর যুগের এই নীতি আজও আমরা বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিয়ে কয়েক ধাপ পিছিয়ে গিয়েছি। সাম্যবাদীবা জাতীয়বাদকে খর্ব করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেওতো স্বপনেই মিলিয়ে গিয়েছে। কয়েকজন বিশ্বপ্রেমিক ভাবুক যত বড় আদর্শের কথাই বলে থাকুন না কেন, কোনো দেশই এখনও এই ব্যাপারে আমাদের সামনে অনুকরণযোগ্য কোনো দৃষ্টান্ত রাখতে পারছে না। ভিসা পাসপোর্ট ইমিগ্রেশানের কড়াকড়ি ইত্যাদি কাঁটাতার দিয়ে বিদেশীকে ঠেকাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। তাই তৃতীয় বিশ্বের এই আত্মকলহে জর্জর রাষ্ট্রে কসমোপলিট্যানিজমের চর্চা কে যে শুরু করবে, কি ভাবে করবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছিনা।

তবু আপৎকালেও—দুর্ভিক্ষে বা প্রকৃতিক দুর্বিপাকে—দূর দেশের অপরিচিত মানুষদের

জন্যও যে অনেকখানি মানবিক সহানুভূতি ও সাহায্যের মনোভাব দেখা যায় এটাও প্রশংসার ব্যাপার বই কি। ইথিওপিয়া কি বসনিয়ার অনাহার—ক্লিষ্ট মানুষের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে যখন স্কুলের ছেলেমেয়েরাও আহার সামগ্রী পাঠায় কিংবা ফিলিপাইন দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাতে সারা বিশ্বের মানুষ উদ্বিগ্ন বোধ করে তখন বিশ্বজনীন সহানুভূতির সামান্য ঐ আভাসটুকুতেই মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাভরসার ক্ষীণ রেশ জেগে থাকে।

এই ভাবে আশা জাগিয়ে রাখেন কিছু অসাধারণ মানুষও। এ্যালবার্ট শোয়াইৎজার কিংবা মাদার টেরিজার মতো ব্যক্তিরা দেশের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরে অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। খ্রিস্টান মিশনারীদের শতদোষের কথা শুনেও বলব যে বিশ্বমানবিকতার পরিচয় এই গোষ্ঠীর কাছ থেকে যতখানি পাওয়া যায় ততখানি আর কোনো গোষ্ঠীর কাছ থেকে পাওয়া যায় বলে তো মনে করতে পারছি না। মুমূর্ষুকে, কুষ্ঠ রোগীকে, পরিত্যক্ত উন্মাদিনীকে এরা যে ভাবে পথ থেকে তুলে আশ্রয় দিচ্ছেন, পরিচর্যা করছেন তেমন আর কে করছেন? তবু তাঁদের সম্বন্ধে কৃতঘ্ন বক্রোক্তি প্রায়ই শুনতে পাই।

এদেশে আমরা যারা পরিবারের গণ্ডী থেকে বার হয়ে পল্লীর মঙ্গলটুকুও চিন্তা করতে পারি না, আবর্জনার গাড়ি চলে যাবার পর নিজের সংসার পরিষ্কার করে জঞ্জালের পুঁটুলি অনায়াসে প্রতিবেশীর দুয়ারের সামনে রেখে আসি, আপৎকালীন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে কালোবাজারি করি, শিশুদের খাদ্যে ও প্রাণদায়ী ওষুধে ভেজাল মেশাই—এই আমরাই কী করে এক ধাপে বিশ্বমানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠব ভেবে পাই না। নেতারা পর্যন্ত পারিবারিক স্বার্থের উপরে উঠতে পারছেন না। এই ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা থেকে একেবারে বিশ্বজনীন পরার্থপরতায় উত্তরণ সম্ভব? প্রথমে কি দেশের প্রতি, জাতির প্রতি একটা দায়িত্ববোধ জাগানো দরকার নয়? তারপর হয়ত রয়ে সয়ে ধাপে ধাপে কসমোপলিট্যানিজমের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

এইবার আমি আমার প্রথম প্রশ্নে আসি। জাতীয়তাবাদ কি ভারতীয় সংহতির পথের কাঁটা? জাতীয়তাবাদ যদি সংকীর্ণ হিন্দুবাদ হয়ে ওঠে তবে তো কাঁটা হবেই। জাতীয়তার অর্থ যদি হয় হিন্দুতা তবে তাতে অহিন্দুর স্থান কোথায়? অবশ্য হিন্দুবাদীরা ঐ 'হিন্দু' শব্দটি নিয়ে বেশ ভেলকি খেলেন। সাধারণত হিন্দু বলতে তাঁরা সেই ধর্মসম্প্রদায়কে বোঝেন যাঁরা বেদপুরাণ গীতার শিক্ষার উপর তাদের জীবনাদর্শকে এবং বর্ণাশ্রমের উপর জীবনচর্যাকে গড়ে তুলেছেন। জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে আস্থাও অধিকাংশ হিন্দুর সামান্য লক্ষণ। এই যদি হিন্দুর অভিধা হয় তবে শিখ খ্রিস্টান মুসলমান তো বটেই এমন কি জৈন ও বৌদ্ধদেরও 'হিন্দু' বলা যায় না। তখন হিন্দুবাদীদের পক্ষে এইসব অহিন্দুকে গেলাও কঠিন হয়ে পড়ে, ফেলাও অসম্ভব ঠেকে। তাই তাঁরা তখন কথার ফেরে ভোলাতে চান। বলেন, হিন্দুর অর্থ ভারতীয়, যেমন হিন্দুস্থান আর হিন্দুস্থানীর অর্থ ভারত এবং ভারতীয় মানবগোষ্ঠী অথবা ভাষা! এই দ্বিতীয় অভিধাই যদি নিতে হয় তবে তো ভারতে জন্মালেই হিন্দু হওয়া যায়! তাহলে আবার এমন একচোখামি কেন করা হয় যে একদল যেন জন্মসূত্রেই হিন্দু ও দেশপ্রেমিক আর অন্য একদলকে চেষ্টাচরিত্র করে স্বভাবচরিত্র পালটে দেশপ্রেম শিখে হিন্দু হতে হবে?

যাইহোক হিন্দুবাদীদের এই কূটনৈতিক উদারতার সুযোগ নিয়ে বলি যে ভারতীয় মাত্রই যদি হিন্দু হয় তাহলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদও ভারতীয় সংহতির অন্তরায় নয়। তবু এই অর্থেও আমি উগ্র জাতীয়তাবাদকে বেশ ভয় করি এই কারণে যে যদি এই অহঙ্কারী জাতীয়তাবাদ স্বার্থোন্মাদ হয়ে ওঠে তাহলে সেটা ভিন্ন জাতি ভিন্ন দেশের পক্ষে বিপজ্জনক হবেই এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের অন্তরায় হবে। এই জন্যই আমি "গরব সে বোলো হম হিন্দু হ্যায়"-

কে রণহুঙ্কার, অতএব ভয়াবহ জ্ঞান করি।

কিন্তু নম্র একটি জাতীয়তাবোধের খুব প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়। কারণ ক্রমশ দূর থেকে দূরতর অনাত্মীয়কে ভালবাসার ক্ষমতা আয়ত্ত করা অত্যাবশ্যক। এই বোধের ভিতর দিয়ে, এই প্রেমের ভিতর দিয়ে প্রসারিত হয়েই ক্রমে একটি ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তা তার সম্প্রদায়কে, তার দেশকেও অতিক্রম করে বিশ্বমানবতাতে পৌঁছবার পথ করে নিতে পারে। উগ্র জাতীয়তাবাদ, "যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল সমস্ত নীচে তলাইয়া যায়", সেখানে বিশ্বভ্রাতৃত্বের কোনো স্থান নেই। কিন্তু জাতীয়তাবোধের সঙ্গে তো ঐ চিরন্তন মূল্যবোধের কোনো বিরোধ নেই ববং ঐ মূল্যবোধেই তার উৎস। তাই ক্রমপ্রসারণের এই চেতনা আপন পরিণামের বেগেই বিশ্বমানবতায় গিয়ে মিলতে পারবে বলে আমার ধারণা এবং মিলতে পারলেই তার সার্থকতা। এই বোধের মূলে আছে স্বগৃহকে পিছনে ফেলে ক্রমাগত দূরকে, অনাত্মীয়কে আপন করার চেষ্টা। বিশেষত এই দেশে যার আয়তন ও বৈচিত্র প্রায় একটি মহাদেশের মতো। নানা বর্ণ, নানা ভাষা, নানা ধর্মকে আত্মস্থ করেই বিবর্তিত হবে যে জাতীয়তার বোধ তাকে তো অনেকান্তবাদী হতেই হবে।

এর পরে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মনে হয় কঠিন হবে না। জাতীয়তাবাদকে যদি সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করি তাহলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অনিবার্যত জঙ্গী হিন্দুবাদ হয়ে উঠবেই। জঙ্গী হতে হবেই কারণ গৃহযুদ্ধ ছাড়া, বলপ্রয়োগ ছাড়া অহিন্দুকে হিন্দু করে ফেলা কিংবা ভারতবর্ষ থেকে দূর করে দেওয়া বা নিঃশেষ করে ফেলাও তো সম্ভব হবে না। হিটলার যেমন করে ইহুদী সমস্যার সমাধান করেছিল। তবে বালাসাহেব দেওরস আর বাল ঠাকরের পক্ষে ঐ চূড়ান্ত সমাধানটা তত সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। সম্প্রতি মহরম উপলক্ষ্যে পাড়ার মসজিদ থেকে এক রাত্রে ধর্মীয় আলোচনা সভায় একজনকে উদাত্ত কণ্ঠে গাইতে শোনা গেল।

"ছাড়ব না কোরান,
না ছাড়ব হিন্দুস্তান।"

জোর করে ছাড়াতে গেলে সে পথে গুপ্ত ঘাতকরা মারাত্মক মারণাস্ত্র বিছিয়ে রাখবেই। এই ভাবে সারা দেশটা রণক্ষেত্র হয়ে যাবে। এমন বিভীষিকাকে প্রত্যক্ষ করার পরেও কি আমরা অন্যপথের সন্ধান করব না?

ভারতীয় রাজনীতিকে হিন্দুবাদী করা আর হিন্দুবাদকে জঙ্গীবাদ করে তোলা যদি বা একজন সংকীর্ণচেতা, দূরদৃষ্টিহীন, আত্মহননে উৎসুক নেতার স্বপ্নবিলাস এবং আমরণ প্রয়াস ছিল তবু তা ব্যর্থ হবে বলেই আমার ধারণা। কারণ রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি তার চেয়ে অনেক বেশি বলেই আমি তাঁর উপরে আস্থা রাখি

"বর্তমান কালে হিঁদুয়ানীর পুনরুত্থানের যে একটা হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রথমে ওই অনৈক্যের ধূলা, সেই প্রাদেশিক ও ক্ষণিক তুচ্ছতাগুলিও উড়িয়া আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কারণ, সেইটেই অল্প ফুৎকারে আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে।

"কিন্তু এ ধূলা কাটিয়া যাইবে, আমাদের নিঃশ্বাসবায়ু বিশুদ্ধ হইবে, আমাদের চারিদিকের দৃশ্য উদঘাটিত হইবে—সন্দেহমাত্র নাই। আমাদের দেশের যাহা স্থায়ী, যাহা সারবান্, যাহা গভীর, যাহা আমাদের সকলের ঐক্যবন্ধনের উপায়, তাহাই ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।" (১৩০৫ বঙ্গাব্দ)

বিবিধের মাঝে মহান মিলনের ভাবনা কি শুধুই আত্মছলনা, কেবলই আলেয়া? সেই মহৎ সম্ভাবনা এখনও অনেকটা অনাবিষ্কৃত রয়ে গিয়েছে বটে। কিন্তু এই দিগ্ভ্রান্ত, দেশকে সেই লক্ষ্যে

নিয়ে যাবার মত বড় মাপের দিশারী কি সত্যিই দেখা দেবে না? তবে কি সেই চিরন্তন বাণীই আজকেও প্রতিটি ভারতবাসীকে পথ দেখাবে : আত্মদীপঃ ভব! যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে আত্মদীপ হতেই হয়। আর এহেন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে কি জঙ্গী জাতীয়তাবাদ চোখে ঠুলি পরাতে পারবে?

[সৌজন্যে : চতুরঙ্গ, শরৎ ১৪০০]

রুশদী, খোমেইনি এবং আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি

সলমন রুশদী "মিডনাইট্স্ চিলড্রেন" লিখে কেবল পৃথিবীর সাহিত্যরসিক সমাজে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু "দ্য সেটানিক ভার্সেজ" লেখার পর শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে সারা দুনিয়ায় অসংখ্য লোক তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন—অবশ্য বইটা না পড়েই প্রধানত। এমনটা যে হবে তা তিনি একেবারেই ভাবতে পারেন নি একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাঁর এই বই যে অনেকখানি উত্তেজনা এবং উত্তাপও সৃষ্টি করবে এবং প্রচুর বিকোবে, এ বিষয়ে তাঁর প্রকাশকরা যথেষ্ট নিশ্চিতি না পেলেও যে অমন একটা অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতেন একথা আমার অন্তত মনে হয় না। প্রকাশকরা কেউ-কেউ পাকা জহুরি বটে, কিন্তু তাঁদের কষ্টিপাথরে ঘষে যে সাচ্চা সোনার দাগ যাচাই করে নেন সেটি সর্বদা সাহিত্যের নান্দনিক মূল্য নয়।

তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে প্রকাশকরাও মোটামুটি বুঝতে পেরেছিলেন যে বেশ একটা গরম জিনিস ছাপতে যাচ্ছেন এবং রুশদীও ভালোই জানতেন কেমন মুখরোচক বস্তু বাজারে ছাড়ছেন। জন্মসূত্রে মুসলমান বলে নয়, ইসলাম ধর্মতত্ত্ব আর মুসলিম ইতিহাসের বুৎপন্ন ছাত্র হিসাবেই, তিনি যে বিষয়ে কলম ধরবার ঝুঁকি নিয়েছিলেন সে বিষয়ে তন্ন-তন্ন করে জেনেও নিয়েছিলেন। এর যথেষ্ট প্রমাণ তিনি তাঁর রচনায় দিয়েছেন। এই বিষয় নিয়ে তিনি কিছুকাল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন করেছেন বলেও শোনা যায়।

যে কারণেই হোক, পয়গম্বরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নেই। হজরৎ মহম্মদ যে-বাণীর বাহক সেই বাণীকেই শয়তানের উক্তি বলতে তিনি দ্বিধা করেন নি। পয়গম্বর যে বহু নারীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন—তা অনাথাকে আশ্রয় দেবার জন্যই হোক বা শত্রুগোষ্ঠীর সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন করার জন্যই হোক—এই ব্যাপারটিকেই রুশদীর এত অনৈতিক মনে হয়েছে যে এটা নিয়ে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ আর অরুচিকর কাহিনী রচনা করতে বাধে নি তাঁর। এইরকম একটা বিরূপ মনোভাব থেকেই তিনি স্বল্পাচ্ছাদিত ইতিহাসের যথেচ্ছ বিকৃত চেহারায় ইসলামের উদ্ভব ও বিকাশের কাহিনী পরিবেশন করেছেন তাঁর উপন্যাসে। বলা বাহুল্য, তিনি তাঁর পারিবারিক ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন।

পয়গম্বর, কোরান শরীফ এবং ইসলামের বিষয়ে তাঁর মনে যা-কিছু তীব্র সমালোচনা আছে সেসব নিয়ে সরাসরি প্রবন্ধ লিখে আক্রমণ করাটা তাঁর ধারা নয়। তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবে রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। আবার ঐতিহাসিক নামধাম বেশ খানিকটা রেখেও দিয়েছেন যাতে তাঁর আক্রমণের উদ্দিষ্ট যাঁরা তাঁদের সনাক্ত করা কঠিন না হয়। কোথাও বা নামধাম, কোথাও

ইতিহাস তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যেই বিকৃত করে নিয়েছেন। মোটকথা, তাঁর উপন্যাসের বিতর্কিত অধ্যায় দুটি থেকে যা কিছু উদ্ধৃতি আমি ইতস্তত দেখেছি তাতে ইসলামের বাণীবাহকের যে ধরনের সমালোচনা আছে তার ভাষা ও ভঙ্গির ইতরতা আমার পক্ষেও পীড়াদায়ক ঠেকেছে, যদিও আমি নাস্তিক মানুষ। এটাকে রুশদীর অসাধারণ সাহস বা দুঃসাহস যাই বলা হোক না কেন, একথাও বোধ হয় বলা যায় যে এই কাজ করে কতখানি বিপদের ঝুঁকি তিনি নিচ্ছিলেন তা বোধহয় সম্পূর্ণ নিজেও বুঝতে পারেন নি।

নয়তো খোমেইনির ধমকের প্রথম ধাক্কাতেই অতখানি বিচলিত বোধহয় হতেন না। তা ছাড়া, এই যে তিন-চার মাস ধরে পুলিশ প্রহরায় আত্মগোপন করে থাকতে হচ্ছে, এ তো সম্ভবত আজীবন চলবে। এতখানি যে প্রাণে বিপন্ন হবেন তা বুঝতে না পারার কারণ কি এই যে বহুকাল পশ্চিম দেশের পারমিসিভ সমাজে বাস করে অভ্যাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল? পরে, আক্ষরিক অর্থে প্রাণের দায়ে, দুঃখপ্রকাশ করে বলেছেন বটে যে কারুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। কিন্তু এটা স্পষ্টতই মিথ্যা কথা। ইসলামের ভিত্তি যে শাস্ত্র তাকেই তিনি শয়তানি গাথা বলেছেন এবং বলার একটা চতুর অনুষঙ্গও খুঁজে বার করেছেন। তাঁর অভিপ্রায়কে ভুল বোঝার কোনো ব্যাপার নেই। মহম্মদকে মেহাউন্ড আখ্যা দেওয়ায় তাঁর কোনো মৌলিকতা নেই ঠিকই, তবু পাছে কেউ এর আপত্তিকর তাৎপর্য সবটুকু ধরতে না পারে তাই তিনি আগ বাড়িয়ে বলে রেখেছেন,

'Blacks all chose to wear with pride the names they were given in scorn, likewise, our mountain-climbing, prophet-motivated solitary is to be the medieval baby-frightener, the Devil's synonym . Mahound

অর্থাৎ তিনি সচেতনভাবে সুকৌশলে যা করতে চেয়েছেন সেটাই মুসলমান সমাজও স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন। তাঁর শেষতম পুস্তকে যে পদাঘাতটি আছে তা যাঁদের গায়ে লাগবার তাঁদের গায়ে ঠিকই লেগেছে এবং তাঁরা সঙ্গতভাবেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং আরো অনেককে ক্ষুব্ধ আর উত্তেজিত করে তুলেছেন। রুশদী যতটা আশঙ্কা করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশিই ক্রুদ্ধ হয়েছেন এঁরা। সবচেয়ে বেশি এই ব্যাপারটাকে গুলিয়ে দিয়েছে লেখকের প্রতি এক ধর্মগুরুর মারাত্মক প্রাণদণ্ডের ঘোষণা। আগুন নিয়ে খেলা করতে গিয়ে অনেক সময়ই মনে থাকে না সেটা কত দূর ছড়াতে পারে।

খোমেইনি এমন একটা হৈ-চৈ তুলে না দিলে বেশি লোকে বইটা পড়ত না এটা হয়তো ঠিক। যারা পড়ত তারাও বিশেষ কেউ বুঝতে পারত না বলে যাঁরা বলছেন তাঁরা অনেকে দাবি করছেন যে রুশদীর অতি-বিদগ্ধ রচনাশৈলী আর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সাধারণের অধিগম্য নয়। কেউ বা এসে বললেন, রুশদী জেম্‌স্ জয়েসের উত্তরসূরী. .এক পাতা জুড়ে একটা বাক্য লেখেন' দুই লেখকের সম-মানের এমন অকাট্য যুক্তি শোনার পর মিডনাইট্‌স্ চিলড্রেন আর তাঁর প্রথম বই গ্রিমাস হাতের কাছে পেয়ে খুলে বসলাম। বুঝতে যথেষ্ট অসুবিধা না হওয়ায় অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলাম। তবে কি দুই প্রস্থ অর্থ আছে এই অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের? আর আমি উপরিতলেই ঠেকে গেছি? যাই হোক একটি বাক্যাংশ আমাকে চমৎকৃত করল · **'because in autobiography, as in all literature, what actually happened is less important than what the author can manage to persuade his audience to believe...'** এই তো! হাজার কথার এক কথা বলেছেন।

যে লেখক বা ভাবুক সমাজের অনুগামী নন, বরং অগ্রগামী—তিনি এমন কথা বলতেই পারেন যা চিরাচরিত সংস্কারকে আঘাত দেবে। কোনো লেখকের কতটা আঘাত করার নৈতিক

অধিকার আছে আর পাঠকের আঘাত গ্রহণ করার নৈতিক দায়িত্বও আছে—এইসব নিয়ে অন্তহীন বিতণ্ডার পরিপ্রেক্ষিতে জানা কথাটাই আর-একবার মনে করিয়ে রাখা যাক। পুরানো সংস্কারকে যাঁরা ভাঙতে চান, নূতন ভাবনাচিন্তা যাঁরা করেন, তাঁরা অনেকেই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক বহুজনের অভ্যস্ত এবং সযত্নলালিত বিশ্বাসে আর আচার-আচরণে আঘাত দিয়ে থাকেন। স্বয়ং পয়গম্বরও আঘাত দিয়েছিলেন, প্রত্যাঘাতও পেয়েছিলেন। তাঁর অনুসারীরাও কম আঘাত করেন নি প্রতিপক্ষকে। আরব-পারস্যের পূর্বতন ধর্মবিশ্বাস এবং দেবদেবীকে ধ্বংস করেই ইসলামের বৈপ্লবিক চিন্তার প্রসার ঘটেছিল, একথাও সবাই জানেন।

অর্থাৎ আঘাতমাত্রই সমাজের বা ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর নয়—কোনো-কোনো আঘাত প্রগতির পথ প্রশস্ত করে। আধমরাদের ঘা মেরেই নাকি বাঁচাতে হয়। এইসব কথা আমাদের নিতান্ত অজানা নয়, কিন্তু সব সময়ে মনে থাকে না। তাই বলে আবার সব আঘাতই দেহমনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হবে, এ দাবি তর্কশাস্ত্রের নিয়মেও টেঁকে না, বাস্তবেও তেমনটা ঘটে না। কোনো-কোনো ট্রমা কত মারাত্মক হয় সেও আমাদের জানা আছে। কতখানি আঘাত কিভাবে কোথায় দিলে উপকার হবে, শরীরমনের ক্ষতি করবে না, তা জানেন বিচক্ষণ থেরাপীস্ট। রুশদী তেমন থেরাপীস্ট বলে বেশি লোকের প্রতীতি জন্মায় নি। আচমকা কোমরবন্ধের নীচে আঘাত করে একটা উত্তেজনা এবং অনেকখানি অশান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এতে বুদ্ধির শুদ্ধি কতখানি হবে তা আমি এখনও বুঝতে পারছি না।

প্রতিতুলনায় আর্নাল্ড টয়েনবীর সেই রচনার কথা মনে পড়ছে যার জন্য স্টেট্স্ম্যান পত্রিকার আপিস আক্রান্ত হয়েছিল। কৌতূহল সত্ত্বেও এতদিনেও সেই রচনাটি স্বচক্ষে দেখতে পাই নি। তবে শুনেছি টয়েনবী নাকি তাঁর সেই প্রবন্ধে হজরত মহম্মদের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর তুলনা করে, কেন তিনি দ্বিতীয় জনের মত পথ ও চারিত্র্যের বেশি গুণগ্রাহী, সেই কথাটাই ব্যাখ্যা করে বলতে চেয়েছিলেন। এজাতীয় বক্তব্যে সব ধর্মপ্রাণ মুসলমানই একটু ক্ষুণ্ণ হতে পারেন এবং রাজনীতির ব্যাপারীরা এই ক্ষোভকে ব্যবহার করে অনেকখানি জল ঘোলা করার চেষ্টাও করতে পারে। তবু এই-জাতীয় রচনা যেহেতু বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ বা কটূক্তি নয়, সীরিয়স আলোচনা, তাই এ নিয়ে তন্নিষ্ঠ তাত্ত্বিক বিতর্কের সুযোগ থাকে। প্রতি পক্ষও কিছু যুক্তিতর্ক পেশ করে লেখকের প্রতিপাদ্যকে খণ্ডন করতে পারেন।

কিন্তু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা হয় শুধু লোককে খেপিয়ে দেবার জন্য, সুস্থ মত-বিনিময়ের জন্য নয়।

আবার রুশদী যখন বলেন তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির সঙ্গে ঐতিহাসিক বহু চরিত্রের ও নামের সাদৃশ্য নেহাত-ই আপতিক, তখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁর এই আত্মপক্ষসমর্থক উক্তি নিতান্তই কাপুরুষের মিথ্যাভাষণ। এই পর্যন্ত লিখতে-লিখতে খবর পাওয়া গেল আয়াতুল্লাহ খোমেইনির আজ মৃত্যু হয়েছে। তাঁর আত্মা যথার্জিত শান্তি লাভ করুক। কিন্তু তিনি তাঁর পিছনে আমাদের জন্য বিশেষ শান্তির সম্ভাবনা রেখে যান নি। তাঁর মৃত্যুর পরেও ধর্মান্ধ বা অর্থলুব্ধ ঘাতকের হাতে রুশদীর প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা কিছুমাত্র কমে নি।*

---

* পাছে এ বিষয়ে কারুর মনে কোনো অলীক প্রত্যাশা জাগে তাই আয়াতুল্লাহ্-র মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই ব্রিটেনের মুসলমান সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ড কলিম সিদ্দিকী ঘোষণা করে দিয়েছেন যে রুশদীর প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা এখনও বলবৎ রয়েছে। রুশদী যে ধর্মীয় আইন লঙ্ঘন করেছেন তার শাস্তি মৃত্যু। অর্থাৎ আয়াতুল্লাহ্ খোমেইনি চলে গেলেও হত্যার চেষ্টা চলছে, চলবে।

এই-জাতীয় কোনো ঘাতকের হাতে আত্মবলি না দিয়ে কেউ যদি আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েও থাকেন তবু তাঁর এই দুর্বল আচরণকে মানবিক দৃষ্টিতে কতখানি নিন্দা করা যায় তার আলোচনায় আমি যাব না। কিন্তু কেউ যখন সক্রেটিস কি ব্রুনোর আদর্শ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'রুশদী যদি সৎ লেখক হন তাহলে তাঁর রচনার প্রতিটি শব্দ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সমর্থন করে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করাই উচিত, আমি হলে তাই করতাম'—তখন বক্তাকে শুধু সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দেব যে এত বড়ো কথা বলার অধিকার শুধু তাঁরই জন্মায় যিনি বলবার জন্য আর বেঁচে থাকেন না।

যাই হোক, রুশদী-খোমেইনি নাটকের পরিপেক্ষিতে আমি আমার দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিটা বুঝবার চেষ্টা করছি। তাঁর বইখানা এদেশে নিষিদ্ধ করার আগে পর্যন্ত খুশবন্ত সিং ছাড়া আর কে কে সেই বই পড়েছিলেন জানি না। কিন্তু বইটা নিষিদ্ধ হতেই অগুনতি লোকের যে টনক নড়েছিল এবং বহু লোক পড়বার জন্য কৌতূহলী হয়েছিলেন, সে কথা ঠিক। বই নিষিদ্ধ করার ব্যাপারটা প্রথমে আমিও অনেকের মতোই খুব অপছন্দ করেছিলাম। দেশে অশান্তি এবং মধ্যপ্রাচ্যে অপ্রিয় হবার ভয়ে সরকার অব্‌স্‌কিউরান্‌টিস্টদের তোয়াজ করছেন বলে মনে হয়েছিল। (এ ব্যাপারে আমি ভোটের হিসেবটা তেমন বুঝতে পারি না—যদিও সরকারের প্রতি এই দোষারোপ অনেকেই এবং প্রায়ই করে থাকেন। সংখ্যালঘুদের মনরক্ষা করে যদি তাদের সব ভোট-ও পান তবু এই দেশের কোন্ সর্বভারতীয় দলের ইষ্টলাভ হবে, যদি তারই ফলে তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি যে সংখ্যাগুরু তাদের বিমুখ করেন?)

যাই হোক, নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে মত একটু পালটালাম যখন দেখলাম বোম্বাই অঞ্চলের বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী—যাঁদের অধিকাংশই অমুসলমান—রাজীব গান্ধীর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে একটি বিবৃতি ছাপলেন। তখন মনে হল বইটাতে বিস্ফোরক কী আছে জানা দরকার। অগত্যা যাঁরা বইটা পড়বার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের মতামত যেখানে যতটুকু হাতের কাছে পেলাম পড়ে দেখলাম। আমি স্বীকার করব যে কেবল সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বক্তব্য পড়েই আমার মনে হয়েছে যে ওই বইয়ের বিতর্কিত অংশটা তিনি ভালো করে পড়েছেন এবং সমস্তটা অনুষঙ্গ ধরতেও পেরেছেন। এদেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অন্য কারুর লেখা থেকেই আমার এ প্রত্যয় জন্মায় নি।

সেই সময় থেকেই লেখকের মতপ্রকাশের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা আর প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের সব রকম বই-ই অবাধে পড়বার নিরব্যূঢ় অধিকার ইত্যাদি নিয়ে বেশ একটা গণতান্ত্রিক দাবি উঠেছে এদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে। আবার রুশদী এবং তাঁর এই বইকে কোনো মতেই ওই স্বাধীনতা বা অধিকার যেন দেওয়া না হয় তার জন্য পালটা দাবিও জোরদার হয়েছে। দুই পক্ষের এই দাবিদারদের মাঝখান দিয়ে স্পষ্ট একটা সাম্প্রদায়িক সীমারেখা টানা যায় বললে বোধহয় অন্যায় বলা হয় না। রুশদীর নিন্দা কোন মুসলমানের মুখে শুনলেই অন্যপক্ষ নিশ্চিত হচ্ছেন, ইনিও তাহলে আর-সব মুসলমানের মতোই সাম্প্রদায়িক—সম্ভবত মৌলবাদের সমর্থক! আবার যখনই কোনো হিন্দু রুশদীর সমর্থনে মুখ খুলছেন অমনি তাঁর সম্বন্ধে অপর পক্ষের ধারণা জন্মাচ্ছে, ইনিও তাহলে সব হিন্দুর মতোই মুসলমানের হেনস্থায় খুশি হন...তাদের দিকটা সহানুভূতির সঙ্গে দেখবার মতো মন নেই। ইদানীং কালে রুশদীর চেয়ে বড়ো অন্য কোনো বিভাজক দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মানুষের মাঝখানে লক্ষ করি নি।

রুশদীর সমর্থকদের বক্তব্য অবশ্য ম্যাস মিডিয়াতে—বিশেষ করে পত্রিকাতেই—বেশি পেয়েছি...অন্য পক্ষের কথা মুখে বেশি শুনতে পাই। কারণ এদেশের ম্যাস মিডিয়া তাঁদের হাতে

তেমন নেই। এঁরা অনেকেই এসে বলছেন যে যাঁরা লেখকের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত কোমর বেঁধেছেন তাঁদের আসল উৎসাহের বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ততটা নয়। এঁরা বেশির ভাগই ইসলামের কুৎসা ও মুসলমানের অপমানে চিরদিনই আনন্দ পান বলেই এই বই নিয়ে এত মাতামাতি করছেন। যদি নিরপেক্ষভাবে সবারই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করবার জন্য এঁরা উৎসুক হতেন তাহলে "নাইন আওয়ার্স টু রাম" কিংবা "রাম রিটোলড" কিংবা "ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য"-ও অবাধে পড়বার অধিকার অর্জন করবার জন্য তাঁরা কোনো আন্দোলন কেন ইতিপূর্বে করেন নি? হিন্দু সমাজ যদি এতই বেশি সমালোচনা-সহিষ্ণু এবং উদার-দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তাহলে আজও ওইসব বইয়ের উপরে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে কী করে? আপনি আচরি ধর্ম পরে শিখাইবে। ওই সব লেখকেরা রুশদীর তুল্য নামী দামী নন বলেই এবং তাবৎ দুনিয়া ওঁদের হয়ে লড়তে এগিয়ে আসেনি বলেই তো ওঁদের রচনা প্রকাশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসা উচিত ছিল ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের!

আমি তাঁদের এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারি নি। উক্ত বইগুলির অন্তত একটির উপর থেকেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে দেখা যাক না হিন্দু সমাজের গার্জিয়ানরা কী বলেন! কিংবা ড. আম্বেদকরের যে বই ("রিডল্স অব হিন্দুইজম্?") মহারাষ্ট্র সরকার ছাপতে রাজি হয়েও এখন হিন্দু মৌলবাদীদের ভয়ে গড়িমসি করছেন, সাপের ছুঁচো গেলার দশায় রয়েছেন বেশ কিছুকাল যাবৎ, সে বইখানি যাতে অখণ্ডিত আকারে অবিলম্বে ছাপা হয় এই দাবিতে একটা আন্দোলন করুন না কেন উচ্চবর্ণের বুদ্ধিজীবীরা? এই দায়িত্ব কেবল দলিতদের উপরেই বর্তেছে কেন?

পাঁচ ছয় মাস ধরে রুশদীর বই নিয়ে শিক্ষিতসমাজে যে স্পষ্ট দুটি সাম্প্রদায়িক শিবির হয়ে গিয়েছে, এর পিছনেও আছে দেশের সামগ্রিক সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির জের। ইদানীং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে রামজনমভূমি আর বাবরি মসজিদের প্রবক্তারা জেদা-জেদি করে যেখানে নামিয়ে এনেছে তাতে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস আবার যেমন তুঙ্গে উঠেছে। ফলে রুশদীর প্রাণদণ্ড ঘোষণায় একদিকে নৈতিক ধিক্কার যেমন সোচ্চার, অন্যদিকে নৈতিক প্রশ্রয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরব হলেও সুস্পষ্ট। দুই পক্ষের প্রতিক্রিয়ায় এই বিরাট বৈষম্যের কারণ বুঝবার জন্য অন্য একটা ব্যাপারের দিকেও একটু দৃষ্টি দিতে হবে।

ইরানের আয়াতুল্লাহ্ খোমেইনি শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানই সুন্নী। এঁদের শ্রদ্ধা ও সমর্থন সাধারণভাবে আয়াতুল্লাহ্-র পক্ষে তেমন যাবার কথা নয়। বিশেষত এই আয়াতুল্লাহ্ যেভাবে সুন্নী ইরাকের সঙ্গে ৮ বৎসর ধরে একটা প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী লড়াই চালিয়ে এসেছেন এবং নিতান্ত অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে বিষ গেলার মতো করে সন্ধি স্বীকার করেছেন তাতে তাঁর প্রতি ভারতীয় মুসলমানের বিরাগ যথেষ্ট প্রবল হবারই কথা ছিল।

কিন্তু আয়াতুল্লাহ্ শিয়া বা সুন্নী যাই হোন না কেন, তিনি বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসেও আর একবার ইরানে একটি আদি ও অকৃত্রিম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন, স্বৈরাচারী শাহ এবং তাঁর পশ্চিমী আধুনিকতাকে দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। অর্থাৎ যে পরিমাণে তিনি বিশুদ্ধ ইসলামের মূলে প্রত্যাবর্তন করার চেষ্টা করছিলেন, কোরান শরীফের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র ও সমাজকে পরিচালনা করতে চেষ্টা করছিলেন, সেই পরিমাণেই গোষ্ঠী নিরপেক্ষভাবে সব ধর্মোৎসাহী মুসলমানেরই সমর্থন লাভ করছিলেন। মৌলবাদের একটা আদর্শগত আকর্ষণ তো থাকেই—শুদ্ধতায় ফিরে যাবার একটা আনন্দময় প্রত্যাশা! কিন্তু একদেশদর্শী গোঁড়ামি আর আপোসহীন নিষ্ঠুরতাই মৌলবাদকে ভয়াবহ করে তোলে

কার্যক্ষেত্রে। তাই বাস্তবে দেখা গেল অগণিত হত্যার বিভীষিকায় অন্ধকার, রক্তপিচ্ছিল পথে যখন বিশুদ্ধ ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করছিলেন খোমেইনি তখন অমুসলমানের চোখে খোমেইনির ভয়াল ভাবমূর্তি আর মৌলবাদের নঞর্থক দিকটাই বড়ো হয়ে উঠছিল। কিন্তু আমার মনে হয় এদেশের বহু মুসলমানের চোখে—শিয়া সম্প্রদায়ের বাইরেও—খোমেইনির ভাবচ্ছবি অমন অবিমিশ্র কালো নয়।

খোমেইনি সম্বন্ধে তাঁদের ফতোয়া সম্বন্ধেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির এই মৌলিক পার্থক্য আছে বলেই তাঁর ফতোয়া সম্বন্ধেও নির্দ্বিধ নিন্দাও যেমন ভারতীয় মুসলমানের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না, তেমনি সামান্যতম সমর্থনও অমুসলমানের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা বাতুলতা। খোমেইনির এই প্রাণদণ্ডের ব্যাপারটা এই সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে না গেলে রুশদীর রচনায় মুসলমান সমাজের বেদনাকে একটু সহানুভূতির সঙ্গে সম্ভবত অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন হিন্দুসমাজ। তা তো হয়নি নি, ববং উলটে মুসলমানের আগ্রাসী চরিত্র বিষয়ে হিন্দুর মনে যে বদ্ধমূল একটা ধারণা আছে তাকেই আরো প্রবল কবেছেন আয়াতুল্লাহ্ খোমেইনি। ঘটনাচক্রে আবার রুশদী সংক্রান্ত ব্যাপারে সুন্নী জগতের কোনো প্রতিক্রিয়া প্রচারিত হবার আগেই শিয়া পারস্যের প্রতিক্রিয়া যেন আণবিক বোমার মতো ফেটে পড়ল। ফলে এই ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানরাও মতামত গঠন করার বেলায সেখান থেকেই সংকেত গ্রহণ করলেন। ইমাম বুখারির মতো ধর্মীয় নেতাও বলে বসলেন যে আয়াতুল্লাহ্-র বাণী ঈশ্বরের বাণী। এই নির্দেশ ভারতীয় মুসলমানেব উপকার করে নি।

এদিকে খোমেইনি এভাবে প্রাণদণ্ড ঘোষণা করার অল্পকাল পরেই কিন্তু রিয়াধে অনুষ্ঠিত ৪৬টি মুসলিম রাষ্ট্রের বিদেশমন্ত্রী-সম্মেলনে খোমেইনির ফতোয়াকে ইসলামবিরোধী বলে নিন্দা করা হল। ইরান বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও রুশদীর ব্যাপারটাকে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হল না, প্রধানত মিশর ও সৌদি আরবের প্রতিকূলতায়। এই ঘটনাটিকেই সংবাদ হিসেবে এদেশে এবং সর্বদেশের পত্রপত্রিকায় অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভালো খবরের চেয়ে চাঞ্চল্যকর আর অরুচিকর খবরকে আজও তাবৎ দুনিয়ার সাংবাদিক মহল অনেক বেশি প্রশ্রয় দেন...তাই নিয়ে নাচানাচি করেন এবং পাঠককুলকেও মাতিয়ে তোলেন। এই ব্যাপারেও একটা গ্রেশাম্স্ ল কাজ করে। খবরের কাগজের পাতা থেকে মন্দ খবর ভালো খবরকে হটিয়ে দেয়।

বলা বাহুল্য ধর্মগুরু হলেও খোমেইনি যে তড়ি-ঘড়ি হুঙ্কার ছেড়েছিলেন ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য সেটিও তেমন ধর্মবোধে নয়। নিজের দেশের আভ্যন্তরীণ রীজনীতিতে এবং সারা মুসলিম জাহানে তাঁর হৃতস্থান পুনরুদ্ধারের অভিলাষও ছিল ষোলো আনা—একথা সবাই বলেছেন। আবার মুসলিম দেশগুলির পররাষ্ট্র-মন্ত্রী-সম্মেলনে এই ব্যাপারটাকে যে সরাসরি তাচ্ছিল্য করা হল তার পিছনেও রাজনীতিক রেষারেষি ছিল অনেকখানি। সে যাই হোক, তাতে অন্তত ভালো বই মন্দ হয় নি। এদিকে ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেন বলেছেন, রুশদীর বইয়ের চেয়েও ইসলামের অনেক বেশি ক্ষতি করেছে আয়াতুল্লাহ্-ব এই হিংসাত্মক ঘোষণা আর তার অব্যবহিত পরবর্তী শোরগোল। কিন্তু এসব সুবুদ্ধির কথা এদেশে পৌঁছবার আগেই কাশ্মীরে তাণ্ডব হয়ে গেল, বোম্বাইয়ে রুশদীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে গিয়ে অনেকের প্রাণ গেল।

পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়ে লেখককে প্রাণদণ্ডদানের মতো বর্বরতার যে নিন্দা করবেন ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়—এটা তাঁদের সমগ্র মানসিকতার বিচারে যেমন স্বাভাবিক,

ভারতীয় মুসলমানও যে তা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হবেন এটাও তাঁদের পরিস্থিতির বিবেচনায় তেমনি স্বাভাবিক। আবার এরই ফলে অনেকেরই মনে হচ্ছে যে আধুনিক উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সপক্ষে গেলেন হিন্দুরা এবং মধ্যযুগীয় স্বৈরতান্ত্রিক-ধর্মতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার পক্ষে পড়ে রইলেন মুসলমানরা। পরস্পরের মানসিক দূরত্ব এই কয় মাসে আরো অনেকটা বেড়ে গেল।

অথচ রুশদীর রচনা মুসলমানকে কী ভাবে এবং কত দূর আহত করেছে সেটা হিন্দুরা পুরোপুরি জানেনও না, আপাতত জানবার মতো মনও নেই—কিন্তু জানার প্রয়োজন ছিল। তাই মুসলমানের এহেন ক্ষোভ ও ক্রোধের ঔচিত্যও উপলব্ধি করতে পারছেন না হিন্দু-সম্প্রদায়। হিন্দুধর্ম কোনো একটি শাস্ত্র-নির্ভর নয়। তবু কথায়-কথায় বলা হয়, 'এতে কি বেদ অশুদ্ধ হয়ে গেল?' অর্থাৎ যে কর্ম করলে বেদ অশুদ্ধ হয় তা নিতান্তই গর্হিত ও অকরণীয়। বেদকে অস্বীকার করে যেসব ধর্মের উত্থান ঘটেছিল এদেশে তাদের প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রোষ কোন্ সীমায় পৌঁচেছিল স্মরণ করুন। বৌদ্ধধর্ম পাহাড়, সমুদ্র ডিঙিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। আজকের নববৌদ্ধদের প্রতি হিন্দুসমাজের মনোভাবও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা নয়।

প্রতিতুলনায় ইসলামধর্ম কিন্তু ওই একটিমাত্র শাস্ত্র-নির্ভর। যাঁরা কোরান শরীফকে ঈশ্বরের বাণী বলে মানেন এবং তাঁদের জীবনচর্যার একমাত্র নিরিখ বলে জ্ঞান করেন তাঁদের যদি হঠাৎ বলা হয় ওটা নিতান্তই শয়তানের উক্তি, তাহলে তাঁদের পায়ের তলা থেকে একেবারেই মাটি সরে যায় না কি? ধর্মকে হারিয়ে সলমন রুশদীর হৃদয়ে শুনেছি একটা ফুটো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুসলমান সমাজ যে একেবারে অতল গহ্বরে পড়ে যান..কুটোটিও ধরবার থাকে না, কোরান শরীফ হারালে; অতএব তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে এর বিরুদ্ধে লড়বেন, এটা কি অপ্রত্যাশিত? কোনো শাস্ত্রই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় একথা আমি সর্বান্তঃকরণে মানি বলেই উলটো কথাটাও বলতে কোনো সঙ্কোচ নেই যে কোনো শাস্ত্রকেই এমন সর্বতোভাবে কলমের এক খোঁচায় বাতিলও করে দেওয়া যায় না। কোন্ শাস্ত্রের কতটা রাখব কতটা ফেলব তার ঝাড়াই-বাছাই যুক্তির কুলো পেতে যদি করা হয় তাতে আমার অন্তত আপত্তি নেই। আমার মনে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে তখনই যখন দেখি যুক্তির জায়গা জুড়ে বসেছে ব্যঙ্গবিদ্রূপ আর অশ্লীল ইঙ্গিত।

কাইরোর এক সুন্নীসম্প্রদায়ভুক্ত ইসলামতত্ত্বজ্ঞ অত্যন্ত উদারভাবে আহ্বান জানিয়েছেন যেন রুশদীর বক্তব্যের ভ্রান্তি দেখিয়ে দিয়ে আর-একটি পুস্তক রচনা করা হয়। এ-জাতীয় প্রস্তাব আরো বহু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীও করেছেন। যেহেতু 'ভ্রান্ত মত নিরসনের ওটাই সভ্যজনস্বীকৃত মানবিক পথ'।... ওই পথেই চিন্তার নানা ধারা পরস্পরকে খণ্ডন ও পূরণ করে এগিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে একটি উপাদেয় মত পেশ করেছেন একজন আফ্রিকান বুদ্ধিজীবী, আলী এ মায্‌রুই, যিনি এখন কর্নেল ও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর মতে রুশদী যেহেতু তাত্ত্বিক প্রবন্ধের বই লেখেন নি, একটি কল্পকথাসম্বলিত উপন্যাস লিখেছেন, তাই তাঁকে যথাযোগ্য জবাব দেবার জন্য আর খ্রীষ্টান বুদ্ধিজীবী মহলের পরমতসহিষ্ণুতা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আর একটি উপন্যাস লিখতে হয় :

'The real equivalent of comparative blasphemy would be in portraying the Virgin Mary as a prostitute, and Jesus as the son of one of her sexual clients. Also comparable would be any novel based on the thesis that the twelve apostles were Jesus's homosexual lovers and the Last Supper was their last sexual orgy together. It would be interesting to speculate which ones of the leading writers would march in porcession in defense of the

"rights" of such a novelist.'

আলবার্তো মোরাভিয়া, আর্থার মিলার, সল বেলো, গ্রাহাম গ্রীন ইত্যাদি হাজারখানেক লেখকের কেউই আলী মায়রুই-এর সঙ্গে বিতর্কে বা উত্তর-প্রত্যুত্তরে প্রবৃত্ত হয়েছেন বলে শুনি নি। হলেও এহেন বিকার গ্রস্ত কিন্তু উর্বর মস্তিষ্কের কাদা-ছোড়াছুড়ির ফলে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ের যে অপূর্ব বিকাশ দেখা যাবে তার প্রতি আমার কোনো স্পৃহা নেই। আমার যে বন্ধুর সাথে এই নিয়ে মাঝে-মাঝেই তর্কবিতর্ক হয়েছে তিনিও বলেছেন, 'গালাগাল দেওয়া আর সাহিত্য রচনা এক জিনিস নয়। সাহিত্য রচনা একটা স্বতন্ত্র ক্ষেত্র।' তবে তিনি হয়তো মানতে চাইবেন না যে রুশদীর রচনার অন্তত ঐ অংশটা গালাগাল, সাহিত্য রচনা নয়।

কোনো সংশোধনই সম্ভব নয় যখন তাতে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা যুক্ত না হয়—তা ব্যক্তিরই হোক, সমাজেরই হোক বা ধর্মেরই হোক। সমাজবদলের হাতিয়ার হিসাবে মার্কসবাদের উত্থান আর পতন এক জন্মেই দেখতে হবে—এ আমাদের অনেকেরই সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। বরং আমাদের কিশোর বয়সে এইরকম একটা প্রত্যাশা ছিল যে লোভ মাৎসর্য স্বার্থপরতা, প্রভুত্বকামিতা ইত্যাদি মানুষের স্বভাবে যত মৌলিক দুর্বলতা রয়েছে তার থেকেও উত্তরণ সম্ভব হবে মার্কসবাদী বিপ্লবের সাহায্যে। এখন প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে দেখছি আর যে উপায়েই হোক সেটা পরীক্ষাসাপেক্ষ হলেও এটা আর প্রমাণিত হতে বাকি নেই যে ডাণ্ডা মেরে মনুষ্যচরিত্রের সত্যিকারের সংশোধন সম্ভব নয়। মনুষ্যত্বের উন্নয়নে সহিংস বিপ্লবের সামর্থ্য কতটুকু তার পরিমাপ করা হয়ে যাচ্ছে বিংশ শতাব্দীতেই—আমাদের চোখের সামনেই। হিংসাত্মক বাক্যই কি লক্ষ্যবেধ করতে পারবে?

তা ছাড়া আমরা আশা করেছিলাম বিজ্ঞান আর মার্কসবাদের কল্যাণে ধর্মমূঢ়তা কিছুটা দূর হবে। বিংশ শতাব্দী এদিক দিয়েও আমাদের স্বপ্নভঙ্গের কাল...সব মোহমুক্তি ঘটে চলেছে দ্রুত। বিজ্ঞানই যখন যুক্তির প্রসারে ব্যর্থ হয়েছে তখন প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্তির সম্পর্ক যদি ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের মতো হয়ে দাঁড়ায় তাহলে অবাক হবার কী আছে? প্রযুক্তির জাদুকাঠির স্পর্শে বহিরঙ্গে যত আধুনিকতা, অন্দরমহলে কোনো আলো যেন পৌঁছয় না—সেখানে হাজার-হাজার বৎসরের অযৌক্তিক অন্ধকার।

মাঝে-মাঝে কোনো বন্ধু এসে বলেন, 'ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে মুসলমানের অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা কাটিয়ে উঠবার সময় এসেছে একথা স্বীকার করেন তো?' ইসলামের চোদ্দ শত বৎসরের ইতিহাসে কত যে প্রতিবাদী স্বব উঠেছে এবং কেমন করে ধর্ম ও সমাজকে প্রভাবিত করেছে তার আমিই বা কতটুকু জানি যে অন্যকে জ্ঞান দেব! অগত্যা তাঁদের কথা অস্বীকার না করেই প্রশ্ন করি, অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠান এবং বিশ্বাস বিষয়েও হিন্দুর স্পর্শকাতরতা কতখানি সে খেয়াল আছে কি? ক-জন তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত সংস্কারমুক্ত হিন্দু সন্তান আজও সর্বজনসমক্ষে স্বীকার করতে সাহস করবেন, 'সম্প্রতি আমার পিতা গত হয়েছেন, কিন্তু আমার মাকে আমি নিরামিষ আহার ইত্যাদি কৃচ্ছ্রতা পালন থেকে বিরত করেছি—তিনি মাছ মাংস আহার করেন!' আবার আমার তরুণী সহকর্মিণী অধ্যাপিকাদের মধ্যেও দেখি বিজ্ঞানে উচ্চতম ডিগ্রীধারিণীরাও সন্তোষী মায়ের, লুণ্ঠনষষ্ঠীর, শীতলষষ্ঠীর ব্রত পালন ক'রে পরম আত্মসন্তুষ্ট। তা ছাড়া অসংখ্য দীক্ষাগুরু তো আছেনই। এ নিয়ে তর্ক ফাঁদতে গেলে প্রায় মনোমালিন্য ঘটে। এ নাকি ঐতিহ্যে পা রেখে দাঁড়ানোর স্বাস্থ্যকর প্রয়াস। শাহবানুর লাঞ্ছনায় শরীয়তপন্থীদের বহু ধিক্কার দিয়েছিলাম। রূপ কানোয়ার মূক করে দিয়ে গিয়েছে আমাকে। সতীপ্রথা-সমর্থক শঙ্করাচার্যদের নববিধানের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন ক-জন বুদ্ধিজীবী? ধর্মের অনন্ত রহস্য

অনুধাবনের পর আর তাঁদের অবসর কই? ব্যাপার হচ্ছে সংখ্যাগুরুর গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অসহিষ্ণুতা, স্পর্শকাতরতা অনেক বেশি ব্যাপ্ত বলেই চোখে সেগুলি স্বাভাবিক লাগে আর সংখ্যালঘুরটা এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাঝে-মধ্যে দেখতে পাই বলে চোখে বড়ো বেমানান ঠেকে।

আবার হিংসার কথাতেই ফিরে আসি। আমাদের পলকা সাম্প্রদায়িক শান্তি পাছে ভেঙে পড়ে এই ভয়ে ভারত সরকার "দ্য সেটানিক ভার্সেজ"কে নিষিদ্ধ করেছেন এবং কারণটাও অকপটে স্বীকার করেছেন এটা ভালো। এই সাবধানতাকে সরকারের অহেতুক ভীরুতা যাঁরা মনে করেন তাঁরা তর্কের খাতিরে এই কথাও বলেছেন, 'কই, এত করেও কি সংখ্যালঘুর মন পাওয়া গেল? হিংসাকে ঠেকানো গেল কাশ্মীরে? বোম্বাইয়ে?' প্রথমত বলব, হ্যাঁ পাওয়া গিয়েছে, সরকারের এই সময়োচিত সাবধানতায় মুসলমান সমাজ সত্যিই সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই! আবার কাশ্মীর কি বোম্বাইয়ে যারা রাজনৈতিক ফায়দা করে নেবার চেষ্টা করেছিল এই সুযোগে, তাদের আন্দোলনকে শক্ত হাতে দমন করবার নৈতিক অধিকারও সরকার সেজন্যই অর্জন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও একদল বিরক্ত এই কারণে যে আদৌ ভারতবর্ষে কোথাও কোনো প্রতিবাদ উঠল কেন—আগেভাগে বইটাকে ঠেকিয়েও দাঙ্গাকে ঠেকানো গেল না কেন! এঁরা বুঝেও না বোঝার ভান করছেন যে বইটি নিষিদ্ধ না করলে এইরকম দাঙ্গা সারাদেশব্যাপী হবার আশঙ্কা ছিল যা সামলানো সত্যিই কঠিন হত সরকারের পক্ষে। আর সাবধান হওয়া সত্ত্বেও যদি ছোটোখাটো অপঘাত ঘটে থাকে তবে তার দোষ সাবধানতায় বর্তায় না। কোনো যুক্তিতেই বলা যায় না যে এত অতিরিক্ত সাবধান না হলে এমনটাও ঘটত না।

এর বিপক্ষে একদল বলছেন, ভারতবর্ষে এই বই নিষিদ্ধ হয়েছে তো কী হয়েছে, সারা বিশ্বে তো হয় নি। যেসব দেশে হয় নি সেসব দেশের বিরুদ্ধে... অন্তত তাদের দূতাবাসের সামনে প্রতিবাদ জানাবার গণতান্ত্রিক অধিকার ভারত সরকারের দেওয়া উচিত ছিল। আমি বলব, ছিল না। যে বড়ো অশান্তির আশঙ্কায় ভারত সরকার অধিকাংশ নাগরিকের এই বইটি পড়ার অধিকার হরণ করেছেন, ঠিক ওই যুক্তিতেই কিছুসংখ্যক নাগরিকের প্রতিবাদ জানাবার এই গণতান্ত্রিক অধিকারও হরণ করাটা অনৈতিক হয় নি বলেই আমি মনে করি। সরকারের যেমন দায়িত্ব আছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে এমনতর সব প্ররোচনাকে ঠেকানো, তেমনি বোম্বাইয়ে যাঁরা প্রতিবাদ করার পরিকল্পনা করছিলেন তাঁদেরও ভাবা উচিত ছিল যে এই প্রতিবাদ অশান্তির সুযোগসন্ধানীদের কতখানি প্ররোচনা জোগাতে পারে। শিবসেনা আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের ঘাঁটিতে বসে আগুন নিয়ে খেলা কি শুধুই নিরবুদ্ধিতা, না অন্য কিছু?

হিংসার কথাটা সারা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতেও ভাবা দরকার। মুসলমান সমাজের কেউ-কেউ মনে করেন খোমেইনির এই হুমকিতে খুব কাজ হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের কাছে সবিনয়ে আবেদন-নিবেদন করেও মুসলমান সমাজ সুবিচার বা সমাধান পান নি। কারণ খ্রীষ্টান আর মুসলমানের রেষারেষি সেই ক্রুসেডের কাল থেকেই চলেছে। তাই মুসলমানের প্রতি তাদের বিদ্বেষ অবজ্ঞা আর ঈর্ষার মূল আছে বহু গভীরে। খ্রীষ্টান দেশগুলি এখন সলমন রুশদীকে ভালো হাতিয়ার পেয়েছে মুসলমানদের হেনস্থা করবার জন্য। তাই এই সুযোগ তারা ছাড়বে কেন? রুশদীর বই ইংল্যান্ডে নিষিদ্ধ করা কিংবা ইংল্যান্ডের ধর্মদ্রোহিতা আইনের আওতা একটু প্রসারিত করে ইসলাম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মেরও স্পর্শকাতর দিকগুলিকে রক্ষা করার আবেদনে ব্রিটিশ সরকার কর্ণপাত করেন নি। এই পরিস্থিতিতে খোমেইনির হুমকিতেই তবু

কিছুটা সংযত হয়েছে লেখক প্রকাশক বিক্রেতারা! শুধু ইংল্যান্ডে কেন, কোথাওই বইটা খোলাখুলিভাবে বিক্রি করতে সাহস করছে না খোমেইনির অনুসারীরা দু-চার জায়গায় বোমা ফেলার পর এবং বোমা ফেলা হবে এই ভয় দেখানোর পর থেকেও।

এই যুক্তি মনকে বড় বিষণ্ণ করে। আয়াতুল্লাহ-র হুমকির আওতায় তো অসংখ্য মানুষ এসে পড়েছে ক্রমেই—শুধু রুশদী, তাঁর প্রকাশক আর বিক্রেতারাই নয়। বেলজিয়ামের সবচেয়ে বড় মসজিদের টিউনিসীয় ইমাম এবং তাঁর সৌদী আরবীয় সহকারীকেও ব্রাসেল্‌সের মসজিদেই হত্যা করা হয়েছে যেহেতু ঐ ইমাম দূরদর্শনের কোনো অনুষ্ঠানে নাকি বলেছিলেন যে খোমেইনির প্রাণদণ্ড দেওয়ার হুমকি অনুচিত কাজ হয়েছে। সুইডেন-প্রবাসী এক পাকিস্তানি যেহেতু ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি বইখানা উর্দুভাষায় অনুবাদ করা স্থির করেছেন তাই তাঁকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে তাঁর মালয়শীয় প্রতিবেশীকে হত্যা করা হল সম্প্রতি স্টকহোমে। এসব কি সমর্থন করা যায়? চোখ রাঙিয়ে, মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে সত্যিই কি কোনো ভাবনাকে ঠেকানো যায়? বরং ওতেই তো প্রতিস্পর্ধা বাড়ে। এই কারণেও যাঁরা মৃত্যু বরণ করবেন তাঁরাও তো অন্য পক্ষের শহীদ হবেন। রুশদী যদি নিহত হন তাহলে বাক্‌-স্বাধীনতার মহৎ আদর্শের জন্য তিনি আত্মবলিদান করলেন বলে তাঁকে আরও বেশি সম্মান দেওয়া হবে, তাঁর বই আরো বহু মানুষ বহুকাল ধরে পড়বেন। মোটেই সে সব পুড়িয়ে ফেলা হবে না।

তা ছাড়া, হত্যা আর হিংসার একচেটিয়া এক্তিয়ার কি শুধু মুসলমানেরই আছে? অন্যরা কি নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়েই থাকবে? লনডনের বৃহত্তম মসজিদে বোমা ফেলেছিল এক যুবক ২২শে ফেব্রুয়ারিতে। এই সাইপ্রাস-দেশীয় যুবকটি এখন ইংল্যান্ডের নাগরিক। সে নাকি আদালতে অপরাধ স্বীকার করে বলেছে যে স্বাধীনতা হরণ করার জন্য যারা হত্যার ভয় দেখাচ্ছে তাদের শিক্ষা দেবার জন্য এটি স্বাধীনতার সপক্ষে তার লড়াই। বিচারপতি অবশ্য তাকে বুঝিয়ে বলেছেন যে হিংসার জবাবে আরো হিংসা করলে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যায় না—তাতে কেবল অরাজকতা বাড়ে।

কেউ-কেউ রুশদীর প্রাণদণ্ড বিষয়ে কাব্য করে বলেছেন, যে-তীর ছোঁড়া হয়ে গিয়েছে, তাতে রুশদীর নাম লেখা আছে। একদিন না একদিন কোথাও না কোথাও ওই তীর তাঁকে বিদ্ধ করবেই। ব্রিটিশ পুলিশের সাধ্য নেই তাঁকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে, মরতে তাঁকে হবেই। এই প্রত্যাশায় যাঁরা পুলকিত হচ্ছেন তাঁদের কাছে নিবেদন করি, সলমন রুশদীর যেদিন ঘাতকের হাতে মৃত্যু হবে সেই দিনটা মুসলমানের গর্ব করার নয়, লজ্জা পাবার দিন হবে। সব অমুসলমানের চোখে সেদিন তারা খানিকটা নীচে নেমে যাবে। কোনো মহৎ আদর্শেরই সত্যিকারের শক্তি পেশীতে নয়, পিস্তলে নয়—শক্তি থাকে তার উদার মানবিকতায়। হজরৎ মহম্মদের জ্যোতি এবং ইসলামের মাহাত্ম্য আপন শক্তিতেই চিরস্থায়ী হবে। এমন দুর্দিন কি সত্যিই এসেছে যে ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষের কীর্তিকে রক্ষা করবার জন্য ভাড়াটে ঘাতকের প্রয়োজন হবে?

[সৌজন্যে : চতুরঙ্গ, জুলাই ১৯৮৯]

অলোকা

অলোকা কাঁড়ার নামটি এখন আর নিতান্ত অপরিচিত নয়। মানশ্রী গ্রামের পিপলস ইনস্টিটিউট ফর রুরাল এ্যাকশন কাজ শুরু করেছিল স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মানবাধিকার অর্জন করবার জন্য। এখন এঁদের কাজের সিংহভাগ নির্যাতিতা মেয়েদের নিয়েই চলেছে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। আমাদের গ্রামীণ মেয়েরাই তো সবচেয়ে অধিকার-বঞ্চিতা।

অলোকা ও তাঁর সহকর্মীদের কর্মক্ষেত্রটির সঙ্গে আমাদের শহুরে লোকের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রায় নেই বললেই চলে। অবাধ্য বৌকে গলায় রড চেপে ধরে শায়েস্তা করা, ১৭ বছর বয়সে তিন সন্তানের অসুস্থ মাকে ওঝা ডেকে ভূত ছাড়াতে গিয়ে স্রেফ ঝাঁটাপেটা করে মেরে ফেলা, বয়স্কা মেয়েদের কখনও ডাইনী কখনও ছেলে ধরা অপবাদ দিয়ে সর্বসমক্ষে বিবস্ত্রা করে পিটিয়ে বা পুড়িয়ে মারা—এ সবই নিত্যদিনের ঘটনা।

এর প্রতিকার করতে গিয়ে অলোকারা হত্যার হুমকি কিংবা জঘন্য অপবাদে আর বিচলিত হন না। মাঝে মাঝেই ক্রুদ্ধ বীর পুরুষরা এঁদের চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে সবার সামনে অপমান করে, শ্লীলতাহানি এমনকি ধর্ষণের চেষ্টাও করে। তবু এঁরা দল বেঁধে থানায় গিয়ে ধন্না দেন, প্রশাসনের উপরতলায় আবেদন নিবেদন করেন, কোর্টে গিয়ে সুবিচারের প্রত্যাশায় শত শত মামলা দায়ের করেন। মাঝে মাঝে প্রতিকার করতে সক্ষম হন এ কথাও সত্য। তাই অল্পে অল্পে তাঁদের উপর মানুষের আস্থা বাড়ছে।

এঁদের কর্মক্ষেত্রের বিশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ২২টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিদেশি অর্থের সাহায্যে কাজ করে চলেছে। আর এঁদের সঙ্গতি মাত্র কয়েক বিঘা জমি। ঐ জমি কৃষক পরিবারের এই মহিলারা নিজেরাই চাষ করেন। আবার এঁদের কাজ যাদের স্বার্থে আঘাত করে তারা এসে এঁদের ফসল নষ্ট করে, পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মেরে ফেলে, জমি বেদখল করার ষড়যন্ত্র করে।

তবু এঁরা লড়াই করে চলেছেন। এঁদের পায়ের তলায় যত স্বল্পই হোক, নিজেদের শক্ত জমি আছে। তাই এখনও এঁরা মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে আছেন।

[সৌজন্যে : শ্রমণ পত্রিকা]

গল্প

কবন্ধ

শীতের পড়ন্ত বেলা। পিঠের উপর মিঠে রোদ। সবুজ ঘাস থেকে একটা ঠাণ্ডা আমেজ উঠে এসে সমস্ত শরীর-মনকে যেন আদর করছিল। খোলা মাঠে কী একটা অনুষ্ঠান চলছিল। সারি-সারি স্টীলের ফোলডিং চেয়ার অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো। হালকা নীলরঙের চেয়ারগুলি চোখকে আরাম দিচ্ছিল। অবশ্য সারি ভেঙে কোথাও-কোথাও চেয়ারগুলিকে কিছুটা এলোমেলো করে দিয়েছিল দর্শকরা। যে যার সুবিধামতন এদিক ওদিক টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

তখন বোধহয় একটু বিরতি চলছিল। তাই অনেকেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল, হাতপায়ের আড়ষ্টতা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল কেউ-কেউ...কেউ-বা পরিচিত জনকে খুঁজে পেয়ে নীচু গলায় কথা বলছিল। সব নিয়ে বেশ একটা সুন্দর সংযত পরিবেশ। অথচ কী যে ঘটছিল সামনের দিকে সেটা কিন্তু মনে নেই।

আমি প্রথম থেকেই একা বসেছিলাম, তখনও একাই বসে রইলাম। বাঁ পায়ের উপর ডান পাটি তুলে সেই হাঁটুর উপর অলস হাত দুটো জড়ো করে রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, অন্যমনস্ক। নিজের মনেই কী জানি কী ভাবছিলাম। আমার সারির দক্ষিণ প্রান্তের একেবারে শেষ চেয়ারটি বেছে নিয়ে বসেছিলাম আমি! পারতপক্ষে দুপাশে দুজন অচেনা লোক নিয়ে বসতে আর কার ভালো লাগে? তবে আমার বাঁ দিকেও কয়েকটা চেয়ার তখন পর্যন্ত শূন্য ছিল।...সে ক'টাকে ছেড়ে খানিক দূরে জনাকয় বসেছিল, অস্পষ্ট মনে পড়ছে। পায়ের কাছে ঘাসের উপর নামিয়ে রেখেছিলাম আমার পেটমোটা ব্যাগটা...ব্যাগ তো নয়, বলা যায় একটা হোলড-অল। ব্যাগের উপর আমার মেটেরঙের গুর্জরা শালটাও পাট করে রেখে দিয়েছিলাম...গায়ে দেবার মতন ঠাণ্ডা তখনও পড়ে নি।

বসে থেকে-থেকেই হঠাৎ আমার ঘোর কেটে গিয়েছিল। অস্পষ্ট ঠুনঠান ধাতব একটা শব্দ শুনে সামান্য একটু ঘাড় বেঁকিয়েই টের পেয়েছিলাম যে আমার পিছনের সারি বেয়ে বাঁ-দিক থেকে কেউ যেন এগিয়ে আসছিল, ঠিক আমার পাশের চেয়ারটিকেই লক্ষ্য করে। অনেক সময় কিছু না ভেবেই মানুষ যেমন করে থাকে, আমি তেমনি নিজের চেয়ারটা কয়েক ইঞ্চি আরো ডাইনে সরিয়ে নিয়েছিলাম। আগন্তুকের মনে হতে পারত তার পথ একটু প্রশস্ত করে দেবার জন্যেই সরে গিয়েছিলাম। আসলে হয়তো নিজের দূরত্বটুকু সযত্নে সুরক্ষিত করার জন্যই ওইরকম করেছিলাম। আমার পাশের চেয়ারের পিছনটিতে এসে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে তারপর পিঠের দিক থেকে যখন এক-পা এক-পা করে নবাগত মানুষটি এগিয়ে এসে বসতে যাচ্ছিল তখন আমার চোখে পড়েছিল যে তার চলাটা স্বাভাবিক নয়...একটা কাঠ কাঠ ভাব...কৃত্রিম পায়ের উপর হাঁটলে যেমন দেখায় আর কী! চেয়ারটাকে খানিক সুবিধাজনকভাবে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল সেই লোকটি...স্বভাবতই আমার নজর চলে গিয়েছিল তার মুখের দিকে। এখন বুঝতে পারছি যে যতটা চমকে ওঠা উচিত ছিল ততটা কিন্তু চমকাই নি প্রথমে। একটু অবাক হয়েছিলাম মাত্র।

তাই যখন দেখলাম নবাগত মানুষটির মাথাটাই নেই কো মোটে...সেখানে একটা ছোট্টমতন ফ্যান ঘুরছে তখন কিন্তু ব্যাপারটা বিশেষ তেমন ভয়াবহ ঠেকে নি প্রথমে। নীচু সিলিঙওয়ালা ঘরে অনেক সময় ওইরকম ছোটো ফ্যান দেয়ালে গাঁথা থাকে, ব্লেডগুলি বিঘতখানেক লম্বা,

কিন্তু কোনো তারের কেসিং ছিল না ওগুলিকে ঢেকে। দুষ্টু ছেলেপুলের কথা ভেবে বরং একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। মনে-মনে আমিও ওই চলন্ত পাখার কাছে একটা আঙুল বাড়াতে গিয়ে চট করে সরিয়ে নিয়েছিলাম। স্পীড কম হলে কী হবে! আঙুলেব ডগাটা কুচ করে কেটে উড়িয়ে না দিক, অন্তত একটা জোড় মট করে ভেঙে ফেলবে ঠিক। তাই ভাবছিলাম বলি (মাস্টারনীর স্বভাব যাবে কোথায়) যে, হোক না কাঁধের উপর চাপানো, তবু ওইরকম আঢাকা রাখা উচিত নয় ব্লেডগুলি।

যাই হোক, কারুর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকাটা সভ্যতা নয়। তা ছাড়া, অন্যেরা কী মনে করছে ওকে দেখে সেটাও দেখবার জন্য চারদিকে নজর ঘুরিয়ে আনলাম একবার। কী আশ্চর্য। আর কেউই যেন অদ্ভুত কিছু লক্ষ করে নি মনে হল। করলে কি আশেপাশে সবাই এমন নির্বিকার হয়ে থাকতে পারত?...আমার মাথায় তখন নানারকম ভাবনা আসছিল।...হয়তো কোনো অ্যাকসিডেনটে মাথাটি হারিয়েছেন ভদ্রলোক।...হয়তো দেহকে চালু রাখার জন্য এটাই সার্জারির আধুনিকতম উদ্ভাবন। এদিকে কিন্তু খেয়াল ছিল যে দুর্ঘটনায় যারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারায় তাদের প্রতি ভয়, বিস্ময় কি বিরাগ প্রকাশ করা অমানবিক। তাই মুখের ভাব যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টায় একবার শুধু ঢোক গিলেছিলাম। তারপর আর কিছু ভাববার আগেই হাওয়ায় হিশহিশ করে কথা ভেসে এসেছিল আমাকে চমকে দিয়ে,

"এখানে বসতে পারি?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই"—না ভেবেই এরকম জবাব মানুষ দিয়ে থাকে সৌজন্য প্রকাশ করতে।

অমনি কাঠ-কাঠ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে 'মানুষ'টি এসে ধপ করে চেয়ারের উপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। চেয়ারটাও ক্যাঁক করে ঘাসে দেবে গিয়েছিল একটুখানি। তখন একবার মনে হয়েছিল, এ কি মানুষ না একটা যন্ত্র! হালকা গোলাপি রঙের সুতি শ্যার্টের ভিতর থেকে কাঁধ-বুক-পিঠের ঋজুরেখার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল যেন একটা টিনের বাকস কাপড় দিয়ে ঢাকা। কিন্তু মুখে আমি কৌতূহলের বদলে একটা সহানুভূতির ভাব ধরে রাখার চেষ্টা করছিলাম। অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য নড়েচড়ে বসেছিলাম নিজের চেয়ারেই...একবার শাড়ির আঁচলটা কাঁধের উপর গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলাম...যদিও অবশ্য কটকি তসরের ভারী শাড়ি মোটেই খসে-খসে পড়ে যাচ্ছিল না। বুঝতে পারছিলাম যে আমার মতন প্রবীণা একজন মহিলাও অস্বস্তিতে পড়লে তরুণীদের মতনই অর্থহীন চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে পারে।

নিজেকে একটু বাগে এনে ভাগ্যহীন মানুষটির সঙ্গে সামান্য সৌজন্য বিনিময় করার চেষ্টায় একটু হেসে আবার তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে আর একবার হোঁচট খেয়েছিলাম। ঘুরন্ত পাখার ডানার সঙ্গে কী করে স্মিতহাস্য বিনিময় করা যায় সে এক সমস্যা! পাখা অবশ্য খুব জোরে ঘুরছিল না...মনে হচ্ছিল যেন এক নম্বরের চেয়েও কম স্পীড। কিন্তু পাখা তো পাখাই...চোখ নয়, ঠোঁট নয়। সেদিকে তাকিয়ে থেকে-থেকে শেষ পর্যন্ত বোধ হয় আমার মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গিয়েছিল।

তবু খানিক পরে মনে হয়েছিল যে আমার সৌজন্য প্রকাশের চেষ্টা যেন পাশের মানুষটির একেবারে অগোচরে থাকে নি। সেজন্যই সম্ভবত আবার ফিশ-ফাশ কথা ভেসে এসেছিল,

"বেশ গরম আজ, তাই না?"

হাঁ-সূচক অল্প একটু মাথা নেড়ে মাথাটা ঘুরিয়ে আশপাশটা দেখে নিয়েছিলাম চট করে। মনে হল না যে কেউ লক্ষ করছে আমার পাশেই ভীষণ অদ্ভুত কিছু ঘটছে একটা। এদিকে আমি কিন্তু ক্রমেই আরো ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। পাখার অভাবে কিংবা পাখার পাশে, এমন-কী

পাখার তলায় বসেও মানুষ 'আহ্ কী গরম' বলে অহরহ অভিযোগ করে ঠিকই, কিন্তু পাখা নিজে কখনও গরম বলে অভিযোগ করে এমন কথা কেউ কখনও শুনেছে? আর এই ক্ষেত্রে পাখাটি পাশে এসে বসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমার তো বেশ মোলয়েম শীতই লাগছিল। তার পর থেকেই বরং ঘামতে শুরু করেছিলাম। একটু-একটু করে যতই ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছিলাম ততই কানমাথা গরম হয়ে উঠছিল।

তবু উপর-উপর অবিচলতা বজায় রাখার জন্য নিজের নখের রঙ পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছিলাম ডাক্তারি নিষ্ঠার সঙ্গে। তা ছাড়া নার্সারি স্কুলের টিচারদের মতন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নখ যথেষ্ট পরিষ্কার কিনা, শিগগিরই কাটা দরকার কিনা—এসব প্রয়োজনীয় বিষয়েও অবহিত হওয়া দরকার মনে হচ্ছিল তখনই। কিন্তু তারই ফাঁকে আড়চোখে দেখতে পেয়েছিলাম পাশে-বসে-থাকা মানুষটির পা দুটি ধীরে-ধীরে সামনের দিকে প্রসারিত হচ্ছিল, তার ট্রাউজার্সের রঙ ছিল চীনেবাদামের খোলার মতন। গোলাপি পর্পলিনের আস্তিন দুটি হাঁটুর কাছে এগিয়ে এসে সযত্নে যেন চিমটি কেটে ট্রাউজার্সের কাপড় সামান্য তুলে ধরে একটু আলগা করে পা দুটিকে অবাধে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছিল। তখন তার হাত দুটির দিকে চোরা নজর পড়ায় আবার চমকে গিয়েছিলাম। দুটি হাত নয়, দশটি আঙুলও নয়। বলা যায় এক ধরনের দুটি স্টীলের চিমটে যেন। প্রত্যেকটি 'হাতেই' একটি করে স্টীলের বুড়ো আঙুল মতন ছিল, আর ছিল সব ক'টি আঙুল একত্র করলে যেমন দেখায় তেমনি একটি ইস্পাতের বাঁকানো পাত...হাতছানি দেবার সময় চারটা আঙুল জুড়ে গেলে যেমন হয় ঠিক সেইরকম। ওই 'হাত'-দুটিই হাঁটুর কাছে নেমে এসেছিল. .আর পা'দুটি সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। তখন দেখতে পেয়েছিলাম পায়ের জুতোর রঙও ওই ট্রাউজার্সেরই মতন। কর্ডুরয়ের অমন আরামদায়ক জুতো-জোড়া এদেশী বলে মনে হচ্ছিল না।

এর পর হাওয়ায় যা ফিশফিশানি ভেসে এল তাতে আমার বুক হিম হয়ে গিয়েছিল। শোনা গেল,

'অনেকক্ষণ থেকেই তোমাকে দেখতে পেয়েছি, কিন্তু ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে পারছিলাম না।...'

'তোমাকে!' আমি তো ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। পাখার ব্লেডের বয়স বোঝা যায় না ঠিকই, কিন্তু পোশাক-আশাক দেখে তো তাকে ছোকরাই মনে হয়েছিল...তিন কুড়ি বয়সের লোক মোটেই মনে হয় নি। অবশ্য আজকাল বুড়ি-ছুঁড়ি বুড়ো-গুঁড়ো সবাই একই রকম পোশাক পরছে। তবু আমার মতন একজন প্রৌঢ়া আর ভীষণদর্শনা হেড-মিসট্রেসকে 'তুমি' বলার সাহস হবে প্রথম আলাপেই! এতে আমি বেশ বিমূঢ় বোধ করতে শুরু করেছিলাম। তা ছাড়া, আমার কাছে আসার জন্য এত ব্যগ্রতার কারণটাই বা কী?—সেটাও ভালো ঠেকছিল না মোটে। এতক্ষণ তো ঘামছিলাম—এবার মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল।

সন্তর্পণে ঘাড়টা একটু কাত করে বাঁ পাশে ওর দিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছিলাম ব্যাপারটা কী! কিন্তু ঘুরন্ত পাখাটাও ওই সময়েই নিজের বাঁ দিকে ফিরে কী যেন দেখছিল একটু ঝুঁকে। তারপর দেখলাম ওর বাঁ কাঁধে ঝোলানো একটা শান ব্যাগে হাত দুটো কী যেন খুঁজছিল। খানিক বাদে বাঁ-হাতে একটা নোটবই আর ঝকঝকে ক্রস পেনসিল উঠে এসেছিল...আরও খানিক খোঁজাখুঁজির পর ডান হাতে উঠেছিল একটা চকোলেটের বড়োসড়ো স্ল্যাব। আমি তখন তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। তাও কি অব্যাহতি পাওয়া গেল? মনে-মনে ভাবছিলাম, প্রেস রিপোর্টার নাকি কোনো কাগজের? কথাটা কিন্তু উচ্চারণ করি নি। অথচ উত্তর

চলে এসেছিল,

"হ্যাঁ আমি এখন নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টার।"

শুনে তো আমি জমে বরফ। কিন্তু কপালে যে ঘাম জমছিল তাও বুঝতে পারছিলাম—অথচ আঁচলটা তুলে যে ঘাম পুছব, তাও হাত সরছিল না। হাত পা যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল। কাঠ হয়ে বসে ভাবছিলাম যে কিছু ভাবাও তাহলে চলবে না? 'ভাবব না' কথাটা ভাবা চলবে কি? প্রচণ্ড অস্বস্তিতে আমার তখন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ আমার দিকে সেই বিলিতি চকোলেটের যতটা এগিয়ে এসেছিল এবং সেই সঙ্গে আমার গলা শুকিয়ে-দেওয়া ফিশফিশ কথা,

"প্লীজ একটুখানি নাও--"

প্লীজই বটে! এমন প্লেজারের অভিজ্ঞতা যেন জীবনে আর কোনোদিন না হয়। কিছুক্ষণ যে নিতে ইতস্তত করছিলাম সেটা হাতখানা তুলতে পারছিলাম না বলেও। ভয়-জমে-যাওয়া তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে শেষে কোনোক্রমে কোল থেকে তুলে এনে চকোলেটের প্রান্তে ঠেকিয়েছিলাম। ভেঙে নেবার অনুৎসাহটা ব্যাখ্যা করে বলেও ছিলাম প্রায় ওইরকম ফিশফিশ স্বরে,

'এখন কি আর চকোলেট খাবার বয়স আছে?'

'আমার আছে আর তোমার নেই?'—শুনে আমি চেয়ার থেকে উলটে পড়ি আর কী। ঠকঠক করে হাত কাঁপছিল বলেই বোধ হয় ছোট্ট এক টুকরো চকোলেট আমার চেষ্টা ছাড়াই মট করে ভেঙে আমার দুই আঙুলের মাঝে উঠে এল...এসেও কয়েক সেকেন্ড ধরে কাঁপতেই থাকল...আর আমি হাঁ করে বসে থাকলাম...ওটা মুখ পর্যন্ত তুলে আনতে পারছিলাম না।

চেয়ার থেকে যে পড়ে যাই নি তার একমাত্র কারণ, এই যে, কিশোর বয়স থেকেই ভয়কে জয় করবার চেষ্টা করতাম আমাদের প্রজন্মের কিছু মেয়ে। আমাদের ছিল সবলা হবার সাধনা। সেই সময়ে রেডিওতে "মহিলা মহল" অনুষ্ঠানের গোড়ায় গান হত 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরই অপমান।' শুনে সবল নারীত্বের অভিমানে আমাদের বুক ভরে উঠত।

তবু এই সবলার মুখে কোনো কথা জোগায় নি ওই মুহূর্তে। সবটুকু চেষ্টাকে একত্র করে বহুকষ্টে চকোলেটের টুকরোটা মুখে পুরে দিয়েছিলাম। তাতে বিশ্রী সিগারেটের গন্ধ পেয়েও অবিকৃত মুখে চুষতে চেষ্টা করছিলাম। এদিকে চোখে কিন্তু ঝাপসা দেখছিলাম, চোখের পাতাদুটি পর্যন্ত ঘামে ভিজে গিয়ে চশমার কাচে বাষ্প জমে উঠছিল, গরমের দিনে রান্না করার সময় যেমন হয়।

যেন অনেক অনেকক্ষণ পর একটু-একটু করে ঘাড়টা সামান্য ঘুরিয়ে দেখতে চেষ্টা করছিলাম ও কী করছে। দেখা গেল, খুশখুশ করে স্টীলের মসৃণ পেনসিলটা নোট বুকের উপর হাঁটছে...হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল একটা চিমটে! আমার চোখ সেখানেই আটকে রয়ে গিয়েছিল। সারা শরীরে ভীষণ অস্বস্তি ছিল. প্রায় অস্থিরতা, কিংবা বলা চলে অব্যক্ত কিন্তু তীব্র একটা ইচ্ছার তাড়না ছিল দেহের সবকটি পেশীতে। মনের অন্তঃস্থলেও ইচ্ছাটা উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ক্রমে সর্বাঙ্গে ঐ একটা ইচ্ছাই নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ছিল...যে করেই হোক পালাতে হবে। অথচ এদিকে পা-দুটো তো মাটিতে এঁটে গিয়েছে...হয়তো সবুজ ঘাসও গজিয়ে গিয়েছে তার উপর।

তারপর এক সময়ে দেখতে পেলাম নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টার লেখার স্পীড কমিয়ে ফেলেছে, একটু সাহস পেয়ে তখন সন্তর্পণে আমার মাথাটা আবো একটু কাত করে ওর 'মুখের'

দিকে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম যে পাখার স্পীড আগের চেয়েও কমে গিয়েছে। মনে হচ্ছিল অপেক্ষা করে থাকলে বোধ হয় দেখতে পাব একটু-একটু করে দুটোই থেমে যাবে। গেলও তাই। আমি তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই ডান হাতের চিমটেটা 'কলমসহ কেমন যেন উলটে গেল হাত ওলটানোর ভঙ্গিতে। ভাবছে? না ঘুমিয়ে পড়েছে? মাথাটাও কাজ করছে না মনে হল...পাখাটা যখন থেমে গেছে। একটু পরেই টের পাওয়া গেল বাঁ পাশ থেকে বাকসর মতন কিছু একটা কাত হয়ে এসে আমার কাঁধে ঠেকছে একটু একটু করে...যেন ঘুমে ঢলে পড়ছিল আমার ওপর। কী ভারী আর শক্ত মনে হয়েছিল বাকসটা...আমার কাঁধ ব্যথা করতে লেগেছিল।

আর না! কী করে কোথা থেকে যে আমার হাতে-পায়ে বল ফিরে এসেছিল জানি না। সাবধানে নিজেকে বাকসর তলা থেকে সরিয়ে এনে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কী ভাগ্য ঘাসের উপর চেয়ার ঠেললে শব্দ হয় না! কিন্তু তবু নীচু হয়ে ব্যাগটা তুলে নিতে-নিতেই টের পেয়েছিলাম যে বাক্‌সটাও যেন চটকা ভেঙে সোজা হয়ে উঠে বসেছিল নিজের চেয়ারের উপর। আমার শালটা ব্যাগ থেকে গড়িয়ে ঘাসে পড়ে গিয়েছিল। সেটাও তুলে নেবার তর সইল না। কিন্তু হাওয়া খুব তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করে ছিল, 'কী ব্যাপার? হঠাৎ চললে কোথায়?'

আর চললে কোথায়! আমি তখন উড়তে পারলে উড়ি। কে বলে আমার হাঁটুতে আর্থরাইটিস...আমি প্রায় তখন রেসের ঘোড়া। পাগলের মতন একরোখা ছুটছিলাম কোনো দিকে না তাকিয়ে...মাঠঘাট পেরিয়ে ছুটছিলাম...অন্তত ছুটতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, ক্রমেই মনে হচ্ছিল আমি যেন আর পারছি না। স্বপ্নে যেমন পায়ে-পায়ে জড়িয়ে যায়, পা নড়বড়ে হয়ে যায়, আমারও তেমনি হয়ে যাচ্ছিল। হাঁটু দুটো লগবগে রবারের তৈরি বলে মনে হচ্ছিল। প্রাণের দায়ে মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে-ছুটতে একটা পিচঢালা পথের কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। সেখানে এসে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই ভাগ্যক্রমে একটা বাসও এসে থেমেছিল একেবারে আমার সামনেই। আমি পড়িমরি করে উঠে পড়েছিলাম। বাসটা স্টেশানের দিকে যাচ্ছিল। আমি উঠতেই ছেড়ে দিয়েছিল।

'বাব্বাঃ বাঁচলাম' বলে আমার আঁচল তুলে কপাল ঘাড় মুখ মুছতে-মুছতে একবার মনে হয়েছিল, কী হাস্যকব ব্যাপার! এই বয়সে এই দেহ নিয়ে ত্রস্ত কিশোরীর মতন ছোটা! কী বেমানান দেখাচ্ছিল নিশ্চয়ই, দেখাক্ গে, কেই বা দেখছিল! চশমাটাও মুছে নিয়ে চোখে পরে বাসের জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাতেই ভরসাটা আবার ধসে পড়েছিল যেন। স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম একটা খটখটে মূর্তি খটাশ-খটাশ করতে-করতে ছুটে আসছিল লম্বা-লম্বা পায়ে, যেন রণপার উপর ছুটছিল। তার মাথাটা...না, পাখাটা বাঁই-বাঁই করে ঘুরছিল। হায়-হায়, এ তো আমার পিছু ছাড়বে না। অবশ্য তখনও বেশ দূরে ছিল.. আমার বাসটাকে ধরবার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। তবু বাসটা যদি আলোর বেগে ছুটতে ছুটতে একেবারে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পার হয়ে যেতে পারত, তবেই হয়তো স্বস্তি পেতাম আমি।...

স্টেশানে এসে নেমেই একটা ট্রেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুব ভরসা পেয়েছিলাম। টিকিট কাটতে কিছুই প্রায় সময় লাগে নি। বেছে-বেছে একটা ভিড়ে ঠাসা কমপার্টমেনটে উঠেছিলাম। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। আলো জ্বলে উঠতেই মুখটা যথাসম্ভব আড়াল করবাব জন্য মাথায় আঁচল তুলে দিয়েছিলাম। মিনিট তিন-চার পরে ট্রেনটা নড়ে উঠলে বুকের উপর থেকে একটা বোঝা নেমে গিয়েছিল। আমার ঠিক পরের বাসটাই যদি ধরতে পেরেও থাকে তবু এই ট্রেন ধরতে পারে নি কিছুতেই। এইটুকু সময়ের মধ্যে এসে পৌঁছনো কিছুতেই সম্ভব নয়।

মনকে এইভাবে ভরসা দিয়ে কামবার এক কোণে ঠায় বসেছিলাম। ট্রেন সারারাত ধরে চলল। একটু তন্দ্রা, একটু জাগরণ, একটু স্বস্তি, অনেকটা ভয়—সব মিলিয়ে কেমন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল আমার চৈতন্যে। তারপর ট্রেন যখন এসে টারমিনাসে থেমে গিয়েছিল তখন গা ঝাড়া দিয়ে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছিলাম। গলা বার করে দেখে মনে হয়েছিল হাওড়া স্টেশান। যে যার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নামবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমিও আমার ব্যাগটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম...তখন মনে পড়ল গুর্জরা শালটা হারিয়ে এসেছি...বুকের ভিতরটায় একটু হায়-হায় করে উঠেছিল...ভারি সুন্দর শালটা...সুশীলা দিয়েছিল। যারা আগেভাগে নামবার জন্য ব্যস্ত তাদের পথ করে দিয়ে ধীরেসুস্থে নেমেছিলাম। কুনুই দিয়ে ঠেলে পথ করে নিতে আমার ভালো লাগে না। নেমে হাতের ব্যাগটা দোলাতে-দোলাতে প্ল্যাটফর্মে যখন হাঁটছিলাম তখন চোখে অনিদ্রার জ্বালা থাকলেও মনটা হালকা লাগছিল! আর-একটা নূতন দিনের আলোয় আগের দিনের ভয়টা কেমন অলীক অবাস্তব লাগছিল। ভাবতে-ভাবতে চলেছিলাম যে ট্যাকসি নেব না বাস নেব।

কিন্তু স্টেশানের বাইরে এসেই সামনে একটা খালি ট্যাকসি দেখে খুশি হয়ে তাই নিয়ে নিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে স্নান করে একটু শুয়ে নিতে ইচ্ছা করছিল। ট্যাকসির দরজাটা বন্ধ করে তার শব্দে বেশ একটা স্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু যেই ড্রাইভারকে বলতে যাচ্ছি কোথায় যাব অমনি একটা তীক্ষ্ণ শিশ শুনতে পেয়ে সেই শব্দের দিকে তাকিয়েই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল আর একবার...আবার সেই কবন্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম একটু দূরেই। ট্যাকসিটা চলতে শুরু করেই দিয়েছিল, ততক্ষণে স্টেশানের চত্বর পার হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। উলটো দিকের ভিড় ঠেলে একটা ঘুরন্ত পাখা মানুষের কাঁধে চড়ে ছুটে আসছিল আমারই ট্যাকসিটার দিকে...তার হিশহিশ ডাকও শুনতে পেয়েছিলাম আমি,...'শোনো,...শোনো,...থামো...থামো।' আমি থামি নি, আমি আর কিছু শুনতে চাই নি।

তখন আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার আর কিছুতেই পরিত্রাণ নেই। এতদূর পর্যন্ত কী করে পৌঁছাল? মনে তো হচ্ছিল যে আগেভাগেই ওখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল স্টেশনের বাইরে আমাকে ধরবে বলে।...কিন্তু সেটা সম্ভব হল কী করে? এতটা পথ কি দূর পাল্লার বাসে চলে এসেছে সারা রাত ধরে? কী জানি, আমি আর ভাবতে পারছিলাম না শুধু ঠিক করে নিয়েছিলাম যে এই বিপদ পিঠে নিয়ে আর বাড়ি যাওয়া চলবে না...সেখানে তো কোনো শক্তসমর্থ পুরুষ নেই যে ওটাকে ঠেকাতে পারে। ট্যাকসিটাকে খানিক ঘুরপথে নিয়ে গিয়ে সমরদের হাউসিঙ কমপ্লেকসের একেবারে সামনে গিয়ে নেমেছিলাম। বিপদে আপদে ওরা তিন ভাই-ই আমার ভরসা। ট্যাকসির ভাড়া চুকিয়ে কোনোরকমে ছুটে গিয়ে লিফটে উঠেছিলাম। আবার ভেবেছিলাম লিফটম্যানকে বলি, একটা অদ্ভুত মতন লোক যদি এসে জিজ্ঞেস করে আমি কোন্ অ্যাপার্টমেনটে ঢুকছি তবে যেন বলে না দেয়।...কিন্তু বলি বলি করেও লজ্জায় বলতে পারলাম না...আর কতক্ষণই বা সময় পেলাম বেসমেনট থেকে আটতলায় উঠে আসতে-আসতে! এই বয়সে আমার মতন একজন প্রৌঢ়া মহিলার পেছন-পেছন একটা হতভাগা ছুটে আসছে। কুকুরের মতন শুঁকতে-শুঁকতে...বলা যায় এই কথাটা কাউকে? আর ভয়ে গলা তো কাঠ হয়েই ছিল।...কোনো ক্রমে "এইট্থ্ ফ্লোর" ছাড়া আর কিছু গলা দিয়ে বার হয় নি।

লিফট থেকে অ্যাপার্টমেনটের দরজা দশ হাত দূরেও নয়...মনে হচ্ছিল যেন অনেক-অনেক দূর। সর্বশক্তি দিয়ে বেলটা টিপে ধরে দরজায় মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম...এমন কাঁপছিল সারা শরীর যে ভয় হচ্ছিল পড়ে যাব।...শৈশবের মতন ভয়ে পিঠ কুঁকড়ে যাচ্ছিল। ওরা যে

যেখানে ছিল সবাই হুড়মুড় করে ছুটে এসেছিল দরজায়...সমর অলক, মিনু...বাচ্চারাও বোধ হয় কেউ বাকি ছিল না। দরজা খুলতে ওদের তিন মিনিট লেগেছিল কিনা সন্দেহ অথচ তারই মধ্যে যেন একটা হইচই শব্দ উঠে এসেছিল অনেক নীচে সিঁড়ির গহ্বর থেকে।

এত সকালে ওইরকম সন্ত্রস্ত অপ্রকৃতিস্থ চেহারায় আমাকে দেখে ওরা যত ভয় পেয়েছিল ততই অবাক হয়েছিল। আমি কেবল বলেছিলাম, বলছি সব...আগে দরজাটা ভালো করে বন্ধ কর্...কিছুতে খুলবি না।...'

'কেন...কেন...কে...কী?'

'আগে জল দে...আর আমি একটু শোব...।' বলতে-বলতে কোনোরকমে ওদের একটা শোবার ঘরে ঢুকে নিজেকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা বিছানায় ফেলেছিলাম। মিনু জল এনে দিয়েছিল। খেয়ে একটু দম নিয়ে যেই কথা বলতে গিয়েছি...অমনি আবার বাইরের দরজার ঘণ্টা পাগলের মতো বেজে উঠেছিল। আমি আর্তনাদ করে উঠেছিলাম, 'খুলবি না খুলবি না, কিছুতেই খুলবি না।...''

মিনু ছুটে গিয়েছিল শোবার ঘরের দরজাটাও বন্ধ করার জন্য। তার আগেই আমি শুনতে পেয়েছিলাম, বাইরের দরজার পাল্লায় স্টীলের চিমটের বেপরোয়া খটখটানি। আবার চিৎকার করতে গেলাম...গলা দিয়ে আওয়াজ বার হল না।...

আমার ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভেঙে হাত পা অসাড় লাগছিল অনেকক্ষণ। এদিকে ঘেমে বিছানা পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। আর গলা কাঠ। বোঝা গেল, ওটা স্বপ্ন। সত্যি জল খাই নি মিনুর হাত থেকে। তখন উঠে বসে পাশের টিপয়ের উপর ঢেকে-রাখা জলের গেলাশ থেকে জল খেলাম। তারপর বেডসুইচ টিপে আলো জ্বেলে দেখলাম রাত প্রায় আড়াইটা। এমন একটা বিদ্‌ঘুটে স্বপ্নের কোনো অর্থ না খুঁজে পেয়ে ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। তবে সব দুঃস্বপ্নেরই তো একটা লাভের দিক থাকে—জেগে উঠে মনে হয়, 'আহ্ বাঁচলাম।' মনে হয় জীবনের সব অপ্রিয় অভিজ্ঞতার শেষেই যদি এমন পরম শান্তিময় জাগরণ থাকত।

কিন্তু মনের ওই শান্তিটা বেশিক্ষণ টিকল না। স্বপ্নটা আমাকে কেবলই কুরতে লাগল। অবশ্য কেউ হয়তো বলবে 'স্বপ্ন তো স্বপ্নই, তার আবার অর্থ হয় নাকি। মিছে মাথা ঘামানো।' কিন্তু না ঘামিয়েও পারছিলাম না। খানিকক্ষণ একটা বই পড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মন লাগল না। একটা চাপা অস্থিরতা. .অদ্ভুত একটা অস্বস্তি লাগছিল।...ঠিক ভয় নয় কিন্তু প্রায় ভয়েরই মতন।

স্বপ্নটার কোনো যেন মাথামুণ্ডু নেই।...আর এরকম দম-আটকানো স্বপ্ন জীবনে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ল না।...আমার স্বপ্ন সাধারণত খুব সাদামাটা হয়। জাগরণে যে সমস্যার কোনো সমাধান পাই না, যে উদ্বেগ থেকে উদ্ধার পাই না, তারই একটা আপাত-সমাধান অনেক সময় ঘটে যায় স্বপ্নে। ওইসব আটপৌরে স্বপ্নের মাঝখানে এমন একটা জটিল স্বপ্ন দেখে আমার খুব বিমূঢ় লাগছিল।

অবশ্য সাদামাটা স্বপ্নের অর্থ খোঁজার একটা ঝোঁক আমার আছে। ইউনিভার্সিটিতে আমার বন্ধু ছিল পদ্মিনী সরকার...ও পড়ত সাইকোলজি, ড. হরিপদ মাইতির ছাত্রী ছিল। ওর কাছে একবার শুনেছিলাম যে, যে-কোনো স্বপ্ন দেখার পরেই যদি সত্যিকারের অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা নিয়ে নিজেই মনের আনাচকানাচ খুঁজে দেখি তন্ন তন্ন করে, তাহলে আমরা বেশির ভাগ স্বপ্নেরই একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নিজেরাই। হতে পারে সেই ব্যাখ্যার সবটা আমরা অন্যের

কাছে স্বীকার করতে পারি না। কিন্তু নিজে বেশ বুঝতে পারি স্পষ্ট, কোন্ অস্বস্তিকর ব্যাপারটা স্বপ্নে কোন্ চেহারা নিয়েছে। এমন-কী স্বপ্নের অনেক ঘটনা আর বস্তুর প্রতীকী চেহারাটাও ধরতে পারা যায় ওইভাবে তলিয়ে ভাবলে। ওর কাছ থেকে শোনা অবধি মনে-মনে স্বপ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করার একটা অভ্যাস আমার আছে। সব স্বপ্নেরই একটা বোধগম্য অর্থ খুঁজে বার করার চেষ্টা করি। এই পাখা কাঁধে কবন্ধটার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলেই মহা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। অবচেতনের কোন্ কারিগরিতে ওই রোবটের মতন মানুষটার সৃষ্টি হয়েছে কিছুতেই ঠাহর করতে পারছিলাম না। অনেক হাতড়ে দেখলাম মনের গলিঘুঁচি অন্ধিসন্ধি।

তারপর এক সময়ে আবার ঘুম এসে গেল। ঘুম ভাঙল অন্য দিনের চেয়ে অনেক দেরিতে। ভাগ্যিস রবিবার। কিন্তু মুখে যেন বিস্বাদ লেগে আছে তখনও ছুটির দিনের পক্ষে বড়োই বেমানান।

চায়ের প্রথম কাপটা শেষ হতেই মনে পড়ল কাল সন্ধ্যায় ভেবেছিলাম সুরভিকে একটা চিঠি লেখা দরকার। ঠিক কী লিখতে চেয়েছিলাম ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল সুরভি একটা মনের মতন কাজ পেয়েছে তার অফুরন্ত অবসরকে ভরে তোলবার জন্যে। বস্তির ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ফ্রী ডে কেয়ার সেনটার করেছেন এক ভদ্রলোক। পড়াশোনা, ছবি আঁকা, গান-বাজনা, নাচ, নাটক করা...এসব তো আছেই। তা ছাড়াও আহার বিশ্রাম খেলাধুলোর ব্যবস্থাও আছে। ভোর না হতেই বাপ-মা দিয়ে যায় তাদের ছেলেপুলেদের. আবার সন্ধ্যায় তাদের কাজের শেষে এসে বাড়িতে নিয়ে যায় ফিরিয়ে। সুরভি তাদের পড়ায়, ছবি আঁকায়. নতুন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ পেয়ে তার ভারি ভালো লাগছে।

আমিও তার জন্য খুব খুশি হয়ে উঠেছিলাম। কতবার সুরভি বলেছে তাকে এমন একটা কাজ দিতে যা অর্থকর হবার দরকার নেই. তৃপ্তিকর হলেই হবে। আমি ভেবে পাই নি কী পরামর্শ দেব।...তবু সুরভির মনে একটা সংশয় আছে মনে হল।...'আনন্দলোক'-এর এই প্রতিষ্ঠাতাকে তার যেন কেমন অদ্ভুত লাগে...অনেকে নাকি খুব ভয় পায় তাঁকে ভদ্রলোকের স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে থাকতে না পেরে একটি সন্তানকে নিয়ে দেশত্যাগ করেছেন।...নানারকম গুজব শোনে তাঁর সম্বন্ধে।

গুজবে আমার অভিরুচি নেই। তাই সেসব শোনা হয় নি। আমি তাকে বলেছিলাম, 'তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাকবে...যতটুকু নয় তার বেশি কাছে না ঘেঁষলেই হল।' এরপর আমাকে একটু অবাক করে দিয়ে সুরভি বলেছিল ভদ্রলোক নাকি আমাকে চেনেন। নাম জানতে চাইলাম। নামটা ঠন করে কানে বাজল। হ্যাঁ আমিও চিনি বইকি, অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই. তবে ক্বচিৎ কদাচিৎ নাম দেখেছি কাগজে, ওইরকম জনহিতকর কাজের সূত্রেই বোধহয়। সুরভিকে সে কথা বলায় সে বলল, 'একদিন আমি খুব প্রশংসা করছিলাম আপনার, ভদ্রলোক শুনে বলেছিলেন, তাঁর কিন্তু ধারণা একে-বারে অন্যরকম। কেন তা যদি আমি জানতে চাই তাহলে বলতে পারেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম না সে জানতে চেয়েছিল কিনা। কিন্তু বোঝা গেল চেয়েছিল, নইলে এরপর সে কেন বললো, 'আমি তাঁকে বলেছি, আপনি যতই যা বলুন, যাঁকে আমি এতকাল ধরে ঘনিষ্ঠভাবে জানি তাঁর সম্বন্ধে আমার মত পালটাবে না।'

আমি কিছুই বললাম না এর উত্তরে। সুরভি অন্য নানা কথা পাড়ল। তারপর বিদায় নেবার সময় একটু টিপ্পনী কেটেছিল, 'এদিকে আপনার সম্বন্ধে কত কথা যে জিজ্ঞেস করলেন।' শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম।

তাই সকাল বেলাতেই চিঠি লিখতে বসলাম কাগজ কলম নিয়ে। আমারও কয়েকটা কথা বলা দরকার সুরভিকে। আবার কবে আসবে তারজন্য বসে থাকা ঠিক হবে না। তাকে বলতে চাই যে ওই ভদ্রলোককে আমি একজন ঈভিল জিনিয়াস বলে জানি। সুরভিকে ভর করে কোন্ দিন না তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করতে চলে আসেন...ভাবতেই আতঙ্ক হচ্ছে।...মাথায় একটা যেন বিদ্যুতের আঘাত লাগল। এই তবে সেই কবন্ধ!

খোলা কলম বন্ধ করলাম। অনেকক্ষণ থুতনিতে হাত রেখে ভাবলাম। শেষকালে নিজেকে বললাম, 'থাক...আমি কেন নিজেকে ছোটো করব...ও নিজেই আবিষ্কার করুক কে কী!' কাগজকলম তুলে রাখতে-রাখতে নিজের অহংকে ধন্যবাদ দিলাম, আমার অবচেতনার ভয়ের কাছে আমাকে হেঁট হতে দেয় নি।

রবিবারটা এবার রবিবারের মতনই লাগল।

[*সৌজন্যে : চতুরঙ্গ*, ডিসেম্বর ১৯৮৮]

গৌরী আইয়ুবের লেখা ব্যক্তিগত

চিঠিপত্র

পুত্র পূষণের বিয়ে উপলক্ষ্যে গৌরী আইয়ুবের স্বহস্তে রচিত সেই অত্যাশ্চর্য নিমন্ত্রণপত্র

শ্রীমতী মীরা [illegible]
শ্রী অমল [illegible]

স্নেহভাজনেষু,

শ্রী নিরঞ্জন সমাদ্দার ও শ্রীমতী [illegible] সমাদ্দারের [illegible] কন্যা [illegible] ও আমাদের পুত্র পূষণ [illegible] [illegible] পরস্পরকে গ্রহণ করছে। ১২ই অক্টোবর সন্ধ্যায় আমাদের গৃহে এসে তাদের আশীর্বাদ করে যাবেন আমাদের আন্তরিক এই অনুরোধ।

২.১০.৮১
৫ পার্ল রোড
কলকাতা-১৭

আবু সয়ীদ আইয়ুব
গৌরী আইয়ুব

[আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভাগ্নী ড. সুলতানা এস. জামানকে লিখিত]
[১৯৯১ সালে বাংলাদেশ ভ্রমণে যাওয়ার আগে]

প্রিয় সুলতানা,

নিশাতখান কাপড় চোপড়ের মাঝে তোমার চিঠিখানা হারিয়ে ফেলেছিল বলে তোমার ৬ তারিখের চিঠিখানা আমাকে ৯ তারিখে এনে দিয়েছে। অনিন্দ্য চ্যাটার্জির টিকিট পরে এনে দেবে বলে গিয়েছে। যদি না দেয় তাহলে পুনদেওকে আবার পাঠাব।

ডাকের চিঠি পৌঁছায় না। তবু আজ air mail-এ একটা পাঠাবার চেষ্টা করবো এই জন্য যে আমার ফোন খারাপ হয়ে আছে বহুদিন। হয়ত গত শুক্রবারে ফোন করার চেষ্টা করে তা টের পেয়েছ। আগামী শুক্রবারে সেটা করেও পাবে না। সেজন্য শিপ্রার কাছেও জানিয়ে রেখেছি যদিই তুমি ওখানে ফোন কর তাহলে কি জবাব দেবে। এই চিঠি হয়ত আমরা পৌঁছবার আগে পৌঁছাবে না, তবু চেষ্টা করি।

আমার সঙ্গে আরও দুজন মহিলা এবং দুজন পুরুষ মানুষ যাচ্ছেন। তুমি ১২/১৪ জন নিয়ে যাওয়াব ঢালাও নিমন্ত্রণ জানিয়ে দিয়েছিলে বলেই এঁদের নিয়ে যেতে সাহস করছি। মহিলাদের একজন আমার সহকর্মিনী, ইংরিজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা বন্দনা মুখোপাধ্যায়, অন্যজন আমার ভগ্নী মনীষা দত্ত।

ভদ্রলোকদের একজন আবদুস সামাদ গায়েন যার কথা আগেই লিখেছিলাম। অন্যজন দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশির বন্ধুতার মাধ্যমেই সদ্য পরিচয় হয়েছে। ইনি কঙ্করদার স্নেহভাজন—আশ্রমিক সঙ্গে আছেন। এঁর এবং নিশির অনুরোধে এঁকেও সঙ্গে নিচ্ছি—

সেজন্য কিছু মনে কোর না।

তুমি যাঁদের নিয়ে যেতে বলেছিলে তাঁদের কেউ রাজি হলেন না। সেসব কথা পরে মুখে বলব।

আমার ভিসা শিপ্রা নিজে চেষ্টা করে করিয়ে দিয়েছে। অন্যেরা আজকে যাচ্ছে ভিসার জন্য। আশাকরি পাবে।—

আমি জাহানারাকে লিখেছিলাম (রশীদ হায়দারের হাতে তাড়াহুড়ো করে কয়েক লাইন) যে প্রথমে ৩/৪ দিন ওর কাছে থাকবো—ও সেটাকে নিজে নিজেই ৭ দিন করে নিয়েছে। অতদিন ওর কাছে থাকলে আমার দলবলও ক্ষুণ্ণ হবে, তোমার সঙ্গে যে আমার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবো তারও অনেক বাদ পড়বে। কারণ ১৫ই মার্চের মধ্যে আমাকে ফিরতেই হবে। তারই মধ্যে আবার চট্টগ্রাম ও সিলেট যাবার বাসনা—হয়ত বা ময়মনসিংহও। যাইহোক গিয়ে জাহানারাকে বোঝাবার চেষ্টা করবো।—

এরপর আমার একটি সনির্বন্ধ অনুরোধ। আমি এই প্রথম এবং শেষবার যাচ্ছি। উদ্দেশ্য আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা এবং বাংলাদেশ দু চোখ ভরে দেখে আসা। আমি সভাসমিতি করতে চাই না, ভালোবাসি না। শারীরিক ও মানসিক কষ্ট পাই। তোমরা আমাকে ওসব থেকে রক্ষা কোর। গলায় দড়ি বাঁধা...রের মত perform করে বেড়াতে পারব না। ছোট সভা বা mass media কোনো খানেই আমি কিছুতেই যাব না। তোমরা সেজন্য ক্ষুণ্ণ হোয়ো না—please জাহানারাকেও বোল। আমার সব আনন্দের মধ্যে ঐ আশঙ্কাটাই এখন খোঁচা মারছে, জাহানারার চিঠি পাবার পর থেকেই।

সবার জন্য অনেক ভালোবাসা রইল।—

গৌরী মামী
১১/২/৯১

[বাংলাদেশ থেকে কলকাতা ফিরে লিখিত]

প্রিয় সুলতানা,

আমরা ১৫ই মার্চ ঠিকসময়ে ভালো ভাবে এসে পৌঁছেছি। বিমান ঢাকার মাটি ছাড়তেই বন্দনা বললো, একটা fairy tale শেষ করে চললাম। পরশু এসে আবার বললো, কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে—কি রকম ঘোরের মধ্যে যে ছিলাম।

আমি আরো আগেই লিখি নি কারণ টুলুর আশায় ছিলাম। ও বলেছিল, দুদিনেই তিয়ার পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে এবং তার পরে ফিরে যাবার সময় দেখা করে যাবে। সেই আশায় আজ লিখে রাখছি। প্লেনে টুলু এবং সোনা দুজনের সঙ্গেই দেখা হয়েছিল।

২৬ দিন তোমাদের এত আদর যত্ন পেযে এসে বিস্ময়ের ঘোর যেন আর কাটছে না—ওখানকার বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছি—কাগজ কলম নিয়ে বসেছি দুই বাংলার কথা লিখব বলে, কিন্তু মন নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এখানকার visa জোগাড় করানো (শিপ্রার মারফৎ) থেকে শুরু করে সুফি লুবনার এসে plane-এ তুলে দেওয়া পর্যন্ত সব কিছু এমন নিখুঁতভাবে করেছ তোমরা যার জন্যই আমার যাওয়া—শুধু নিজের যাওয়া নয়, সদলবলে যাওয়া সম্ভব হল—। তার পরেও আমার কারণে তোমাকে লোকের অপবাদ শুনতে হল এটাই দুঃখ। কেউ তো আমায় নিজে সরাসরি এসে বলে নি।

তবে অন্যের মুখে তৃতীয় পক্ষের কথা শুনেও আমি তাকে বলতে বলেছি যে "বুঝিয়ে বোলো যে সুলতানারা এভাবে সব ব্যবস্থা করে না আনালে আমার আসার সাহসই হোত না। কতদিন থেকে ওরা বলছে। শেষ পর্যন্ত যে আসতে পারলাম সেটা ওদেরই আগ্রহে। ওরা আমাকে আগলে রাখবে কেন, আমার নিজেরই পায়ের কষ্টে আমি বিশেষ কোথাও যেতে সাহস করি না।"

লুবনা এসে সব কিছু তরতর করে সেরে দেওয়াতে আমরা সহজেই সব মালপত্র নিয়ে সবার আগে প্লেনে গিয়ে উঠলাম। যাবার সময় ছোট প্লেন ছিল, আসার সময় উঁচু airbus দিয়েছিল। সেটায় উঠতে নামতে একটু কষ্ট হয়েছিল। যে পা-টা একটু ভালো তার উপরেই ভর দিয়ে দিয়ে উঠে সেটাও বিকল হল। দুদিন প্রায় শুয়ে থাকতে হল। এখন চাঙ্গা হয়ে উঠেছি—আজ খেলাঘরে যাব ভাবছি।

তোমরা এত বড় বড় প্রতিষ্ঠান কেমন সুন্দর চালাচ্ছ, আমরা এইটুকু 'খেলাঘর' নিয়েই হিমসিম খাচ্ছি। জয়া পতির কাছ থেকে শোনার পর থেকেই লক্ষ্য করে দেখছিলাম যে তোমাদের দেশের সাধারণ মানুষেরও work ethics এখান থেকে ভালো। আমাদের শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাই এমন খারাপ ভাবে politicalised হয়ে গিয়েছে যে বাধ্যতা, কাজকে ভালোবেসে কাজ করা ইত্যাদি গুণ দেশ থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছে।...

২টি paper cutting পাঠালাম বাদলের জন্য—ওকে দিও। বাদলকে এবং সুফি লুবনাকে ক্রমে লিখছি—ওদের বোল যে ওরা যা করেছে কোনোদিন আমরা ভুলবো না। কৃষাণ, আনুষে, আলমের, আনীরে সবার কথাবার্তা কাণ্ড কারখানা সব সময় মনে পড়ছে। জামান সাহেব নতুন কি করার পরিকল্পনা করছেন? আরতি পরদিনই এসেছিল—সব গল্প শুনে তারও মনে হচ্ছিল একসঙ্গে যেতে পারলে কী ভালোই হোত।

তোমরা সবাই আমার ভালোবাসা জেন।

গৌরীমামী

৫নং ডঃ গণি রোড, কল-১৭
১৮/১০/৯৭

আদরের সুলতানা,

আমি সময়হারা হয়ে গিয়েছি। তবু মনে হচ্ছে বোধহয় তোমার চিঠিখানা দু-তিন মাস আগে এসেছিল। এরমধ্যে অসংখ্যবার তোমাকে উত্তর দেবার কথা ভেবেছি, কিন্তু আমার শরীর-মন এত বিপর্যস্ত ছিল যে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে একটাও চিঠি লিখতে পারি নি।

এখন মন যদিও পুরোপুরি আমার দখলে এবং দখলে বলেই তাকে অনেকখানি উৎফুল্ল করে তুলতে পেরেছি, তবু শরীরটা বেহাত হয়েই আছে। এতদূর যে এ মাসের পেনশন বিলে দস্তখতটুকুও করতে পারি নি। তবে আমার ফিজিওথেরাপিস্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি কলমকে তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ঠিকমত রপ্ত করানোর জন্য। মনে মনে উচ্চাশা এই যে আগামী সপ্তাহে যখন ব্যাঙ্ক থেকে একজন অফিসার আসবেন আমাকে স্বচক্ষে দেখে বাৎসরিক লাইফ সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য, তখন আমি যেন তাঁর উপস্থিতিতে একটা কাজ চলা গোছের দস্তখত করতে পারি আমার পেনশন বিলে। তবে আজকে যেমন তেমন করে একটা পেনসিল ধরে ইংরেজী অ্যালফাবেট লিখতে গিয়ে দেখলাম আমার নামের প্রথম অক্ষরটাই ইংরেজী ভাষার সবচেয়ে কঠিন অক্ষর। তবু সুকুমার রায়ের ছড়া দিয়ে নিজেকে উৎসাহিত করছি যে, 'চেষ্টায় কিনা হয় কি না হয় শেষটায়।'

তবে মনকে উৎফুল্ল করে তুলতে পারার সবটুকু কেন, এমনকি অর্ধেক কৃতিত্বও নিজে দাবী করব না। যারা আমার Morale পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করেছে তাদের কথা বিস্তৃত বলতে আমার মোটেই অনিচ্ছা বা অক্ষমতা নেই। কিন্তু যে লিখে দিচ্ছে তার উপরেও তো একটু মায়াদয়া করতে হয়। তাছাড়া রাইটিং প্যাডের কাগজও ফুরিয়ে এসেছে। এবং এই ভরদুপুরে পুণদেওর বিশ্রাম নষ্ট করে দোকানে পাঠান অ-মানবিকতা হবে।

এই তো গেল এদিককার জবাবদিহি। এত বিলম্বে হলেও জানাই যে তোমার স্বহস্তে লেখা চিঠি পেয়ে যত বিচলিত ততটাই বিস্মিত হয়েছিলাম। তুমি আরও একবার প্রমাণ করলে যে অসাধারণ তোমার ক্ষমতা।

তুমি রোজ রহমানের সঙ্গে এসে পরশকে নিয়ে ফিরে যাওয়ার আগে যখন বন্ধু কার্ডিওলজিষ্টকে দেখাতে গিয়েছিলে (তাঁর নামটা ভুলে গিয়েছি) তখন তোমার জন্য উদ্বেগ বোধ করলেও কলকাতার উচ্চশ্রেণীর অর্থলোভী স্পেশালিষ্টদের সম্বন্ধে আমার মনে একটা সংশয় ছিল। কিন্তু পরে তো প্রমাণ হল তাঁর কথা ভুল ছিল না। এবং সেজন্য মনে মনে আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু তুমি যে কলকাতায় চিকিৎসা করতে এসে কোঠারী কি বিড়লাদের পাল্লায় পড়নি এতে আমি খুশি হয়েছি।

তোমার সন্তানরা যেভাবে তোমাকে দ্রুত সিঙ্গাপুরে নিয়ে গিয়ে চারটা বাইপাসের ব্যবস্থা করেছে সেটা আমার কাছে কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু দুনিয়ার যে রকম হালচাল দেখি তাতে বুঝতে পারি এটা একটা দুর্লভ সৌভাগ্য। তোমার যেমন সৌভাগ্য, তেমনি তাদেরও সৌভাগ্য কম নয় তোমার মতন মা'কে পেয়ে।

আশা করছি এতদিনে তুমি সব বিধি-নিষেধ মেনে সম্পূর্ণ চাঙ্গা হয়ে উঠেছ। তবে সন্তানদের মুখ চেয়ে পুরনো রুটিনে ফিরে যেওনা। সব কাজই তুমি কোর তবে ধীরেসুস্থে। যে স্বাস্থ্যকে তুমি উদ্ধার করে এনেছ তাকে একটু হিসেব করে খরচ কর। আমাদের গৌরকিশোর ঘোষ বে-হিসেবী খরচ করে দশ-এগারো বছরের মধ্যেই আবার যখন চিকিৎসার জন্য মাদ্রাজে ফিরে যেতে

বাধ্য হল তখন তাঁর চিকিৎসকরা হৃদযন্ত্রকে আরও একবার মেরামত করে তুলবার পরেও মেস্তিষ্ককে সামাল দিতে পারলেন না। ফলে শরীরের দক্ষিণ অংশে পক্ষাঘাত নিয়ে ফিরে এলেন। আমি যে এসব কথা লিখছি তোমাকে ভয় দেখানোর জন্য নয়, সাবধান করার জন্য, তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি আমার উদ্দেশ্য ঠিকই বুঝতে পারবে।...

১৮/১০/৯৭

তোমাকে এই চিঠিটা লিখতে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেকটা দেরী করে ফেলেছি। দিন দশেক পরে আবার চিঠিখানা শেষ করার সুযোগ এসেছে। তুমি অপরাধ নেবেনা আমি জানি। অবাকও হয়ো না, কারণ এই বিধ্বস্ত শরীরেও জীবনযাত্রার নানা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সারতে সারতে সময় ও শক্তি বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

অথচ তুমি আমার জন্য কিনা করেছ! কেউ কখনও শুনেছে যে পাশপোর্ট-ভিসা ব্যবস্থা করে এরোপ্লেনের মাশুল দিয়ে সেবিকাকে পৌঁছে দেওয়ার কথা। তুমি সেকথা ভাবতেও পেরেছ এবং করেছ। এতখানি পাবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু তোমরাই সেই অধিকার অযাচিতভাবে দিয়েছ। এরজন্য কৃতজ্ঞতা জানাবার মত নির্বোধ নিরুত্তাপ আচরণ আমি করব না।

পূষণ-চম্পারা বড়দিনের ছুটিতে আসবে আশা করছি। ইতিমধ্যে নিজেকে আরও একটু প্রেজেন্টেবল্ করে তুলবার চেষ্টা করছি। লুবনার দিয়ে যাওয়া সেই SOPHIS WORLD বইখানা আমি দু-তিন চ্যাপ্টার পড়ার বেশি এগোতে পারিনি। কিন্তু ঐ উপহারের অন্যতমা অধিকারিণী শ্রেয়া সেটি নিজে নিজেই খানিকটা পড়ে ফেলেছিল, রস পাচ্ছিল। তাই সেটাকে সে বোম্বাই নিয়ে চলে গেছে। জানিনা কোনদিন আবার বোম্বাই যাওয়া হবে কিনা এবং দুজনে মিলে বইটা পড়বার দুর্লভ সুযোগ পাব কিনা।

আমার বন্ধু ও স্নেহাস্পদরা নানাভাবে আমার দিনগুলিকে সচল করে রাখবার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আমাদের ইংরেজ বন্ধু জো উইন্টারের সেবা। জো একজন কবি। শিক্ষকতা থেকে প্রি-ম্যাচুওর রিটায়ারমেন্ট নিয়ে পরিকল্পনা করেছিল যে সারা দুনিয়া ঘুরে দেখবে এবং কলকাতা, ব্যাংকক, হংকং, টোকিও ইত্যাদি শহরে দু-বছর করে থেকে দেশগুলিকে জানবে এবং সে বিষয়ে লিখবে। কিন্তু প্রথম ধাপে কলকাতায় পা দিয়েই যে এমন করে জড়িয়ে পড়বে তা কখনও ভাবেনি। বাংলাভাষা এবং রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করে বেশ কয়েকটা বছর এখানেই কাটিয়ে দিয়েছে। মূল বাংলা গীতাঞ্জলীর ১৫৭টা গানই সে ইংরেজী কবিতায় অনুবাদ করেছে, রবীন্দ্রনাথ নিজে পঞ্চাশের কয়েকটি বেশি অনুবাদ করেছিলেন prose-verse সে তো তোমার জানা আছে। এই মানুষটি সপ্তাহে কয়েকদিন এসে আমাকে বই পড়ে শোনান। আমার পছন্দানুযায়ী Thomas Mannএর Magic Mountain পড়ে শোনাচ্ছেন, বইটা নিজেই খুঁজে পেতে কিনে এনেছেন। বইটা তোমাদের মামুর খুব প্রিয় ছিল কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগেই সেটা তাঁর পড়া হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর সঙ্গে পড়বার সুযোগ আর হয়নি। এতদিন পর সেই বই শুনতে শুনতে কত যে ব্যক্তিগত, বিশ্বসাহিত্যগত কথা মনে হচ্ছে এবং কত আনন্দ পাচ্ছি সে আর বলে বোঝাবার নয়।

আরও একটা কাজ নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরে শুরু করতে হল কামাল, সামাদ ইত্যাদি স্নেহাস্পদদের চেষ্টায়। ওরা আমার স্মৃতিচারণ সোৎসাহে লিখে নিচ্ছে। আমিও ওদের indulgence পেয়ে মহানন্দে (মাঝে মাঝে গভীর বেদনায়) স্মৃতির সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। তাই বুঝতেই পারছ সময় আমার নেহাত মন্দ কাটছে না। তবে হাত পা দ্রুত সচল হয়ে উঠছে না। এটাই যা দুঃখ, তবে আমার মনকে খুশি রাখার মত একটা কাজ পেয়েছি। কলকাতা আকাশবাণী

থেকে এখন একটা সারাদিনব্যাপী চ্যানেল F.M. শুরু হয়েছে বছর দুয়েক যাবত। তার কল্যাণে আমি কখনও "I am a Barbie girl in a Barbie world" শিখে নাতনীকে টেলিফোনে শুনিয়ে দিচ্ছি। কখনও বা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁয়ের কিম্বা মেঘনাদ সাহার জীবন কাহিনী শুনে মুগ্ধ হচ্ছি। একদিন ওরা রাত দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত আলোচনা করল, প্রেম জীবনে একবারই আসে। এই ৬৭ বছরের কিশোরীও পরম উৎসাহে রেডিও খুলে কানের কাছে নিয়ে শুয়েছিল। হঠাৎ চমকে উঠে শুনলাম অনুষ্ঠানের শুরুতেই মৈত্রেয়ী দেবীর একটি কবিতা পড়া হল যা মির্চার উদ্দেশ্যে লেখা। তারপর শুরু হল 'ন হন্যতে' থেকে পড়া। তারই ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথ, শঙ্খ ঘোষ, এবং আরও কতজন যে ছিলেন সে আর মনে করতে পারছি না। আমার রাতের অনেকগুলি বিনিদ্র প্রহর এবং দিনেরও কয়েকটি নিঃসঙ্গ প্রহর F.M. ভরে রাখছে। মাঝে মাঝে এতদূর খারাপ অবস্থা হয় যে শুনতে শুনতে যদি কেউ এসে পড়ে তবে তাকে বলি, 'বস, বাকিটা শুনতে দাও।' মাঝে মাঝে তাই মনে হয় অসুস্থ থাকাটা একেবারে ব্যর্থ যাচ্ছে না।

এতসব কথা লিখলাম এদিককার খবর যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে দেওয়ার জন্য, আবার কবে লিখতে পারব জানি না। তুমি কবে আসতে পারবে তাও জানি না, তবে আশা করছি তুমিও তোমার নিজস্ব স্বভাব অনুযায়ী জীবনটাকে নানা কর্তব্যে ও আনন্দে ভরে রেখেছ। জামান-সাহেবকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিও। তোমাকে আর কি জানাব?

গৌরীমামী

[চিঠিখানি অন্যের হস্তাক্ষরে লেখা—কেবল সইটুকু গৌরী আইয়ুবের অপটু হস্তাক্ষরে]

***

[সহকর্মী অধ্যাপিকা মন্দাব মুখোপাধ্যায়কে লিখিত]

T.I.F.R.
Bombay-5
10.4.92

স্নেহের মন্দার,

তোমার দুটি চিঠি হজম করে বসে আছি এবং তা সত্ত্বেও আশা করছি যে তুমি আমার আচরণে অপ্রসন্ন হওনি, এটা হয়ত একটু বেশি প্রত্যাশা। যাইহোক আমি যে এর ফলে প্রায় প্রতিদিনই নিজেকে তিরস্কার করছিলাম সেটা কিন্তু সত্যি।

কাশফুলের সমারোহ নিয়ে তোমার শারদীয়া শুভেচ্ছা যখন এসেছিল তখন সত্যিই খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। সেই সময়টায় আমার চিকিৎসা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তায় মনটা এমন বিচলিত ছিল যে শরৎকালের ঐ স্পর্শটুকু খানিকক্ষণের জন্য কিছু সুন্দর স্মৃতিতে ডুবিয়ে রেখে দিতে পেরেছিল। তারপর তো বহুদিন গেল এবং একে একে দুচারজনকে চিঠি লিখেছি এবং তার থেকে হয়ত জেনেছ যে আমি এখন আধখানা সেরে উঠেছি।

অর্থাৎ একটা পা মেরামত করা হয়েছে এবং সেটার উপর আমার অধিকার প্রতিষ্ঠার তপস্যা চলেছে। দৃশ্যত তোমরা খুব একটা তফাৎ বুঝতে পারবে না। তবে operation করা পায়ের কষ্টটা কমে গিয়েছে এবং ওটা সোজা হওয়ায় আমিও মেরুদণ্ডকে আগের চেয়ে একটু সোজা করতে পেরেছি মনে হচ্ছে। তবে অন্য পায়ের অবস্থা আগের মতোই। তবু তার থেকে যে service পাচ্ছি তা এখনও তো মেরামত করা পায়ের কাছ থেকে পাচ্ছি না, তাই সেটিকেও

ডাক্তার বাবুর হাতে তুলে দিতে ভরসা পাইনি এখনও। হয়ত বছর খানেক পরে দিতেই হবে।

আপাতত আমি ৬ই মে কলকাতা ফিরবার আশা করছি। নিজের শরীবের এবং সমাজ সংসারের এত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যে ঠিক মতন বাড়িতে পা না দেওয়া পর্যন্ত ভরসা হচ্ছে না যে পৌঁছতে পারবো। যদি পারি তাহলে তোমাদের সঙ্গে দেখা হতে আর দেরী হবে না মনে হয়। ইতিমধ্যে পদ্মাদি এবং ভারতীর কাছ থেকে অদিতির বিয়ের খবর পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। তোমাকে বিয়ের পরে আমার বাড়িতে ডাকার খুব ইচ্ছা ছিল হয়নি। এবার যদি দুই নব দম্পতিকে একসঙ্গে একদিন আমার ঘরে পাই তবে খুব ভালো লাগবে। অদিতির* এই সম্পর্কটাও কি অনেকদিন থেকে ঘটে উঠছিল না একেবারেই সাম্প্রতিক? ওকে বোল যে এই বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের জন্য আমি খুব আনন্দিত। ও নিশ্চয়ই সেটা জানে। কিন্তু এর পরে ওরা কলকাতাতেই থাকবে তো?

আশা করছি এতদিনে কলেজের আবহাওয়া খানিকটা পবিচ্ছন্ন হয়েছে। এবং সুস্থির চিত্তে পড়াশোনার কাজকর্ম করতে পারছো। এখন তো বোধহয় plus 2-এর পরীক্ষা চলছে কলেজে এবং Slack season শুরু হয়ে গিয়েছে। এটা লিখতেই কলেজের staff room-কে ভীষণ miss করতে শুরু করেছি। বেশ জমিয়ে আড্ডার এবং coffee আর চিঁড়ে ভাজার আসরে আবার কোনোদিন শামিল হতে পারব কিনা জানিনা। এখনও তো ২টি লাঠি নিয়ে চলাফেরা করি। দুটিকেই ত্যাগ করতে না পারা পর্যন্ত ভদ্রসমাজে নিজেকে উপস্থিত করার যোগ্য বলে মনে হবে না আমার। অগত্যা তোমাদেরই আসতে হবে পর্বতের কাছে।

শীলাকে একবার জিজ্ঞেস কোর তো যে ওর বাড়ির ঠিকানায় আমি যে চিঠি দিয়েছিলাম সেটি পেয়েছে কিনা। আশাকরি ওর পারিবারিক পরিস্থিতি একই রকম, নতুন কোনো বিপত্তি দেখা দেয়নি।

তোমার জননীর** ঘরবাড়ি এবং স্কুল নিয়ে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তার কি কিছু সুরাহা করা গেল কিংবা তিনি কি নিজেকে ঐসব থেকে সরিয়ে এনে নিজের মনে শান্তিতে থাকতে পারছেন আজকাল?

ওঃ 'দেশ'-এ তুমি নিয়মিত পুস্তক সমালোচনা করছ দেখে ভালো লাগল। আমার বন্ধু ডঃ সুনীল সেনের বইয়ের সমালোচনাটা বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়লাম কারণ বইটা পেয়েও পড়ে দেখা হয়নি বলে অপরাধী বোধ করছি। ম্যাকক্লাওস্কিগঞ্জের উপর একটা বড় লেখা কিছুকাল আগে দেশ-ই ছেপেছিল, দেখেছিলে কি? খুব করুণ লাগে এই সব স্বপ্নের সমাধি! Sociology-র পাঠক হিসাবে আমার মাঝে মাঝেই খুব অবাক লাগে দেখে যে কি করে কোনো কোনো জায়গায় নতুন জনবসতি চেষ্টা করেও তৈরী করা যায় না—কোথাও আবার উৎখাত করবার চেষ্টা করলেও শিকড় গেড়ে বসে। কল্যাণীকে নিয়ে বিধান রায়ের স্বপ্নও তো সফল হল না। ছোট্ট একটা প্রতিষ্ঠান বিধান শিশু উদ্যানকেও বাঁচিয়ে রাখা গেল না। এটা যে কলকাতার নাগরিকদের পক্ষে কতখানি লজ্জার ভাবলে অবাক হতে হয় যে আমাদের জাতীয় চারিত্র্যে কিসের অভাব আছে যার জন্য এরকমটা হয়।

গতকাল বিষ্ণু দের পুত্র জিষ্ণু দে এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, ওরা কয়েকদিনের জন্য

* অধ্যাপিকা অদিতি দে শর্মা—রাষ্ট্রবিজ্ঞান

** অণিমা মুখোপাধ্যায় শিক্ষিকা-সমাজসেবী

Theoretical physics-এর একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছে সরকারী বাধা অগ্রাহ্য করে। এখানে Tata Instituteএর মতো একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র যদি তৈরি হয়ে চলতে থাকতে পারে তাহলে কলকাতার বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির এমন দীনহীন এবং কলহ জর্জরিত অবস্থা কেন! বাঙালীর বুদ্ধি আর প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে যদি একটু চরিত্রের জোর থাকত। এক আধজনের মধ্যে যদি বা তা পাওয়া যায়, তাঁর সেই কাজকে ধরে রাখবার মতো পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের মধ্যে আর পাওয়া যায় না কেন? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কী দুর্দশা!

এখানে বসে মাঝে মাঝেই এই সব কথা কেন মনে হয় জানো কারণ মারাঠীদের মধ্যে এই চারিত্র্য বোধহয় আমাদের চেয়ে একটু বেশি দেখতে পাই—তাই।

আজ এবার শেষ করি। ওঃ সুশীল পাঞ্জাবী* এখন কেমন আছে? ওর অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা জানার পব থেকে মাঝে মাঝেই ওর কথা ভাবি। আর সব বন্ধুদেরও আমার নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিও।

তোমাকে, তোমার কর্তাকে এবং কন্যাকেও ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানাই। গত বছরে এইরকম সময়েই তো তোমরা খেলাঘরে গিয়েছিলে নানা উপহার নিয়ে। খেলাঘরের জন্যও উতলা বোধ করি। কিন্তু এখন মনটা দিনে দিনে বিষণ্ণতর হচ্ছে নাতনীকে ছেড়ে যাবার ভাবনায়। আবার যে কতদিন পরে ওকে দেখব।

গৌরীদি

রূপাকে বোল যে ওর চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। পরে লিখতে চেষ্টা করবো—অথবা গিয়ে ফোনেই গল্প হবে।

পরাশর ৭০৫
বোম্বাই-৫ [সহকর্মী অধ্যাপিকাকে লিখিত]
২১।১১।৯৩

প্রিয় মিনতি,*

তোমার বিস্তৃত চিঠিখানার শুধু প্রাপ্তি স্বীকার করেছিলাম ডোভার লেনের ঠিকানায়, একটি পোস্টকার্ডে। জানি না তুমি সেটা পেয়েছ কিনা, কারণ এখান থেকে মাঝে মাঝে দুয়েকটা চিঠি খোয়া গিয়েছে। এবার পদ্মাদির ঠিকানায় লিখছি জানি না এবারেও খোয়া যাবে কিনা।

তোমার চিঠি পেয়ে মনে হচ্ছিল যে তোমার শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে গিয়েছে—৫০টি কন্যা নিয়ে ওয়ালটেয়ারে educational tour এবং তাব আনুষঙ্গিক ধকল সামলে এসেও সচল ছিলে। কিন্তু ভারতী ও পদ্মাদির চিঠি থেকে তো মনে হচ্ছে এখনও খুব মজবুত হয়নি শরীর। পদ্মাদি তোমার জন্য নানা দুর্ভাবনা করেছেন, এমন কি gasটা যে নতুন আস্তানায় নিয়ে যেতে পারবে না এবং আর একটা gas সংগ্রহ করা কি কঠিন সেসব লিখেছেন। তিনটে gas থাকা সত্ত্বেও তোমাকে ওরা একটা দেবে না জেনে চমৎকৃত হলাম। জগৎটা এরকমই।

ভারতী যে তোমাব কথা কত কী লিখেছে, বিশেষ করে ওর অসুখের সময় কতখানি করেচে তার কথা, সেসব শুনে (পড়ে) খুব ভালো লাগছিল। কলেজে থাকো বা কলেজ ছেড়ে দাও এই সম্পর্কগুলো যেন অক্ষুণ্ণ থাকে এই কামনা করি। সন্তোষপুরে চলে গেলে তুমি আমারও

* অধ্যাপিকা সুশীল পাঞ্জাবী—প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান দর্শন বিভাগ

* সহকর্মী অধ্যাপিকা

নাগালের বাইরে চলে যাবে ভেবে বিষণ্ণ বোধকরি।

আমি তোমাকে একটি অনুরোধ করে রাখি—আগেও বলেছি, তুমি seriously নাওনি, এবার একটু seriously বিবেচনা কর। ডিসেম্বরে ডোভার লেনের বাড়ি ছেড়ে দিলে পরে তুমি যতদিন কলেজে চাকরী করছো ততদিন পার্ল রোডে থাক এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। যদি আমার মনে বা আমার সন্তানদের মনে এতটুকুও দ্বিধা থাকত তবে আমি এই অনুরোধ করতাম না। ইতিমধ্যে কয়েকজন আমার উপস্থিতিতে অথবা অনুপস্থিতিতে ওখানে থাকতে চেয়েছে—সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছি, কারণ আমি জানি ঐ সহ-বাস শেষ পর্যন্ত তিক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তোমাকে আমি এগিয়ে গিয়ে সাগ্রহে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তুমি এসে থাক। যদি কোনো দিন আমার ব্যবহারে অনাদরের আভাস পাও তাহলে চলে যেও। যাবার জায়গার তো তোমার অভাব নেই। তাই সরাসরি না করে দিও না।

আমি হয়ত মার্চ মাসে ফিরব। তুমি রাজি হলে জানুয়ারী থেকেই থাকতে পাবো। স্বপ্না* তো আছে। আমার ও পূষণদের ঘর বন্ধ করে এসেছি। তুমি মায়ের ঘরে থাকতে পাবো—অথবা আমার ঘর খুলে দেবার ব্যবস্থা করতে পারবো। লিখো। সে অনুযায়ী স্বপ্নাকে জানাব। বিনাকেও**।

তোমার চিঠিতে দাস সাহেবের চলে যাবার খবরে দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল পার্থর কথা ভেবে। তাঁর কথা ভেবেও। স্ত্রীপুত্র কন্যা সন্তান সংসার সম্বন্ধে তাঁর কী আসক্তি ছিল! একে একে সবই তাঁর মুঠি থেকে খসে গেল। ছেলেকেও শেষ বারের মতো একবার কাছে পেলেন না। কত আশা করে সুন্দর ঘরবাড়ি করতে শুরু করেছিলেন ...আজ কী তার পরিণতি! তোমার মন অবশ্য অনেক দিন থেকেই বিবাগী...তবে এসব দেখে সংসারী মানুষের মনও বিবাগী হয়ে যায়।

(২২।১১) যাক এবার অন্য কথা বলি: operationএর অষ্টম দিনে বললো দাঁড় করাবে। পুনদেওকে বললাম তোমার কিনে দেওয়া নতুন চটি জোড়া বার করে দিতে। physiotherapist হাঁটুতে 'ঢাল' বেঁধে দিল, পুনদেও পায়ে চটি জোড়া পরিয়ে দিল। দুজনে যমদূতের মত দুদিক থেকে চেপে বগলদাবা করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চোখ বন্ধ করে দাঁত মুখ সিঁটকে দাঁড়িয়ে রইলাম। দু মিনিটই মনে হয়েছিল এক ঘণ্টা না অখণ্ড কাল। operation করা পা টা মনে হচ্ছিল কাঠের একটা ভারী থাম—তাই দিয়ে পায়ের পা-টা চেপে ধরে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে—ইহজন্মে আর ঐ পা মাটিতে পাততে হবে না। তারপর তুলে বিছানায় শুইয়ে দিতেই মনে হল বাঁচলাম। ১৫ ঘণ্টা পরে পরদিন সকালেই physiotherapist এসে walker নিয়ে হাঁটাল-কী সে বৌ হাঁটা! তবু ১০।১২ পা হাঁটতে পারলাম ঘরের ভিতর। গতকাল সপরিবারে নীচে গিয়ে বাগানে একটু হেঁটে এসেছি—তার আগে বাড়ি ফেরা অবধি corridor-এ রোজ হাঁটছিলাম।

আজ একমাস হয়ে গেল operation-এর পর ব্যথা জ্বালা সবই অনেকটা কমে গিয়েছে। এবারকার কাটাটা আরও লম্বা। সস্তা সেলাইয়ের মতো সেলাইয়ের দুপাশে অনেকটা জুড়ে কালসিটে পড়েছিল ভিতর ভিতর রক্ত ছড়িয়ে গিয়ে, যদিও তিনদিন ধরে drainage pipe লাগানো ছিল। এখনও ঐখানটা তপ্ত লাগে হাত রাখলে তবে কালসিটেটাও পরিষ্কার হয়ে আসছে তাপও কমে যাচ্ছে অর্থাৎ শরীর ক্রমশ ধাতস্থ হচ্ছে। Physiotheraphy র কষ্ট স্বীকার করেই

* স্বপ্না—স্নেহভাজন পরিচারিকা

** বীনা মমতাজ—ভাসুরের নাতনী

ঐসব কষ্ট নাকি কমে। তবে কৃত্রিম জানুসন্ধিকে নানাভাবে ব্যায়াম করে আত্মস্থ করার প্রক্রিয়া চালিয়েই যেতে হবে।

বাড়ি ফিরতেই শ্রেয়াবতীর*** কী আনন্দ! বার বার হুকুম করে এবার "বাংলার উপকথা" পড়, এবার Rev. Lal Behari Dey-র বই থেকে (Folk Tales of Bengal) দেশবতীর ছবিটা দেখাও, এবার চম্পকদল সহস্রদলের ছবি দেখাও ইত্যাদি। ইস্কুলের পড়াশোনা, ইস্কুলের বন্ধুদের চেয়েও এইসব তার অনেক বেশি পছন্দ। আর একসপ্তাহ পরে দেওয়ালীর ছুটি শেষ হবে...এখন থেকেই পিতা-মাতার কাছে নিবেদন শুরু হয়ে গিয়েছে...রোজ রোজ ইস্কুলে গিয়ে কি দরকার। আমাকে ও পুনদেওকে সম্পূর্ণ অধিকার করে রেখেছে। সেখানে আর কারুর প্রবেশাধিকার সহ্য করে না। ভালোবাসা জানাই, শিগগির সম্পূর্ণ সেরে ওঠ।

গৌরীদি

***

[কবি নাসের হোসেনকে লিখিত]

5, Pearl Road
Calcutta-17
7 3.89

নাসের কল্যাণীয়েষু,

হঠাৎ আমার চিঠি পেয়ে অবাক হবে।...১১ই মার্চ শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় এখানে ঘরোয়া আড্ডায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রুশদীর বই এবং আমাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন। যদি সেদিন বহরমপুর না যাও তাহলে এসো। অবশ্য ৪০/৪৫ জন আসবেন বলে হয়ত বসতে একটু কষ্ট হবে তবু বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে সেটা ক্ষমা করবে নিশ্চয়ই।...

২৩/২৪ তারিখে দেখলাম তুমি গর্কী সদনের পাশ দিয়ে ক্যামাক স্ট্রিট অভিমুখে হাঁটছ কী যেন ভাবতে ভাবতে। দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে লাভ হোত না বলে পাশ দিয়ে রিকশা করে চলে এলাম।

এই সপ্তাহের দেশে তোমার 'রক্তের দাগ' সুন্দর হয়েছে। যখন ভাবতে বসি মনে হয় এই বৃদ্ধা বসুন্ধরার যেখানে পা রাখি সেখানেই নিশ্চয়ই একদিন রক্তের দাগ পড়েছিল, তারপর ধুয়ে গেছে।

সোনালী কি করবে ভাবছে? UGC Research Fellowship-এর জন্য খোঁজখবর করছে কি?

স্নেহ জেনো।

গৌরীদি

***

*** পৌত্রী শ্রেয়া অহনা

[ডা. কামাল হোসেনকে লিখিত]

Bombay-5
26.11.93

স্নেহের কামাল,

আমি ১৯শে অক্টোবর তোমাকে যে চিঠি ও cutting পাঠিয়েছি সেগুলি ডবল তালাব ফাঁকে আটকে পড়েছে বুঝতে পারছি।...

রিনার ১২ তারিখের চিঠি মাত্র গতকাল পেয়েছি, সেটা যথা সময়ে পেলে চিঠিখানার ঐ গতি হত না। কিন্তু এই চিঠিতে তোমার গাড়িতে ধাক্কা খাওয়ার খবরে আমি খুব উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম। তবে কালই রিনা ফোন করে বললো যে এখন তুমি ভালো আছ। তবু তোমার জন্য মনে একটা দুশ্চিন্তা রয়েই গেল। এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারলো তুমি অন্যমনস্ক থাকাব জন্যই বোধহয়। ডেভিডের দুর্ঘটনার পর থেকে আমার মন এ ব্যাপারে একটু বেশি আতঙ্কিত হয়ে আছে। কামাল, একটু সাবধান হও। যদি পঙ্গু হয়ে পড় তবে তো আরও বিপদ।

তোমার কাছে যে চিঠি পৌঁছাল না তার একটি কথা আবার লিখি। ...তোমার মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে তার সার্থক প্রকাশও ঘটাতে হবে। একটু ভেবে দেখলেই মনে করতে পারবে আরও বহু talented মানুষের জীবনই কী ভীষণ দুঃখের ছিল, তবু তাঁরা তাঁদের জীবনকে ব্যর্থ হতে দেন নি।

এই যে কতজন তোমাকে ভালোবাসে, তোমার মঙ্গল কামনা করে একটু সাহায্য করতে পারলে খুশি হয়, এসব কি কিছু নয়? তুমি লেখাটা যে কারণে ফিরিয়ে এনেছ বলে লিখেছ তাতে খুশি হয়েছি। আইয়ুব জানলে আরও খুশি হতেন। ক্রমাগত self improvement-এর চেষ্টাকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। নিজে নিরন্তর চেষ্টায় তাঁর রচনাগুলিকে perfect করে ফেলার চেষ্টা করতেন। তুমিও ধীরে সুস্থে উপন্যাসটিকে মনের মতন করে তোল।..

আমি তো operation নিয়ে মাস দেড়েক প্রায় কিছুই লেখাপড়া করলাম না। অথচ কত যে প্রতিশ্রুত লেখার কাজ পড়ে আছে। এবার সেগুলি নিয়ে বসবো বলে কোমর বাঁধছি। সেই সঙ্গে হাঁটাচলাও করছি। আজ ভোরে শ্রেয়া ও পুনন্দওর সঙ্গে বাগান থেকে বেড়িয়ে এলাম প্রায় ১০০০ পা। বহুদিন পরে একটু হাঁটতে ইচ্ছা করছে। তাই বলে কলকাতা গিয়ে ঘোরাঘুরি করার আমার মোটেই ইচ্ছা নেই। বাকি জীবনের বছর দশেক যদি থাকে তবে সেটা আমি নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে পড়াশোনায় কাটাতে চাই। অবশ্য খেলাঘর ছাড়ব না। কিন্তু সভা সমিতি পথযাত্রা প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিয়ে সময় নষ্ট করব না। তার জন্য বন্ধুবিচ্ছেদ আত্মীয় বিরোধ যাই হোক না কেন। একবার কোথাও যেতে রাজী হলেই পরদিন থেকে চাপ আসতে থাকবে। দেখি কতদূর পারি।

তুমি ভালো থাকার চেষ্টা কোর। জীবন একটাই এবং মহা মূল্যবান। তাকে অবহেলা কোর না। স্নেহ জেনো।

গৌরীদি

[বিশিষ্ট লেখক শ্রী সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লিখিত]

5, Pearl Road
Calcutta-17
25.6.67

প্রিয় সুরজিৎ

সাধারণত আমি চিঠির উত্তর দিতে যতটা সময় নিই এবার সে তুলনায় দেরী করি নি। যদিও অবশ্য দেরী করার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি ছিল।

ইতিমধ্যে আমার এক সহকর্মিনী বান্ধবী দার্জিলিঙ গিয়েছিলেন বেড়াতে। তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম তোমাদের খোঁজ খবর নিয়ে আসতে। তিনি বোধহয় গিয়ে শুনলেন তোমরা কোথায় গেছ। অন্য এক ভদ্রমহিলাকে দেখে তিনি চটপট চলে এসেছেন। তোমরা দেড়ঘরে এত অতিথি সৎকার করছো শুনে আমি ঘাবড়ে গেছি। এরপর আমাদের দুঘরে অতিথি নিতে অস্বীকার করলে লোকে আমাদের কী বলবে? প্রতি বছর শিবরায় অস্ট্রেলিযা থেকে কিছু বালখিল্য পাঠান নভেম্বরে ডিসেম্বরে। তখন তাদের না রাখতে এবং রাখতে আমাদের যে কী কষ্ট পেতে হয়। ওরকম invasion হলে মঞ্জু পড়াশোনা করে কোথায় আর বাচ্চাই বা কোথায় খেলা করে? শ্রীমান বাবরের ভালু নাচ নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক ব্যাপার হবে। নেপালী নাচটাও দেখার আশায় রইলাম—ডিসেম্বর পর্যন্ত জিইয়ে রেখ নাচটা। ওরা বড চট করে একটা ছেড়ে অন্যটা ধরে এবং আগেরটা বেমালুম ভুলে যায়। পল্লবগ্রাহিতায় বড়রা ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না।

আইয়ুবের বই-এর কথা আর কী বলবো? বিরামবাবু নিয়ে বসে আছেন। আইয়ুব ভাবছেন C.I.A agent-এর বই এখনই বাজারে ছেড়ে মার খেতে (উভয়ার্থে) তাঁর সাহস হচ্ছে না। ধন্যবাদ নকশালবাড়ি—ঐ নিয়ে হৈ হৈ শুরু হবার পর C.I.A আর svetlana একটু background-এ পড়ে গেছে। তবে ইতিমধ্যে ক'মাস আর অশান্তির শেষ ছিল না—যাই হোক সমস্তটা লিখবার এখন না আছে ধৈর্য—না চিঠির কাগজ। এটা মুখেই হবে।

এদিকে পূষণ্ আর আমি Anderson club-এ সাঁতার শিখছি। আর পালা করে কানের ব্যথায় ভুগছি। আজ পূষণের কানে ব্যথা—ব্যথাটাকে ও maximum dramatic করে নিচ্ছে যাতে কাল স্কুলে যেতে না হয়। স্কুলটা আগের মত অত অপছন্দ না হলেও না যেতে পারলেই ও বেশি খুশি হয়। শ্রীমান বাবরকে তোমরা যত দিন পারো এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিও। কলকাতার ইস্কুলে এত প্রতিযোগিতা যে সাত বছর ধরে বসিয়ে রাখাতেই আমাদের হিতৈষীরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন।

আশাকরি তোমাদের এস্কিমো সেজে বরফে বেড়ানোর ছবি পথে হারিয়ে আসবে না। আমি তো "নবজাতকে" নিয়মিত লিখি না—আসলে কোথাও লিখি না। লেখিকা হওয়া আমার কপালে নেই।

কলেজ খুললে ভাবি বন্ধ হলে সময় পাব তখন লিখব। বন্ধ হলে ভাবি, রুটিনে না থাকলে কোনো কাজ হয় না---কেবল আলসেমি। এই করে দিন যাচ্ছে। তুমি কি লিখছ? সেদিন অসিত ভট্টাচার্য তোমার লেখার প্রশংসা করছিল।

U F Govt. সম্বন্ধে আমার উৎসাহ নিয়ে এখন সবাই খোঁটা দিচ্ছে। তোমাদের ওখানে এমনিতেই তো জিনিষপত্র সমতলের দ্বিগুণ দাম শুনেছি—এখন কী অবস্থা? নেপালীরা কি নকশালবাড়ি নিয়ে সত্যিই বিচলিত? সপরিবারে ভালবাসা জেন।

গৌরীদি

[কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

পূষণ আইয়ুব
বোম্বাই
১।১১।৮৭

প্রিয় মীনাক্ষী

এখানে আসা অবধি ভাবছি একটা চিঠি লিখবো তোমাকে—কিন্তু দিন যে কোথা দিয়ে চলে গেল। এখন যাবার দিনটা নজরে বেশি। আগামী শুক্রবারে রওনা হয়ে রবিবার সন্ধ্যায় গিয়ে পৌঁছাবো।

আশা করছি তারপরই একদিন অফিস ফেরতা তোমার দেখা পাবো। তোমার স্যুটকেশ আমাকে খুব ভালো service দিয়েছে, বেশ solid একটি গিন্নী বা মায়ের মত সর্বংসহা। কতকিছু আনলাম তাও মনে হয়নি যে হাঁসফাঁস করছে।..

এবার আমি এখানে আসার পর শারদীয়া দেশের সবার প্রথমে পান্নাবাবুর লেখাটিই পড়লাম। তখন থেকে রুচিরার কথা ভাবছি। এইরকম একজন মানুষ আমাদের কাছাকাছি এতকাল রয়েছেন—তা সত্ত্বেও জীবনটা খেয়ে ঘুমিয়ে চাকরি করে কাটিয়ে গেলাম একথা ভাবতে যে কি পরিমাণ গ্লানি বোধ হচ্ছে কি বলবো! অথচ এই খোঁড়া পা নিয়ে কিভাবে ওঁর কোন কাজে যুক্ত হতে পারবো তাও জানি না। ভালোবাসা জেন তোমরা চারজনে।

গৌরীদি

২

স্নেহের মীনাক্ষী,

আমাদের খেলাঘরের গরুর একটি বাচ্চা হয়েছে। তুমি কিছুকাল আগে বলেছিলে ½ K G করে নিতে পারো, এখনও কি ইচ্ছুক আছো? একছত্র লিখে জানিও। ওদের দুধ নিয়ে আসতে আসতে সাড়ে নটা দশটা হয়ে যায়—তাই তোমার বাচ্চারা ওটা পাবে না, refrigerator তো আছে তোমার, রেখে দিলে সকালে খেতে পারবে।

ওঃ আরেকটা কথা। এই রবিবারে কি তোমরা আবার যাচ্ছ সন্তোষবাবুকে দেখতে? সেদিন উনি মনের আনন্দে তোমার ধূপকাঠি পোড়াচ্ছিলেন আর বলছিলেন তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে পারলে মীনাক্ষী আবার এনে দেবে এই ভাল ধূপ।

গৌরীদি

(এই চিঠির কোন তারিখ নেই, টুকরো কাগজের লেখা।)

[মীরাতুন নাহারকে লিখিত]

১৮/১২/৬৬

স্নেহের মীরা,

তোমার খাতাটা* শূন্য-ই ফেরৎ পাঠালাম। আমার কর্তার শরীরটা পরশু থেকে বেশ খারাপ হয়েছে। সারা সপ্তাহ নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ভেবেছিলাম শনিবার তোমার কাজটা করতে পারবো। অথচ শনিবারে ওঁর শরীরটা খারাপ হওয়ায় আর ওটা নিয়ে ব্যস্ত করা গেল না।

সেজন্য তুমি ক্ষমা কোর। তুমি পড়াশোনা করছো, তোমার selection test নিয়ে কোনো ভয় নেই। যখন যা দার্শনিক সমস্যা মনে জাগবে এসে আইয়ুব সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করতে পারবে কিন্তু পরীক্ষা পাশ করার ব্যাপারে বোধহয় উনি খুব ভাল সহায় হবেন না। ওঁর ক্ষমতা এবং অক্ষমতা দুটোই বোধহয় ক্রমে টের পাবে। স্নেহ জেন। এসো আবার।

গৌরী আইয়ুব

***

5, Pearl Road
Calcutta-17
26.4.74

স্নেহের মীরা,

আশা করি খবর ভালো। নিজের কাজের জন্য লিখছি। যদি একটু সাহায্য কর খুব উপকৃত হই। তুমি কি একবার please খবর নিতে পারবে Science Department থেকে যে ওদের admission test গুলি কবে হবে? পূষণ Physics Hons পড়তে চায়। তার জন্য একটা application form বা admission test-এর জন্য form জোগাড় করতে পারবে কি? যা লাগে দিয়ে কিনে নিও, আমি পরে দিয়ে দেব। যদি তোমার পক্ষে এখন আনার সুবিধা না থাকে তবে post-এ পাঠিয়ে দিও formটা। তবে যদি কালকে এ চিঠি পৌঁছে যায় এবং পরশু বিকেলে আসতে পারো তবে সাহিত্যিক গৌর কিশোর ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। অবশ্য চিঠি কাল পৌঁছবার পর form নেবার সময় থাকবে কিনা সন্দেহ।

আর একটা কথা। দাদাকে** বোলো ওর সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে। যদি কোনো দিন সন্ধ্যায় ফোন (444172) করতে পারে তবে ভালো হয়।

সেদিন একটু ক্ষণের জন্য এলেও তোমাদের আসাটা ভালো লেগেছিল।

স্নেহ জেন।

গৌরীদি

* লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছি। কোন একটি লেখা সম্ভবতঃ আইয়ুবকে দেখতে দিয়েছিলাম তখন। পরীক্ষা বিষয়ক কোন টপিক ছিল মনে হয়। কত অজ্ঞান যে ছিলাম! গৌরীদি কত সুন্দর ক'রে বুঝিয়েছিলেন স্বল্প কথায়---আজ বুঝি।

** ওয়ালিউর রহমান

***

Mrs Miratun Nahar
C/o Mr Afsar Ali
9/c New Kasia Bagan Lane
Calcutta-17

স্নেহের মীরা,

আশা করি তোমাদের খবর ভাল। তোমার 'দেশ' খানা পাঠালাম। আর একটা উৎপাত করবো। তোমার কাছে নজরুলের কি কি বই আছে? আমাকে কিছু দিতে পাব? রেডিওর জন্য একটা script তৈরী করতে হবে। ভালোবাসা জেন।

গৌরীদি

৮/৫/৮০

***

১৫/৬/৮০

স্নেহের মীরা,

তোমাব সেই অত্যাশ্চর্য সেবক কি আর এলই না, অথবা সে এই কাজ করতে ইচ্ছুক নয়? যদি একবার জানতে পারি তবে ঐ আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে অন্য দিকে সন্ধান শুরু করি। ওকে খুব লোভনীয় মনে হয়েছিল। যাই হোক তুমি জানিও। মঙ্গলবার আমাদের খেলাঘর যাওয়া হচ্ছে না—কবে হবে সেটা একটু অনিশ্চিত। ভালোবাসা জেন।

গৌরীদি

5, Pearl Rd.
Calcutta-17
27.6.80

স্নেহের মীরা,

তোমার বইগুলি অনেকদিন রেখে ফেরৎ দিলাম। আশা করি অসুবিধা ঘটাই নি। ছুটি শেষ হতে চললো, এবার তাই যা কিছু দেখে টেখে ফেরৎ না দিলে চলে না।

শ্রী বৃন্দারাম কাজ করছে। তবে অতদূর থেকে বাস ট্রামের অনিশ্চয়তার মধ্যে রাত আটটার আগে এসে পৌঁছনো ঠিক সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে ভোর বেলাও ছটা সাড়ে ছটার মধ্যে চলে না গেলে ওখানে তার অসুবিধা হয়। তাই স্থায়ী ভাবে ওকে রাখার আশা ত্যাগ করতে হচ্ছে। ও দেরী করে এলে পুনদেও সন্ধ্যায় খুব একটা ছুটি পায় না। তাই সে অপ্রসন্ন হয়ে আছে। সব দিক সামলাতে আমি হিমসিম খাচ্ছি। তবু ওকে ঐ সময়ে পেয়ে আমাদের অনেকটা সুবিধা হয়েছিল এবং পুনদেও অসুস্থ হয়ে পড়ায় তারপক্ষে রাত জাগা তখন প্রায় অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। তাই বৃন্দারাম আসায় সে ও আমি রাত্রে কিছুটা বিশ্রাম পেয়েছিলাম। তবে বসতে পেলেই তো শুতে চাই আমরা। তাই কিছুটা পেলেই মনে হয় সবটা কেন পাব না। যাক্।

আশা করি তোমার নতুন লোক মনের মতন হয়েছে। তোমার আমন্ত্রণ রক্ষা করা হয়নি বহুকাল—এবার একদিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে উপস্থিত হতেই হবে। ভালোবাসা জেন।

গৌরীদি

C/o Pushan Ayyub
S.S.P Group.
Tata Inst. of Fundamental Research.
Bombay—400005
25/10/91

মীরা কল্যাণীয়াসু

আশা করি তোমরা ভালো আছ এবং সুরাহার কাজকর্মও সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাচ্ছ। মনোজবাবুর কাছ থেকে আমার খবর কিছুটা পেয়েছ হয়ত। আজ আমার হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ২৯শে operation হবার কথা ছিল, প্রথমবার। কিন্তু সব আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করতে হল পরশু একটা blood report পাবার পর I.E S R এতো high যে ডাক্তার opereation করতে ভরসা পাচ্ছেন না! আগে একমাস পিছিয়ে গিয়েছিল kidney infection এর জন্য। এভাবে বার বার বাধা পড়ছে বলে মনে হচ্ছে নবকলেবর ধারণ করা আমার কপালে নেই। এই বাঁকা পা দুটো নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই এ-জীবনটা কাটবে।

শ্রেয়া মাঝে মাঝেই মিন্নার কথা বলে—প্রায়ই যখন মিন্নার দেওয়া 'লজেন্স'—rubber band দিয়ে চুল বেঁধে দেয় ওর মা তখন বলে "এটা মিন্নাদিদি দিয়েছিল না?" ও এখন রামায়ণের গল্প শুনে সেই যুগে বাস করছে। ওকে যদি সীতার মতো অগ্নি পরীক্ষা দিতে বলি তাহলে সে কি করবে? মা বসুন্ধরা কি তাকে আশ্রয় দেবেন?

আলীসাহেব আশা করি ভালো আছেন? মিন্না ও তোমাদের দুজনকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই।

গৌরীদি

[মীরাতুন নাহার ও তাঁর স্বামী আফসার আলিকে লিখিত
উভয়েরই নামের বানান গৌরীদি শুদ্ধ রীতিতে লিখতেন]

স্নেহের মীরাতুন্নাহার ও অফসার আলি,

তোমাদের ঘরে বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে যে বাসন্তিকার আবির্ভাব ঘটেছে তাকে স্বাগত জানাই।

তোমরা নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে বিশ্বসংসার ভুলে আছো—তাই চিঠির ঠিকানা লিখতে যে একটু আধটু ভুল* ঘটবে এতো স্বাভাবিক। চম্পাকলি যাচ্ছে আমার হয়ে কন্যাকে আদর করে আসতে।

গৌরিদি
৬/৩/৮২

* আমাদের কন্যাসন্তান শাওনীর জন্মের সংবাদ জানিয়ে কলেজের অধ্যক্ষা ও গৌরীদিকে দু'খানি চিঠি লিখি। চিঠি দু'খানির খাম বদল হয়ে যায়। সেই ভয়ানক কাণ্ডটিকে তিনি এমন সরস ভঙ্গীতে জানিয়েছিলেন।

5, Pearl Road
Calcutta-17
26.9.79

মীরাতুন্নাহার
অফসর আলি
স্নেহভাজনেষু

তোমাদের/আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করার জন্য এই চিঠি লিখছি। আরতি কাল এসেছে কল্যাণী থেকে, এখন তার ছুটি শুরু হয়ে গেছে। অতএব তার দিক থেকে আর অসুবিধা ছিল না আগামী কাল যাওয়ার।

কিন্তু বাদ সেধেছে আমারই দেহ। পরশু থেকে পেট খুব গোলমাল, আমাশা এত বিশ্রীভাবে বিশেষ হয় না আমার। কাল তো খুব কষ্ট পেয়েছি। কাঁচকলা পেঁপের ঝোল আর দই ছাড়া কিছু জুটছে না কপালে। কাল অনেক enterovioform খেয়েও আজ অবস্থা আয়ত্তে আসে নি। অতএব আগামী কালের নিমন্ত্রণ ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখতে হোলো। আমার কপাল মন্দ!

আমি খেতেটেতে ভালোবাসি। মোটেই আমার কর্তার মতন নিরাহারী নয়। তাই এভাবে বঞ্চিত হতে মন বেশ ব্যাকুল হচ্ছে। তবু উপায় নেই। তোমরা তো ১৫/২০ দিন পরে ফিরে আসছ, তখন নিশ্চয়ই যাব।

বার বার তোমাদের কাছে যাওয়ায় বাধা পড়ছে। এবার আমার অবস্থা সত্যিই বিকল। পেট ছাড়াও হাঁটুও গত ৪/৫ দিন ধরে কষ্ট দিচ্ছে। তাই এবার আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কবে ফিরবে সেটা পুনদেওকে মুখে বলে দিও। আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল।

গৌরীদি

পরিশিষ্ট

গৌরী আইয়ুবের স্বহস্তে লিখিত দেহদানের অঙ্গীকারপত্র

Through and on behalf of
GANADARPAN :

I Gauri Ayyub wife of late Abu Sayeed Ayyub aged about 56 by profession college teacher being of sound mind and judgement do hereby pledge my mortal body, along with all the organs and skeleton, for the promotion of medical science.

I further declare that this pledge has been made with full consciousness and not under any form of duress of coercion. If there is any change in name or address the same will be communicated to GANADARPAN.

I put my hand this saturday, the 9th day of January Nineteen Hundred and eighty eight

Gouri Ayyub
Signature in full

witness to the Signature
ব্রজ রায়

Address : 5 Pearl Road,
Calcutta-17
1. Present : as above
2. Permanent : as above

Forwarded to :-

The Director of Health Services
Government of West Bengal
Writers' Buildings,
Calcutta 7000 001

গৌরী আইয়ুবের স্মরণে অনুষ্ঠিত কিছু স্মরণসভা

পারিবারিক	ঃ	'বিশপ'স কলেজ ঃ সভা পরিচালনা—স্বপন মজুমদার (১০. ৭. '৯৮)
সহকর্মিদের পক্ষ থেকে	ঃ	শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ ঃ সভা পরিচালনা—নন্দিতা সিংহ (১০. ৭. '৯৮)
সুরাহা-সম্প্রীতি	ঃ	বাংলা আকাদেমি ঃ সভা পরিচালনা—মীরাতুন নাহার (৩. ৮. '৯৮)
ফোরাম ফর সোসাল চেঞ্জ	ঃ	শ্রী শিক্ষায়তন অডিটোরিয়াম ঃ সভা পরিচালনা—শিবনারায়ণ রায় (২৫. ৭. '৯৮)
খেলাঘর	ঃ	খেলাঘর প্রাঙ্গণ ঃ বাদু ঃ সভা পরিচালনা—আবদুস সামাদ গায়েন (৯. ৮. '৯৮)
আশ্রমিক সংঘের প্রাক্তনীদের উদ্যোগে	ঃ	কলকাতা ঃ সভা পরিচালনা—রমা চক্রবর্তী (৩১. ৭. '৯৮)

আইয়ুব দম্পতি স্মরণে	ঃ	নেতাজী ভবন ঃ আইয়ুব অনুরাগী বৃন্দ ঃ পরিকল্পনা—মৈত্রেয়ী সেনগুপ্ত (৫. ৬. '৯৯)
শরৎ সাহিত্য সমিতি	ঃ	দিলখুশা স্ট্রীট ঃ আহ্বায়ক শ্রী দুলাল দাস (৭. ৮. '৯৮)

তাঁর প্রয়াণের পর অনুষ্ঠিত স্মরণসভার আমন্ত্রণ লিপিসমূহ

দেশ জাতি ধর্ম বর্ণ বড় ছোট ধনী নির্ধন ভাল মন্দ নির্বিশেষে
সবার আপনজন ছিলেন আমাদের সভানেত্রী
গৌরী আইয়ুব
তাঁর মহাপ্রয়াণে (১৩ই জুলাই '৯৮) আমরা শোকস্তব্ধ
অনুপম এই ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্মৃতিচারণ করার
সামান্য আয়োজন আমরা করেছি
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি-তে
৩রা আগষ্ট, সোমবার
বিকেল পাঁচটায়
সকলের জন্য রইলো আমাদের বিনম্র আমন্ত্রণ

২৫শে জুলাই, ১৯৯৮

সুরাহা-সম্প্রীতির সদস্যবৃন্দ
সহযোগিতায়—পুরোগামী ও
একুশ শতকে নারীর অধিকার পত্রিকা

*

খেলাঘর
১৩/১, পাম অভিনিউ
কলিকাতা-৭০০০১৯

সুধী,

আমাদের সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধার এবং ভালবাসার মানুষ সদ্যপ্রয়াতা শ্রদ্ধেয়া গৌরী আয়ুবের স্মরণে আগামী ৯ই আগষ্ট '৯৮ রবিবার বিকাল ৩টায় "খেলাঘর" আশ্রম প্রাঙ্গণে আমরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।

এই অনুষ্ঠানে আমাদের সকল শুভার্থী ও বন্ধুদের উপস্থিতি আন্তরিক ভাবে কামনা করি। ইতি—

বিনীত---
সমর বাগচী
সম্পাদক, 'খেলাঘর'

অনুষ্ঠান স্থান ঃ ঢালীপাড়া রোড, বাদু গ্রাম, কাঠোর মোড়ে নেমে দীপক মিত্রের স্নেক্ গার্ডেনের পরে।

সবিনয় নিবেদন,

প্রথিতযশা শিক্ষাব্রতী, সুলেখিকা, সুপরিচিতা সমাজসেবী, সমাজ সংস্কারক ও মানব অধিকারের বিশিষ্ট প্রবক্তা সদ্যপ্রয়াতা অধ্যাপিকা গৌরী আইয়ুবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এক নাগরিক সভা আগমী ২৫শে জুলাই শনিবার বিকেল ৪টায় শ্রীশিক্ষায়তনের প্রেক্ষাগৃহে (১১ লর্ড সিন্‌হা রোড, কলিকাতা-১৫) অনুষ্ঠিত হবে।

এই স্মরণ সভায় আপনার যোগদান একান্তভাবে কামনা করি।

ভবদীয়

বীথিকা সিংহ

অধ্যক্ষ

শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ

মঞ্জুলা বসু

রবীন্দ্র চর্চা ভবন

শান্তিব্রত সেন

র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট এ্যাসোসিয়েশন

ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটি

সন্দীপ দাস

ফোরাম ফর সোস্যাল চেঞ্জ

*

সুধী,

আগামী ৩১শে জুলাই, ১৯৯৮ শুক্রবার, বিকেল ৪টায়, সদ্য প্রয়াত গৌরী আইয়ুবের স্মরণে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত 'স্মরণ সভায়' আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

নিবেদক

সুলতানা সারওয়াতারা জামান

তারিখ ঃ ৩১শে জুলাই ১৯৯৮

স্থান ঃ কল্যাণী অডিটোরিয়াম

১২, নিউ সার্কুলার রোড, পশ্চিম মালিবাগ

(সিদ্ধেশ্বরী জামে মস্‌জিদের বিপরীত গলিতে)

ঢাকা-১২১৭।

সময় ঃ বিকেল ৪টা

ফোন ঃ ৯৩৩০৩৫৩

সংবাদপত্র থেকে গৃহীত স্মরণ-সভা সংবাদ

গৌরী আইয়ুব স্মরণে

কালান্তর
আগষ্ট ৫, ১৯৯৮

সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতে গৌরী আইয়ুব স্মরণে একসভা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজন করেছিল সুরাহা সম্প্রীতি। সহযোগিতায় ছিল পুরোগামী ও একুশ শতকে নারীর অধিকার পত্রিকা। উল্লেখ্য ১৩ জুলাই গৌরী আইয়ুবেব মৃত্যু হয়। তিনি সমাজসেবী, গল্পকার নাট্যকার, কবি এবং প্রাবন্ধিক ছিলেন।

এদিনের সভায় গৌরী আইয়ুবকে গানে, স্মৃতিচারণে এবং তার লেখা অংশ পাঠ করে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানান হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পূর্বে অনুষ্ঠানের সভানেত্রী সুরাহা সম্প্রীতির সহ সভাপতি কিশোয়ার জাহান স্মৃতিচারণ করেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনের পর গৌরী আইয়ুবের স্মৃতিকথা পাঠ করে শোনান ডাঃ কামাল হোসেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুরাহা সম্প্রীতির সম্পাদিকা অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার। গানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান অশোকা সেনগুপ্ত, ছায়া ভৌমিক, সাকিলা সুলতানা, সুচেতা গঙ্গোপাধ্যায়, বিশাখা বসু প্রমুখ। স্মৃতিচারণ করেন অতীন্দ্রমোহন গুণ, আব্দুল রউফ, অমিতাভ চৌধুরী, স্বরাজ সেনগুপ্ত প্রমুখ। রচনাংশ পাঠ করেন গৌরী পুরকায়স্থ, তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দ সান্যাল প্রমুখ।

প্রয়াত গৌরী আইয়ুবের স্মরণসভা

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মানবতাবাদী অধ্যাপিকা গৌরী আইয়ুব ৬৭ বছর বয়সে গত ১৩ জুলাই মারা যান। তিনি বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন স্থানে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে স্মরণ অনুষ্ঠান করা হয় বিশপ কলেজে ২০ জুলাই। ২৫ জুলাই স্মরণসভা হয় শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ হলে, শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ ও আরও চারটি সংগঠনের পক্ষ থেকে। গত ৩ আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী হলে সুরাহা-সম্প্রীতি এবং দুটি পত্রিকা "পুরোগামী" ও "একুশ শতকে নারীর অধিকার"-এর উদ্যোগে এক স্মরণসভা হয়। এই স্মরণসভায় গান, গৌরী আইয়ুবের লেখা থেকে পাঠ এবং স্মৃতিচারণ করা হয়। সভাটি পরিচালনা করেন ডঃ মীরাতুন নাহার। ৭ আগষ্ট দিলখুশা স্ট্রীটে শরৎ সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে এক স্মরণসভা হয়। ৯ আগষ্ট স্মরণসভা হয় বাদু গ্রামের 'খেলাঘরে'। অনাথ বালক বালিকাদের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন, প্রয়াত মৈত্রেয়ী দেবী ও প্রয়াত গৌরী আইয়ুব।

একুশ শতকে নারীর অধিকার (সেপ্টেম্বর, ৯৮)—১৫

গৌরীর সমাজসেবা ছিল জাতি, ধর্ম, বর্ণের উর্দ্ধে ঃ

অমিতাভ চৌধুরী

ওসিউর রহমান ঃ বিশিষ্ট সমাজসেবিকা এবং প্রখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী গৌরী আইয়ুব গত ১৩ জুলাই '৯৮ দেহত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং স্মৃতিচারণার মাধ্যমে তাঁকে নবরূপে মূল্যায়ন করতে ৩রা আগষ্ট একটি মনোজ্ঞ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সভাকক্ষে। আয়োজনে ছিল সুরাহা সম্প্রীতি, পুরোগামী পত্রিকা এবং একুশ শতকে নারীর অধিকার পত্রিকা।

গৌরী খুব বড় লেখিকা না হলেও খুব বড় সমাজসেবিকা ছিলেন। আর্তের সেবাকেই তিনি একমাত্র কর্ম হিসেবে দেখেছিলেন। তিনি মুসলিমদের আসল সমস্যা জানবার জন্যেই বেশি বেশি মুসলিম জন মানসের গুরুত্ব দিতেন। এতে অনেকেই তাঁকে সমালোচনাও করেছেন। তবুও তিনি পিছিয়ে পড়েননি। আত্মকেন্দ্রিক এই যুগে তিনি পরকেন্দ্রিকের বিরল দৃষ্টান্ত। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একথা বলেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি ও "চতুরঙ্গ" পত্রিকার সম্পাদক আবদুর রউফ। তিনি আরও বলেন, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য না দেখে মানুষকে কষ্ট থেকে উদ্ধার করার যে কাজটি গৌরীদি করেছিলেন তা এখন আর কজন পারে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই।

প্রখ্যাত লেখক এবং "দেশ" পত্রিকার সম্পদাক অমিতাভ চৌধুরী বলেন, গৌরীর চেহারা যেমন সুন্দর ছিল তার থেকেও সুন্দর ছিল তাঁর মন। এজন্যেই তিনি মহান ব্যক্তিত্ব আবু সঈদ আইয়ুবের সহধর্মিণী হতে পেরেছিলেন। কোনরকম বাধাই তাঁকে আটকাতে পারেনি। গৌরীর সমাজসেবা ছিল দেবতার মত। তাতে জাতি ধর্ম্ম বর্ণের ভেদ ছিল না।

এর আগে উদ্বোধনী ভাষণে কিশোয়ার জাহান বলেন, গৌরী আইয়ুব ভালবাসতেন মানুষকে। মানুষের সমস্যার সমাধানে তিনি ছিলেন নিরলস। আমাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার তাঁর জীবন দর্শন থেকে। "সুরাহা সম্প্রীতি"র পরিচালিকা অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার বলেন, গৌরী আইয়ুব আর্ত মানুষের সুরাহা যেভাবে করতেন তা তুলনাহীন। মানুষকে সমস্যামুক্ত না করা পর্য্যন্ত তিনি দারুণ মনোকষ্টে ভুগতেন। তাঁর লেখাতেও পীড়িত মানুষের কথা রয়েছে।

নিরঞ্জন হালদার, অধ্যাপক স্বরাজ সেনগুপ্ত, ইলা মিত্র, অর্তীন্দ্র মোহন গুণ, রীতা রায়, দীপঙ্কর বসু প্রমুখ স্মৃতিচারণায় বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শাকিলা সুলতানা, রাজশ্রী ভট্টাচার্য, সুকন্যা দেবনাথ, সুরেন সরকার প্রমুখ।

গৌরী আইয়ুবের লেখা থেকে নির্ব্বাচিত অংশ পাঠ করেন গৌরী পুরকায়স্থ, কামাল হোসেন, অধ্যাপক সুনন্দ স্যান্যাল, অধ্যাপিকা তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। স্মরণসভায় বহু মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল।

আসানসোল অবজারভার, আগষ্ট, ১৯৯৮

গৌরী আইয়ুবের জীবনাবসান

মানবদরদী, বিশিষ্ট সমাজসেবী লেখিকা এবং অধ্যাপিকা গৌরী আইয়ুব-৬৭ বছর বয়সে কলকাতায় পার্ক সার্কাসে তাঁর নিজ বাড়ীতে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত ১৩ই জুলাই ১৯৯৮ ইং তারিখে ভোর ৪ঃ৫৫ মিনিটে মারা যান। গত ৩১শে জুলাই শুক্রবার বিকাল ৪টায় বাংলাদেশ প্রতিবন্ধি ফাউন্ডেশনের 'কল্যাণী অডিটোরিয়াম'এ প্রয়াত গৌরী আইয়ুব স্মরণে দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পী, তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং তাঁর গুণমুগ্ধ বেশ কয়েকজনের সমাবেশ হয়। সেদিন আড়ম্বরহীন এই পরিবেশের মধ্যমণি ছিল গৌরী আইয়ুবের একটি হাস্যোজ্জ্বল ছবি। তার পাশে ছিল এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা এবং লাল গোলাপ এবং উপরে ব্যানারে লেখা রবীন্দ্রনাথের গানের একটি পংক্তি—

'ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে'

প্রথমেই সামান্য বক্তব্য রেখে গান গাইলেন সান্‌জিদা খাতুন

'বাণী মোর নাহি
স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি।'

গৌরী আইয়ুবের প্রথম লেখা চিঠির জবাবে আবু সায়ীদ আইয়ুব তাঁকে লিখেছিলেন এই গানটি। এ কথা এক সময় গৌরী আইয়ুব সান্‌জিদাকে জানিয়েছিলেন। সবাই ধ্যান মগ্ন হয়ে শুনছিলেন আর গৌরী আইয়ুব ওপারে দাড়িয়ে যেন স্নিগ্ধ হাসির ছটায় সব কিছু সমর্থন করছিলেন। এর পর গৌরীর জন্য কবি সুফিয়া কামালের প্রাণ ঢালা ভালোবাসার বাণী পড়ে শোনালেন তাঁর কন্যা সাইদা কামাল (টুলু)। আবু সায়ীদ আইয়ুবের ভাগ্নি ডঃ সুলতানা জামান গৌরী আইয়ুবের সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করতে গিয়ে বাঁধ ভাঙ্গা কান্নার মধ্যে জানালেন গৌরী আইয়ুব এবং আবু সায়ীদ আইয়ুবের সাথে তার এবং তার দুই কন্যা নায়লা ও লুবনার ত্রিশ বছরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা। তিনি বললেন সুখে-দুঃখে গৌরী আইয়ুব ছিলেন তাঁদের পরম বন্ধু, শুভকাঙ্ক্ষী এবং পথ প্রদর্শক।

এর পর সুদৃঢ় আবেগপূর্ণ কণ্ঠে গান গাইলেন কৌশিক শঙ্কর দাস
'যারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে দুঃখধারার ভরা স্রোতে
তারে ডাক দিয়ে আজ কোন্ খেয়ালে আবার তোমার ও পার হতে।'

নানান সময় বিচ্ছিন্ন ভাবে পত্র-পত্রিকায় বেরুন গৌরী আইয়ুবের কিছু ছোট গল্প সংকলিত হয়েছিল ১৯৮৬তে 'তুচ্ছ কিছু সুখ-দুঃখ' নামে। সেই সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য লেখা থেকে পাঠ করলেন ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়। পাঠের পর সাহিত্যপ্রেমী গৌরী আইয়ুব এবং তাঁর জীবনবোধ সম্পর্কে আলোচনা করলেন কবি কায়সুল হক, কবি শামসুর রহমান এবং সেলিনা হোসেন। কায়সুল হক বললেন গৌরী আইয়ুবের সাথে তাঁর প্রথম দেখা হয় ১৯৫৩ সনে শান্তিনিকেতনে এক সাহিত্যমেলায়। উক্ত অনুষ্ঠানের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন গৌরী আইয়ুব। তখন তিনি স্নাতক সম্মানের ছাত্রী ছিলেন। শামসুর রহমানও একই মেলায় গৌরী আইয়ুবের সাথে পরিচিত হযেছিলেন। এই কবিদ্বয় গৌরী আইয়ুবের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করেন—তার মানবহিতৈষা, যুক্তিবাদ চর্চা, আলাপচারিতা, সাহায্যসেবা এবং আবু সায়ীদ আইয়ুবের মত অসাধারণ পণ্ডিত, দার্শনিক, সাহিত্যবিদের সাথে তাঁর পরিচয়ের কথা।

ইফ্‌ফাত আরা দেওয়ান গাইলেন পর পর—

'যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর?'

'পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোনখানে তোমার পরশ আসে' এবং

'তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্য দৃষ্টি আমার সত্যরূপে প্রথম করেছ সৃষ্টি'

ইফ্‌ফাতের রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধ্বনিতে পরিবেশ যেন আরও মধুরতর হয়ে উঠলো—আর গৌরী আইয়ুবের মিষ্টি হাসি যেন সব কিছু ভালো লাগার সাক্ষী হয়ে রইল। সেলিনা হোসেন খুবই সুন্দর স্বচ্ছ ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখলেন গৌরী আইয়ুব এবং আবু সায়ীদ আইয়ুব সম্বন্ধে। ১৯৮৯ সনে গৌরী আইয়ুবের বাড়িতে তিনি ও তাঁর কন্যা কয়েকদিন কাটিয়ে ধন্য হয়েছিলেন; যদিও এটা ছিল সেলিনা হোসেনের সাথে গৌরী আইয়ুবের প্রথম সাক্ষাৎ। এর পর সেলিনা হোসেন গৌরী আইয়ুবের, তার নাতনির জন্য লেখা, 'এই যে অহনা' বই থেকে পাঠ করেন।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ডঃ সারওয়ার মুর্শেদ, আবু সায়ীদ আইয়ুবের ভাগ্নে শাকিল মানসুর এবং সভাপতি প্রফেসর শামসুল হক। সারওয়ার মুর্শেদ গৌরী আইয়ুবের বহু গুণাবলি এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। ডঃ মুর্শেদ বলেন এ যুদ্ধ আর সকল পশ্চিম বাঙ্গলার বাঙ্গালীদের মত, আবু সায়ীদ আইয়ুবের জন্য ছিল বাঙ্গালীর স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তাতে বিভিন্ন ভাবে তাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন। ভাগ্নে শাকিল মনসুর ছোট বেলায় তাঁর চাচার সান্নিধ্যের স্মৃতিচারণ করেন। প্রফেসর শামসুল হক উল্লেখ করেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় গৌরী আইয়ুব তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে কি ভাবে সাহায্য করেছিলেন। গৌরী আইয়ুবের এবং আবু সায়ীদ আইয়ুবের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য তিনি একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন।

'জানি গো এ দিন যাবে' এবং 'এ পরবাসে রবে কে'

রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার দরাজ মর্মস্পর্শী কণ্ঠে নিবেদিত গান দুটি সমবেত সকলের স্মৃতির বেশ টেনে মন ছুয়ে গেল। সব শেষে

'জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে' ও 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে'

'সুরের ধরা' সঙ্গীতালয়ের ছাত্রীদের সুপরিবেশিত গান দুটির মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হল স্নিগ্ধ, সুন্দর মানবিক মূল্যবোধে নিবেদিতপ্রাণ গৌরী আইয়ুবের স্মরণসভা।

(বাংলাদেশের 'প্রকৃতি' পত্রিকা থেকে—ড সুলতানা এস জামান এর সৌজন্যে)

স্মারকগ্রন্থ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশক চিঠিপত্র

Dr. Miratun Nahar,
64 G Linton Street,
Calcutta 700014

কল্যাণীয়াসু,

আমাদের সকলের বিশেষ প্রিয়জন প্রয়াত গৌরী আইয়ুবের সম্মানে যে প্রবন্ধ সংকলন সম্পাদন করেছ, তার ভূমিকা লিখে পাঠালাম। সংকলনটি ভাল হয়েছে, তবে আমি মনে করি সংকলনটির মূল্য অনেকখানি বাড়বে এবং এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবে যদি গৌরীর নিজের কিছু রচনা নির্বাচন করে বইটির অন্তর্ভুক্ত করো। গৌরীর গল্প, প্রবন্ধ এবং স্মৃতিমূলক রচনা, সম্ভব হলে তার লেখা কিছু চিঠি বইটিতে থাকা জরুরি। সব না হোক বাছাই করা কিছু রচনার নমুনা। আমার মত গৌরীর অনুরাগীজন এবং পাঠকপাঠিক এটি আশা করবেন।

সুধাংশুশেখর দে খুবই নির্ভরযোগ্য এবং উদ্যোগী প্রকাশক। পূর্ণাঙ্গ সংকলনটি যদি সে বার করে বিশেষ খুশী হব।

শুভার্থী

৫ আগষ্ট, ২০০০ শিবনারায়ণ রায়

একটু দেরি হয়েছে বলে ক্ষমা করবেন। গৌরিদির স্মৃতি আমার কাছে এখনও অত উজ্জ্বল বলে তা লিখতে মাঝে মাঝে কষ্ট লাগল। যাই হোক, সে বই প্রকাশনার সফলতা অন্তরভাবে আশা করছি। প্রকাশিত হলে একটা কপি আমাকেও পাঠাবেন কি?

কিওকো নিওয়া

অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার সমীপে—

প্রীতিভাজনীয়াসু,

আগামীকাল সকালে হায়দ্রাবাদ যাচ্ছি—কিছুটা চিকিৎসার কারণে, কিছুটা ছেলেদের ও বৌমাদের আকর্ষণে। মনে পড়ল অনেকদিন আগে গৌরীদির দুখানি চিঠি আপনাকে পাঠাব বলেছিলাম। পাঠানো হয়নি। হায়দ্রাবাদে পুনেতে যাবার আগে সে-দুটো পাঠিয়ে যাচ্ছি।

জানিনে ইতিমধ্যে আপনার পরিকল্পনার কতখানি বাস্তবায়ন হয়েছে। গৌরীদির কথা মনে পড়লে কত আনন্দ ও বেদনার কথা মনে পড়ে। যখন হাসপাতালে ছিলাম, কাবাব বা কোনও খাবার নিয়ে প্রায়ই বিকেলে আসতেন। সারাদিন উৎসুক হয়ে থাকতাম, কখন দিদি আসবেন।

এখন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করছি আপনি সেই মহীয়সী স্মৃতি রক্ষার চেষ্টা করছেন

বলে। তিনি যে ভাগ্যহীনদের সন্তানসন্ততির ভাগ্য ফেরাবার কত চেষ্টা করেছেন সে কথা কি ভাগ্যবানদের সন্তানসন্ততিরা জানার সুযোগ পাবে না?

আপনার চেষ্টা সফল হোক।

ইতি—
সুরজিৎ দাশগুপ্ত
৪/৮/২০০০

২২/৮/২০০০ ফিরব।

গৌরী আইয়ুবের জীবনপঞ্জী

জন্ম ঃ ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১। পাটনায়।

বাবা ঃ দার্শনিক অধ্যাপক ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত।

মা ঃ নিরুপমা দত্ত।

শিক্ষা ঃ ১৯৪৭-পাটনার বাঁকিপুর গার্লস হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ।

১৯৪৮-৪৯ মগধ মহিলা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ।

১৯৪৯-পাটনা কলেজে বি. এ. ক্লাসে পড়ার সময় ছাত্র রাজনীতিতে যোগদান এবং কারাবাস-বরণ।

১৯৫০-শান্তিনিকেতনে দর্শন শাস্ত্রে অর্নাস নিয়ে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি। অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

১৯৫২ বি. এ. অনার্স।

১৯৫৩ বিশ্বভারতীর বিনয় ভবন থেকে বি. টি.।

১৯৫৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এডুকেশনে এম. এ.।

কর্মজীবন ঃ ১৯৫৪ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্কুলের পর বাকি কর্মজীবন কাটে শ্রীশিক্ষায়তন কলেজের 'এডুকেশন' বিভাগে অধ্যাপনায়।

বিবাহ ও সামাজিক জীবন ঃ ১৯৫৬-এর জুন মাসে আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে বিবাহ।

১৯৫৭-একমাত্র সন্তান পুষণের জন্ম।

১৯৬১-স্বামীর সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে

১৯৬৪-মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব। 'কাউনসিল ফর প্রোমোশন অব কমিউনাল হারমোনি'র আমৃত্যু সভানেত্রী।

১৯৭১-বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা। মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে অনাথ শিশুদের আশ্রম 'খেলাঘর' প্রতিষ্ঠা। পববর্তীকালে মৈত্রেয়ী দেবীর মৃত্যুর পর 'খেলাঘর'-এর আমৃত্যু সভানেত্রী।

১৯৭৫-ইমারজেন্সির বিরুদ্ধে কলকাতার সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিলিত, অনড় প্রতিবাদী আন্দোলন।

১৯৮২, ২১ ডিসেম্বর—স্বামী আবু সয়ীদ আইয়ুবের মৃত্যু।
১৯৮৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি-সহায়ক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সুরাহা-সম্প্রীতি'র সভানেত্রী।
১৯৯৮-বাংলাদেশ মুক্তি যোদ্ধাদের সংগঠন কর্তৃক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবর্ধনা প্রাপ্তি।

মৃত্যু : ১৩ জুলাই, ১৯৯৮। ৫ পার্ল রোড, কলকাতা।

সৌজন্যে : ডাঃ কামাল হোসেন

গৌরী আইয়ুবের রচনা-তালিকা (অসম্পূর্ণ)

প্রকাশিত গ্রন্থ

'তুচ্ছ কিছু সুখ দুঃখ' (গল্প)—দেজ, ১৯৮৬

'দূর প্রদেশের সঙ্কীর্ণ পথ' (অনুবাদ : যৌথভাবে ক্যোউকো নিওয়ার সঙ্গে)—দেজ, ১৯৯০

'এই যে অহনা'—প্যাপিরাস, ১৯৯৬

কবিজীবনী : গালিবের গজল থেকে চয়ন ও পরিচিতি : আবু সয়ীদ আইয়ুব (সম্পাঃ), দেজ পাবলিশিং '৭৬, পৃঃ ১২৩-১৩৫

কবিজীবনী : মীরের গজল থেকে চয়ন ও পরিচিতি : আবু সয়ীদ আইয়ুব (সম্পাঃ) দেজ পাবলিশিং, '৮৭, পৃ ১০৯-১২৩

অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও গল্প

চতুরঙ্গ (১৩৯১-১৪০৫) :- কাবিন নামহ থেকে বসুধারা : অসম্পূর্ণ পরিচয়ের সূত্রে, ৪৫ বর্ষ ১৩৯১, ৫ম সং, পৃঃ ৪১২-২২ ; হিন্দু মুসলমান বিরোধ : রবীন্দ্রনাথের চোখে, ৪৮ বর্ষ ১৩৯৪, ৯ম সং, পৃঃ ৭৭৭-৯০। কবন্ধ (গল্প), ৪৯ বর্ষ, ১৩৯৫, ৮ম সং, পৃঃ ৬৭৬-৮৪ ; রুশদী, খোমেইনি এবং আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি : ৫০ বর্ষ ১৩৯৬, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৯৭-২০৬; সৈয়দ সাদত আবুল মাসুদ, ৫১ বর্ষ ১৩৯৭, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৮০৭-১৩ ; রবীন্দ্র গবেষণার একটি অভিনব ধারা, ৫২ বর্ষ ১৩৯৮, ২য় সং, পৃঃ ১১১-২১ ; রবীন্দ্র গবেষণার একটি অভিনব ধারা, ৫২ বর্ষ ১৩৯৮, ৩য় সং, ২২২-২৯ ; রবীন্দ্র গবেষণার অভিনব ধারার প্রবর্তিকার সমালোচনার জবাবে, ৫২ বর্ষ ১৩৯৮, ৯ম সং, পৃঃ ৭৩৪-৪৩ ; জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধ ৫৪ বর্ষ ১৪০০, ২য় সং, পৃঃ ১২৪-২৮ ; সৈয়দ মুজতবা আলী বন্ধুবরেষু ৫৭ বর্ষ ১৪০৪, ৩য় সং, পৃঃ ২৪০-৪৫ ; শান্তিনিকেতনের দিনগুলি (ধারাবাহিক) ৫৮ বর্ষ, ১৪০৫, ২য় সং, ১২২-২৮, ৫৮ বর্ষ ১৪০৫, ৩য় সং, পৃঃ ২১২-১৬, ৫৮ বর্ষ ১৪০৫, ৪র্থ সং, পৃঃ ২৭৪-৮১ ; মহিমময়ী পরম আত্মীয়া ৫৮ বর্ষ, ১৪০৫, ৩য় সং, পৃঃ ১৬২-১৬৩।

আনন্দবাজার পত্রিকা (১৯৭১-১৯৯৩) :- নীচ ২৬ জুন ১৯৫৯ : ঘ, স, গল্প/রবি ; তর্কাতীত ৫ জুন ১৯৬০ : ক, খ, গল্প/রবি ; প্রত্যর্পিত ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ : ক , গল্প/রবি ; অসমান্তর

৯ জুন ১৯৬৩ ঃ ক, গল্প/রবি ; অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দুই বাংলা ৩ মে ১৯৭১ ঃ ; জাতীয় বিদ্যালয় ১৬ জুন ১৯৭৩ ঃ ; জন্ম শাসন ও স্ত্রী স্বাধীনতা ১৮ নভেম্বর ১৯৭৩ ঃ ; মেয়েরা আজ কতটা অবলা ১৮ নভেম্বর ১৯৭৬ ঃ ; এরা কি ঘর পাবে না কখনও ২১ জানুয়ারী ১৯৭৭ ঃ ; ইংরাজির নির্বাসন নয় ১ আগষ্ট ১৯৭৭ ঃ ; জনতার বিশ্বমান ১৩ জানুয়ারী ১৯৭৯ ঃ ; বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৪ মে ১৯৮০ ঃ (ক্রোড় ঃ ঐ জন্মশতবর্ষ) , কতদূরে সেই নক্ষত্র? (প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী) ৯ মে ১৯৯৩ ; মোহন্ত গোয়ালার গলি বৃত্তান্ত (প্রসঙ্গ শাবদোৎসব) ১১ অক্টোবর ১৯৯৪ ঃ গত পঞ্চাশবছরে কলকাতার মেয়েরা, সুবর্ণজয়ন্তী বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭৮।

দেশ (১৯৫৭-১৯৯৩) ঃ- অঘটন ২৪ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ২০ শে জুলাই ১৯৫৭/দৃষ্টিকোণ ৪৪ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ২৮ শে মে ১৯৭৭/খণ্ডিত প্রতিমা ৬০ বর্ষ ২১ সংখ্যা ১৪ আগষ্ট ১৯৯৩ , ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে প্রবন্ধ (সঠিক শিরোনাম জানা নেই) ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা ; দিনের শেষে শান্তিনিকেতনে (৮ আগষ্ট, ১৯৯৮) রবীন্দ্রভাবনা ঃ রবীন্দ্রচর্চা ভবন পত্রিকা ঃ- রবীন্দ্রনাথ সোমেন্দ্রনাথ বসু মে-৩ ১৯৮৫ ; সোমেন্দ্রনাথ বসু স্মারক সংখ্যা, পৃঃ ২২২-২৩০ ; রাবীন্দ্রিক শিক্ষায় মুক্তি ও শৃঙ্খলা ঃ জানু-মার্চ ১৯৯৪ পৃঃ ১-২৭।

জিজ্ঞাসা ঃ কোন্ বাংলা, কে বাঙালী? (বর্ষ/সংখ্যা জানা নেই—প্রবন্ধটি বাংলাদেশের 'পরিবর্তন' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল—সম্পাদক)

কবিতীর্থ ঃ শিবনারায়ণ রায় বন্ধুবরেষু (শিবনারায়ণ রায় সংখ্যা)

শ্রয়ন ঃ অলোকা

THE WORLD HER VILLAGE . A BOOK OF ELLEN ROY (ed Sibnarayan Roy), An Account of a Brief Friendship, 1979

অন্যান্য ঃ মিশ্র বিবাহে আইডেনটিটির বিরোধ ঃ বর্তমান, ৪ জুন ১৯৮৯ , অনেক কাজ অসমাপ্ত রেখে গেলেন (প্রসঙ্গ মৈত্রেয়ী দেবী) ঃ ভারতকথা, ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ , শান্তাদেবী চিরকালের আধুনিকা ঃ গোধূলি মন পৃঃ ৭-১৮ (মহিলা সংখ্যা) ১৯৯১ , 'সম্পাদক সমীপেষু' (দূরদর্শনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে প্রতিবাদ পত্র) আজকাল, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

গৌরীদি সম্পর্কে সাক্ষাৎকার ঃ আলোচনা

মনোরমা-অগাস্ট ১৯৯১ ঃ 'ব্যক্তিত্ব'-সাক্ষাৎকার ত্রিদিব ঘোষ , **দেশ** সেপ্টেম্বর ১৯৯১ ঃ 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব'-সাক্ষাৎকার চিত্রা লাহিড়ী , শালান্তর-২ আগষ্ট ১৯৯৮, 'তুচ্ছ কিছু সুখ দুঃখ' পুস্তক সমালোচনা ঃ গৌতম রায় ("সমাজসেবী গৌরী আইয়ুবের এই সাহিত্যিক পরিচয় তাঁর অনন্যতারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত")

স্মরণ সংখ্যা ১৯৯৮

গৌরী আইয়ুবের প্রয়াণের পর প্রকাশিত

প্রবাহ-শারদসংখ্যা, ১৪০৫

চতুরঙ্গ—বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ২য়, ৩য়, ৪র্থ ১৪০৫, বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ১ ও ২

দেশ—৮ অগাষ্ট ১৯৯৮

সানন্দা—৩১ শে জুলাই ১৯৯৮

রবীন্দ্র ভাবনা—৮ই জুলাই সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, ২২ বর্ষ ৩য়

বাংলার মুখ—অগাষ্ট—অক্টোবর, ১৯৯৮

শিক্ষায়তন পত্রিকা, ১৯৯৭-৯৯

সংবাদপত্রে বিয়োগ-সংবাদ

বর্তমান—১৮ জুলাই ১৯৯৮ কামাল হোসেন

আজকাল—১৮ জুলাই ১৯৯৮ মন্দার মুখোপাধ্যায়

কালান্তর—২০ শে জুলাই ১৯৯৮ মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন—২৬ জুলাই ১৯৯৮ হোসেনুর রহমান

[সৌজন্যে ঃ মন্দার মুখোপাধ্যায়। অতিরিক্ত কিছু তথ্য সংযোজিত হয়েছে।—সম্পাদক]